মহামায়া

সীতা দেবী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৬৮

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—ক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট—কানাই পাল

মূল্য—ছয় টাকা মাত্র

নিরঞ্জন অল্প একটু হাসিয়া বলিল, "হয়েছে ত নগদ একটা মেয়ে, এত ছেলে মেয়ে তুমি কোথায় দেখলে ?"

পত্নী সাবিত্রী বলিল, "ওমা, নিজের পেটেই না-হয় একটা হয়েছে, তাই ব'লে ছেলেপিলে আমি চোখে দেখিনি নাকি ? আমরাই ত কম ক'রে ছয় ভাই, চার বোন। আমার বড়দির এখনই পাঁচটি হয়েছে, মেজদির তিনটি।"

এমন সময় বাহির হইতে কোমলকণ্ঠে কে যেন জিজ্ঞাসা করিল, "মেজদা ঘরেই নাকি ? আমি দুধ নিয়ে তোমায় সারা বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

নিরঞ্জন দরজাটা খুলিয়া বলিল, "দে, দে, গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে। আজ আর কিছু খাব না, এখন একটু ঘুমোতে চাই। এটাকে একটু ঘুম পাড়িয়ে আন্‌তে পারিস ? চেঁচিয়ে ত বাড়ী মাথায় করছে।"

নিরঞ্জনের বিধবা ভগিনী ইন্দু তাড়াতাড়ি মায়াকে তাহার কোল হইতে টানিয়া লইয়া বলিল, "আবার স্বর ধরেছ, ঠাকরুণ ? আচ্ছা দাদা, তুমি ঘুমোও, যা খাটুনি গেছে সারাদিন ! আমি এটাকে ঘুম পাড়িয়ে আমার কাছেই রেখে দেব এখন। নইলে রাত্রে উঠে আবার চ্যাচালে তোমার ঘুম ভেঙে যাবে।"

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি মায়ার কাঁথা বালিশ প্রভৃতি উঠাইয়া ননদের হাতে দিয়া দিল। সমস্ত দিন তাহারও খাটুনি মন্দ হয় নাই, এখন রাত্রে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইবার সম্ভাবনায় সে আরামই বোধ করিল। মায়া পিসীর কাছে শোয়াটাই নানা কারণে পছন্দ করিত। মা অপেক্ষা পিসীর যে মেজাজ ভাল সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না, হাজার জ্বালাতন করিলেও চড় চাপড় তাহার কাছে লাভ করিতে হইত না। রাত্রে বেশী আবদার করিলে এমন কি খৈ-এর মোয়া বা আমসত্ত্বের টুকরাও পাওয়া যাইত। কাজেই শোওয়ার নূতন ব্যবস্থাটা সর্ব্ববাদীসম্মতই হইল। মায়ার যাহা যাহা দরকার সব গুছাইয়া লইয়া ইন্দু প্রস্থান করিল।

সাবিত্রী দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল। বলিল, "আমরা আর মা-মাসীর ক্ষমতা পেলাম না। মাকে দেখেছি, বুড়ো বয়সে এক হাতে পাঁচশো লোকের রান্না করেছেন, পরিবেশন ক'রে খাইয়েছেন। আর আমরা অল্পতেই মূর্চ্ছা যাই। আমাদের মেয়েগুলো বোধ হয় সব কাজের বার হবে। তুমি আবার যা সাহেবী-আনার ভক্ত, মায়া ত হাতাবেড়ী ধরতেই শিখবে না।"

নিরঞ্জন তখন শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। এতক্ষণ পরে যদি বা ঘুমাইবার অবসর মিলিল ত ঘুম আর আসে না। স্ত্রীর কথায় একটুখানি বিরক্তভাবেই সে বলিল, "আমি যতই সাহেব হই, তুমি ত বিন্দুমাত্রও মেম নও? কাজেই মায়ার আর কোনো শিক্ষা হোক বা নাই হোক, হাঁড়িঠেলার শিক্ষাটা বেশ ভালভাবেই হবে।"

সাবিত্রীও তর্ক করিতে কোমর বাঁধিয়া বসিল। বলিল, "তা আমার কাছে মানুষ হলে আমি যেমন ভাল বুঝি, তাই ত শেখাব? মা-বাপের ঘরে যেমন শিক্ষা পেয়েছি তেমনি হয়েছি। তোমার যখন পছন্দই অন্যরকম, তখন সেইরকম দে'খে বিয়ে করা উচিত ছিল। এখন কথায় কথায় আমাকে খোঁটা দিয়ে কি হবে? যাদের মনুষ্যত্ব ব'লে জিনিষ আছে, তারা অমনি কথায় কথায় আচার-ব্যবহার সব বদ্‌লে ফেল্‌তে পারে না।"

স্ত্রীর বক্তৃতায় বাধা দিয়া নিরঞ্জন বলিল, "দোহাই তোমার, এখন রাত দশটায় সোশ্যাল কন্‌ফারেন্স আরম্ভ কোরো না। ঘুমোনটা আমার একান্তই দরকার। মায়া বই পড়বে, কি বেড়ী ধরবে তার আলোচনা করবার সময় ঢের আছে। একটু দয়া ক'রে উঠে যদি প্রদীপটা নিবিয়ে দাও, ত ভাল হয়। চোখে আলো লাগছে ব'লে আরও ঘুম আসছে না।"

তর্কটা এমন মাঝপথে থামিয়া যাওয়াতে সাবিত্রীর মেজাজটা আরো গরম হইয়া গেল। কিন্তু পরিশ্রান্ত স্বামীকে আর বেশী বিরক্ত করিতে তাহার ভরসা হইল না। উঠিয়া গিয়া প্রদীপটা নিভাইয়া আসিয়া সে আবার শুইয়া পড়িল। ঘুম তাহার চোখে আসিল না। নিদ্রাহীন চোখে ছাদের দিকে তাকাইয়া সে মনে মনে নিজের স্বপক্ষে এবং স্বামীর বিপক্ষে খুব চোখাচোখা যুক্তি সংগ্রহ করিতে লাগিল। স্বামী সে-সব শুনিবার জন্য জাগিয়া নাই, এটা তাহার কাছে বড়ই অসহ্য লাগিতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে ত আর এখন জাগাইয়া ঝগড়া করা যায় না? কাজেই সাবিত্রী একাই বাদী ও প্রতিবাদীর কাজ করিয়া চলিল।

আচ্ছা, তাহার অন্যায়টা কোন্‌খানে? নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণের কন্যা সে। মা, ঠাকুরমা, খুড়ী-জেঠীর কাছে সে যাহা শিক্ষা পাইয়াছে, তাহা খাঁটি আর্য্য শিক্ষা। লেখাপড়া একেবারে জানে না তাহা নয়, বাংলা ত ভালই জানে, সংস্কৃতও পিতার কাছে কিছু কিছু শিখিয়াছিল। ইংরাজী ফরাসী জানেনা বটে। তা হিন্দুদের কটা মেয়েই বা সে-সব জানে? সেলাই করিতে

পারে, রান্নাবান্না ঘরকরনার কাজে সে এতখানি পটু যে শাশুড়ী পর্য্যন্ত তাহার প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। আর নিজের মুখে বলিতে নাই, চেহারাটাও তাহার কুশ্রী নয়, রীতিমত সুন্দরী তাহাকে বলা চলে। অন্ততঃ এঁদের বাড়ীর আর কোনো বউ বা মেয়ে তার কাছে দাঁড়াইতেও পারে না। তবুও স্বামীর তাহাকে বিন্দুমাত্র পছন্দ নয়। তা নয় ত নয়, সে কি করিবে? তিনি এখন পিতৃপুরুষের আচার বিচার সব ছাড়িয়া পুরা সাহেব বনিতে চান, সাবিত্রীর প্রাণ থাকিতে তাহার দ্বারা ওসব হইবে না। ইহকালে না-হয় দুঃখই পাইবে, কিন্তু স্বামীর মতে চলিতে গিয়া পরকাল খোয়াইতে পারিবে না। মেয়ের উপর অবশ্য তাহার হাত নাই, স্বামী যদি তাহাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়া মেমসাহেবী শিক্ষা দেন, দিতে পারেন। তাহার নিজের যেন কখনও অধর্ম্মে মতি না হয়। দেবতার কৃপায়, সে যেন হিন্দুর মেয়ে হইয়াই মরিতে পারে।

নিরঞ্জন ঘুমের ঘোরে একবার পাশ ফিরিয়া শুইল। খোলা জানালার পথে অল্প একটু চাঁদের আলো ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সাবিত্রীর মনের তাপটা কখন যেন জুড়াইয়া গেল। তাহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল। তাহার কপালই খারাপ, তাহা না হইলে এমন স্বামী কয়জনের হয়? তবু তাহার অদৃষ্টে সুখ হইল না। স্বামীকে কি সে ভালবাসে না? তাহা ত নয়। স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে সে আজীবন শিক্ষা পাইয়াছে, সব সময় ভক্তি অচলা রাখিতে পারে নাই, কলহ-বিবাদ করিয়াছে, তাই কি তাহার অদৃষ্টে এত দুঃখ? কিন্তু স্বামী তাহার কাছে যাহা চান, কোথা হইতে সে তাহা দিবে? ধর্ম্ম বড়, না স্বামী বড়? হায়, কে তাহাকে পথ বলিয়া দিবে? ধর্ম্ম বলিয়া সে যাহা জানিয়াছে, তাহা রাখিতে গেলে স্বামীর অপ্রিয় তাহাকে হইতেই হইবে। আর যদি স্বামীকে আঁকড়াইয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছ আচার গ্রহণ করিতে হইবে। কোন্ পথে সে যাইবে?

স্বামীর প্রতি অভিমান আবার তাহার মনে উঁকি মারিতে লাগিল। মতামত লইয়া এত বাড়াবাড়ি করার কি-ই বা দরকার ছিল? পুরুষের কাছে বিধবার মত আচার-নিষ্ঠা কেহই প্রত্যাশা করে না, কিন্তু মেয়েরাও যদি ধর্ম্মত্যাগ করে তাহা হইলে সংসার ছারখার হইয়া যায় না কি?

নিরঞ্জনের সবই অনাসৃষ্টি। সে নিজে কোনো কিছুই মানে না, আহার বিহার কিছুরই মধ্যে তাহার কোনো বিচার নাই। ভাল; তাহার জন্য সাবিত্রী তাহাকে কিছু ত এখন বলে না? গোড়ায় অল্প বয়সের মূর্খতায় কঠিন কথা বলিয়া থাকিবে, তাহা এতদিন মনে করিয়া রাখা উচিত নয়। কিন্তু নিরঞ্জন তাহাকেও নিষ্কৃতি দিতে চায় না। সাবিত্রীকেও নিজের দলে টানিবার চেষ্টার তাহার বিরাম নাই। মেয়েটাকে যত পারে কুশিক্ষা দিবার দিকেই তাহার ঝোঁক। সে এখনই মুসলমানের তৈয়ারী পাঁউরুটি বিস্কুট খাইয়া, সাবিত্রীর গায়ে মাখামাখি করিয়া দেয়। জুতা পায়ে দিয়া ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরঘরে ঢোকে। যাকে তাকে ছুঁইয়া আসে। এ মেয়ে বড় হইয়া কি যে হইবে তাহার কিছু ঠিকানা নাই।

নিরঞ্জন মায়ের অসুখে ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছিল, আবার কয়েক দিন পরে চলিয়া যাইবে। মায়ার জন্মের পর হইতেই সে এক রকম বাহিরে বাহিরেই ঘুরিতেছে। মাঝে মাঝে যখন বাড়ী আসে, তখন সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য জেদ করে, সাবিত্রী একটা-না-একটা ওজর দিয়া কাটাইয়া দেয়। এবারে কাটানোটা হইবে সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত, কারণ এখন আর শাশুড়ী বাঁচিয়া নাই।

সাবিত্রী মনে মনে স্বর্গগত পিতার উদ্দেশে, গুরুর উদ্দেশে প্রণাম করিল। মনটা খানিকটা যেন শান্ত হইল। কখন এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

২

নিরঞ্জনের পিতা জয়কালী বন্দ্যোপাধ্যায় এককালে সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। দেবত্র ও ব্রহ্মত্র সম্পত্তির কল্যাণে তাঁহার কিছুই অভাব ছিল না। লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহের পূজাই তাঁহার দেহমনের সকল ক্ষুধাকে মিটাইয়া চলিত। মন্দিরের অদূরেই তাঁহার বাড়ী ছিল। পৈত্রিক যে খড়ের ঘর ছিল তাহা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন, নিজে তাহার উপর একটি মাঝারি গোছের পাকা বাড়ী যোগ করিয়া, পরিবার-পরিজনের আরামের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরিবারটিও তাঁহার ছোটখাট ছিল না। তাঁহারা তিন ভাইয়েই একান্নে বাস করিতেন। তাঁহার চারিটি পুত্র ও দুইটি কন্যা ছিল।

কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। বড় ছেলে তখন মাত্র বারো বছরের বালক, মেজটি দশ বৎসরের। অন্য পুত্রকন্যাগুলি তখন নিতান্তই ছোট। তাঁহাকে সাহায্য করিবার বা উপদেশ দিবার একটি মানুষ ছিল না। দেবররা স্বামীর মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গে পৃথক্ হইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। ফলে যে সম্পত্তিতে এতদিন সকলের স্বচ্ছন্দে চলিতেছিল, তাহাই ভাগ হইয়া কাহারও কাজে না লাগিবার জোগাড় হইল। নিরঞ্জনের মা ন্যায্য পাওনা যাহা তাহা পাইলেন না। অল্পস্বল্প যাহা ছিল, তাহা লইয়াই অতি কষ্টে ছেলেমেয়েগুলিকে মানুষ করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে বাড়ীখানা তাঁহারই থাকিয়া গেল। গ্রামের সকলেই জয়কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে অতি শ্রদ্ধা করিত, কাজেই আত্মীয়স্বজন শত্রুতে পরিণত হইলেও ছেলেমেয়েগুলিকে পরের সাহায্যেই বিধবা মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

বড় ছেলে মনোরঞ্জন গ্রামের স্কুল হইতে পাশ করিয়া স্কলারশিপ পাইয়া কলিকাতায় পড়িতে গেল। সহরে কত বিপদ্, কত পাপের জাল, নবীন পথিকের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে মনে করিয়া বিধবা কেবলই চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিনীরা সান্ত্বনা দিতে আসিয়া তাঁহার আশঙ্কা আরোই বাড়াইয়া তুলিতে লাগিল। অবস্থা যদি আগের মত থাকিত, তাহা হইলে কখনই তিনি ছেলেকে কলিকাতায় পাঠাইতেন না। কিন্তু এখন ত তাহাদের চাকরী করিয়া খাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে? লক্ষ্মীনারায়ণ যে তাহাদের ত্যাগ করিয়াছেন।

মনোরঞ্জন আই-এ পাশ করিল বেশ ভাল করিয়াই, কিন্তু স্কলারশিপ পাইল না। তাহার চাল-চলনের পরিবর্ত্তন দেখিয়া গ্রামের লোক হাসাহাসি করিতে লাগিল। তাহার মায়ের অশ্রুজল আরো বেশী করিয়া ঝরিতে লাগিল। এ কি সেই ছেলে যে যাইবার দিন কাঁদিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল? এ যেন তাহার মূর্ত্তি ধরিয়া অচেনা কোনো মানুষ তাহাদের ঘরে আসিয়া পুত্রের স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে। ভাইবোনের সঙ্গে সে কথাই বলে না, তাহারা চোখের সামনে আসিয়া পড়িলে এমন অবজ্ঞাভরে তাকায় যেন তাহারা অন্য কোনো নিকৃষ্ট গ্রহবাসী জীব, মনোরঞ্জনের কাছে আসিবার চেষ্টা করা তাহাদের ধৃষ্টতা মাত্র। মা কথা বলিলে অনেক কষ্টে একটা উত্তর দেয়, নিজ হইতে কাছে আসিয়া একটা কথাও বলে না। খাওয়া দাওয়া

কিছুই তাহার পছন্দ হয় না। মুখ ফুটিয়া কিছু বলে না, ভাতের থালা এক রকম স্পর্শ না করিয়াই উঠিয়া পড়ে। সকালে চা না খাইয়া তাহার মাথা ধরে। বোন ইন্দুকে দিয়া গরম জল আনাইয়া সে নিজে চা বানাইয়া পান করে। মা সব ক'টি ছেলে মেয়ে লইয়া শুইতেন, মনোরঞ্জনও আগের মত তাহার কাছে শুইবে মনে করিয়া আর তাহার শয়নের আলাদা ব্যবস্থা করা হয় নাই। মনরঞ্জন কাণ্ড দেখিয়া রাগে গর গর করিতে করিতে চলিয়া গেল, এবং যতক্ষণ না অন্য ঘরে তাহাকে বিছানা করিয়া দেওয়া হইল, ততক্ষণ পথে পথে ঘুরিয়াই কাটাইয়া দিল।

বিধবা তারাসুন্দরী সকলের কাছে কাঁদিয়া পরামর্শ চাহিয়া ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের সামনে অবশ্য সকলেই সমবেদনা জানাইল, বিবিধ পরামর্শ দিতেও ক্রটি করিল না, তবে তিনি পিছন ফিরিতেই বিদ্রূপের হাসিও অনেকের মুখেই ফুটিয়া উঠিল। এ-সব বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার চেষ্টা করা কেন? চারজন্ম পুরুষানুক্রমে যাহারা টিকি রাখিয়া, খড়ম পরিয়া, ঠাকুর পূজা করিয়া দিন কাটাইল, তাহাদের বংশের ছেলের সাধ হইল বি-এ, এম-এ পাশ করিবার? মায়ের যেমন আক্কেল; ছেলের ত এখন পছন্দই বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। পাড়াগাঁয়ের মাকে, ভাইবোনকে দেখিলে তাহার ঘৃণাই হয়। এখন পরামর্শ চাহিতে আসিলে কি হইবে? কলিকাতায় পাঠাইবার সময় ত ঠাকুরাণী কাহারও পরামর্শ চাহেন নাই?

জায়েরাই অবশেষে সৎপরামর্শ দিলেন। "বড়-সড় দে'খে একটি বিয়ে দিয়ে দাও। কেমন তখন ঘরে মন না বসে দেখা যাবে। যখনকার যা, তা না হলে ঘরে মন টিঁকবে কেন।"

তারাসুন্দরীর কাছে এ উপায়টা খুবই ভাল মনে হইল। হিন্দু-সমাজে ছেলের বিবাহ দেওয়াটা সব চেয়ে সহজ কাজ, কাজেই মনোরঞ্জনের বিবাহ হইতে বিশেষ দেরি হইল না। পাত্রীর পিতা কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায়ই বাস করেন, অবস্থা মোটের উপর ভালই। মেয়েটি বড় বটে, বছর তের-চোদ্দর হইবে, দেখিতে সুন্দরী না হইলেও নিতান্ত মন্দ নয়। মনোরঞ্জন আপত্তি করিবার কোনো কারণ দেখিল না। মেয়েটি লেখাপড়াও কিছু কিছু করিয়াছে, সহুরে আদব-কায়দায় অভ্যস্ত। শ্বশুরের অবস্থা যেরূপ তাহাতে বিবাহ করিলে, মনোরঞ্জনের অনেক দিক্ দিয়াই সুবিধার সম্ভাবনা।

বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু তারাসুন্দরীর অদৃষ্টই খারাপ। বিবাহের ফলে ছেলের মন বসিল বটে, তবে তাঁহার ঘরে নয়, বধূর পিতার ঘরে। মনোরঞ্জন ছুটিতে আসা ছাড়িয়া দিল। মাতার ইচ্ছা ছিল বধূকে নিজের কাছে আনিয়া রাখেন, কিন্তু ম্যালেরিয়ার ভয়ে কন্যার পিতামাতা রাজী হইলেন না। মনোরঞ্জন পড়াশুনা এক রকম ভালই করিতে লাগিল। মেসে থাকিলে শরীর ভাল থাকে না, কাজেই শ্বশুর তাহাকে নিজের বাড়ীতেই আনিয়া রাখিলেন।

তারাসুন্দরী ছেলের অকল্যাণের ভয়ে চোখের জল ফেলিলেন না বটে, কিন্তু বুকের ভিতরটা তাঁহার ব্যথায় টন্ টন্ করিতে লাগিল। এতকষ্টে মানুষ করা ছেলে, একেবারে এমনি পর হইয়া গেল? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর সহরের মেয়ে আনিবেন না। তাঁহারা যেমন, তেমনি পরিবার দেখিয়াই ছেলেমেয়ের বিবাহ দিবেন। বড় মেয়ে ইন্দুর বিবাহও তিনি দেখিয়া শুনিয়া এমন ঘরে দিলেন, যেখানে আচার-ব্যবহার লইয়া তাঁহাকে কোনদিন কষ্টে পড়িতে হইবে না।

নিরঞ্জনের যখন আঠার বৎসর বয়স তখন হইতে তাহার জন্য কনে খোঁজা আরম্ভ হইল। এত অল্পবয়সে মানুষ না হইয়া বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। এর ওর সাহায্যে সেকথা মাকে জানাইতেও সে ত্রুটি করিল না। কিন্তু তারাসুন্দরী কাঁদিয়াই তাহার সকল আপত্তি ভাসাইয়া দিলেন। এক ছেলে ত তাঁহাকে ত্যাগই করিয়া গেল, নিরঞ্জনও কি তাঁহাকে আবার যন্ত্রণা দিতে চায়? মেয়েদের বিবাহ হইয়া গেলে তাহারা পরের ঘরে চলিয়া যাইবে। তখন রোগে পড়িলে তারাসুন্দরী কি এক ফোঁটা জলও পাইবেন না? বড়ছেলে মেম বৌ আনিয়াছে, সে কোনদিন শ্বশুরবাড়ীতে পদার্পণও করিবে না। নিরঞ্জনেরও কি সেইরকম ইচ্ছা?

নিরঞ্জন হাল ছাড়িয়া দিল। আচ্ছা, মেয়ে না হয় মা পছন্দ করুন, কিন্তু এত শীঘ্র বিবাহ দিবার দরকার কি? তাহার পড়াশুনা শেষ হউক, সে উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করুক, তাহার পর বিবাহ দিলেই চলিবে? মা বলিলেন, বিবাহ কি আর তিনি কালই দিতেছেন? পছন্দ মত মেয়ে পাইতে ঢের খোঁজ করিতে হয়। নিরঞ্জন পড়াশুনা করিতে থাকুক, মেয়ে ঠিক হইতে তাহার পাশ করা হইয়া যাইবে।

কিন্তু তারাসুন্দরীর এবারে কপাল বড়ই ভাল ছিল। পাশের গ্রামেই চমৎকার মেয়ে পাওয়া গেল। বংশানুক্রমে তাহারা নিষ্ঠাবান্ পুরোহিতের

ঘর, কোনদিন সনাতন আচারের পথ হইতে এক চুল বিচ্যুতি তাহাদের ঘটে নাই। অথচ শিক্ষাদীক্ষাহীন মূর্খও নয়। পাণ্ডিত্যের জন্য বংশের পুরুষরা দেশবিখ্যাত। মেয়েটি অতি সুশ্রী দেখিতে, বাপের কাছে বাংলা ও সংস্কৃত শিখিয়াছে। ঘরের কাজে অদ্বিতীয়া। তারাসুন্দরী যাহারই কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই শতমুখে মেয়েটির প্রশংসা করিল।

নিরঞ্জন আর একবার আপত্তি জানাইল। এত শীঘ্র বিবাহ নাই বা হইল? কথা হইয়া থাক্, বছর কয়েক পরে বিবাহ হইবে। তারাসুন্দরীর ভরসা হইল না। এমন সুন্দর মেয়ে, আর কেহ শেষে টপ্ করিয়া লইয়া যাইবে? মেয়ের বাড়ীর লোকেও রাজী হইবে কি না সন্দেহ। তাহাদের বংশে মেয়ে ধেড়ে বুড়ো করিয়া রাখার প্রথা নাই। তাহার পর নিরঞ্জনেরই যে মত পরিবর্ত্তন হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? অগত্যা নিরঞ্জনকে বিবাহ করিতেই হইল। নিজের মতামত এমন করিয়া বিসর্জ্জন দিয়া তাহার মনের ভিতরটা ভার হইয়া রহিল। যে-সকল সামাজিক কুরীতির বিরুদ্ধে সে এতদিন এত বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছে, বন্ধুবান্ধবকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছে, আজ নিজেই কিনা তাহাদের কাছে মাথা হেঁট করিল? ইহার পর তাহার আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। মায়ের প্রতি অভিমানেও তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সন্তানকে সৎপথে চালানো যাঁহার ব্রত হওয়া উচিত ছিল, সেই মা-ই কিনা অবশেষে তাহাকে পথভ্রষ্ট করিলেন? বন্ধুরা সান্ত্বনা দিল, "আরে রাখ তোমার ঢং। বৌয়ের চাঁদমুখ দে'খে যত প্রিন্সিপ্‌ল্, কনভিক্‌শন্ সব ভুলে যাবে। তখন আমাদের মত বুঝবে,—'অমন অবস্থাতে পড়লে সবারই মত বদ্‌লায়'।"

বধূ সাবিত্রীর চাঁদমুখ সত্য সত্যই ছিল বটে কিন্তু তাহাতেও নিরঞ্জন বিশেষ কিছু সান্ত্বনা পাইল না। তাহার মন যেমন ভার হইয়া ছিল তেমনি ভার হইয়া রহিল। বধূর সহিত ভাল করিয়া আলাপ-পরিচয় করিবার কোনও সুযোগ হইল না। যে সামান্য কয়টা দিন বিবাহের পর বধূ তাহাদের গৃহে ছিল, লোকের ভীড়ের মধ্যে সে যেন হারাইয়াই গেল। রাত্রি এগারোটা বারোটায় তাহাদের সাক্ষাৎ হইত। নিদ্রাকাতর বালিকার সঙ্গে প্রেমালাপ করিতে তাহার মায়াই হইত। সাবিত্রীও বিছানায় বসিতে-না-বসিতে ঘুমে ঢুলিয়া পড়িত এবং মিনিট কয়েকের মধ্যে ঘুমাইয়াই পড়িত। সুতরাং সপ্তাহ খানেক পরে সাবিত্রী যখন বাপের বাড়ী ফিরিয়া গেল, তখন স্বামী-স্ত্রী যেমন

অপরিচিত ছিল, প্রায় তাহাই রহিয়া গেল। বালিকার মনে জাগিয়া রহিল একটু অভিমান। সে এমন কি ফেল্‌না যে বর তাহার সঙ্গে আলাপ করিবারও একটু চেষ্টা করিল না? তাহার সঙ্গিনীদের কাছে গিয়া সে বলিবে কি? তাহারা সব কত রকমের গল্প এক-একজন করিয়াছে! তাহারা নিশ্চয়ই বুঝিয়া লইবে যে, সাবিত্রীকে তাহার বরের একেবারেই পছন্দ হয় নাই। স্বামীকে জানিবার চিনিবার আগেই সাবিত্রীর মন তাহার প্রতি একটু যেন বিমুখ হইয়া গেল। নিরঞ্জনের মনে সাবিত্রীর কোনো ছাপই পড়িল না। মায়ের প্রতি বুকভরা অভিমান লইয়া সে কলিকাতায় আবার পড়িতে চলিয়া গেল। যে মেসে আগে থাকিত, সেখানে গিয়া উঠিতে লজ্জা অনুভব করিল। অন্য একটা মেসে গিয়া উঠিল, কিন্তু মেস ছাড়িলেই ত নিষ্কৃতি নাই? কলেজে সকলে তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিল। কেহ ঠাট্টা করিল, কেহ সহানুভূতি জানাইল, শ্লেষাত্মক অভিনন্দনে তাহার দুই কান বোঝাই এবং পৃষ্ঠদেশ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল।

একেই স্বকৃত অপরাধের বোঝায় তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তাহার উপর এই সব উৎপাত জোটাতে তাহার প্রাণ একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। বাড়ীতে কিছু না জানাইয়াই সে কলেজ ছাড়িয়া দিল এবং অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া ভায়ের শ্বশুরের সাহায্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গিয়া ঢুকিল। বাড়ীতে চিঠিপত্র লেখা একরকম ছাড়িয়াই দিল।

সাবিত্রী এক বছর পরে শ্বশুরবাড়ী আসিল। সে সময় কলেজের ছুটি, তারাসুন্দরী অনেক কান্নাকাটি করিয়া নিরঞ্জনকে বাড়ী আনাইলেন। তাঁহার এমন রাজকন্যার মত সুন্দরী বউ, ছেলে তাহাকে কখনই অবহেলা করিতে পারিবে না, এ বিশ্বাস তাঁহার খুবই ছিল।

সাবিত্রী কিন্তু স্বামীকে বশ করিতে ঠিক পারিল না। তাহাদের শুভদৃষ্টিটা অতি অশুভক্ষণেই হইয়া থাকিবে বোধ হয়। যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম্মই ভালবাসা। পত্নীর সুন্দর মুখ যে নিরঞ্জনকে কিছুমাত্র আকর্ষণ করিল না, তাহা বলা যায় না। বিবাহ যখন হইয়াই গিয়াছে তখন আর চিরকাল এই লইয়া ঝগড়া করিয়া লাভ কি? এখন এই স্ত্রীকেই যদি সে নিজের মনের মতন করিয়া লইতে পারে তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জীবন তাহাদের সুখেরই হইবে।

কিন্তু একটু চেষ্টা করিতেই বুঝিতে পারিল যে, বৌয়ের চেহারাখানা যতই কোমল হউক না কেন, মতামতগুলি বেশ শক্ত। প্রথম কয়েকদিন

ত প্রণয়-চর্চ্চাতেই কাটিয়া গেল, নিরঞ্জনের মনের অনেক দিনের সঞ্চিত বেদনা, অভিমান, বেশ খানিকটাই মুছিয়া গেল। যে-ব্যথার মূলে সাবিত্রী, তাহার উপশমও সেই করিবে, ক্রমেই নিরঞ্জনের মনে এই আশা প্রবল হইতে লাগিল। তারাসুন্দরীও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। ছেলে বৌ পাড়াগাঁয়ের রীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া দিনের বেলাও গল্প করিতে বসিলে তিনি চোখ বুজিয়া দেখিয়াও দেখিতেন না। কোনও রকমে ছেলের মনকে বাঁধিতে পারিলেই তিনি বাঁচেন। পাড়াপ্রতিবেশী একথা লইয়া আলোচনা করিলে তিনি ধমক দিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিতেন।

দিন পনেরো কাটিয়া যাইবার পর নিরঞ্জনের হৃদয়াবেগের প্রথম উচ্ছ্বাসটা একটু যেন কমিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল, পত্নীর উপর অজস্র আদর বর্ষণ করিলেই তাহার স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করা হইবে না। সে বালিকামাত্র, তাহার সকল শিক্ষাই এখনও বাকী রহিয়াছে। এখন হইতে আরম্ভ না করিলে, কোন কাজই হইবে না।

দুপুরবেলা আহারান্তে ছোটবোন বিভাকে দিয়া সে সাবিত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইল। সাবিত্রী তখন শাশুড়ীর ঘরে বসিয়া তাঁহার জন্য পান ছেঁচিয়া রাখিতেছিল। তারাসুন্দরী একটি মাদুর পাতিয়া শুইয়া এক প্রতিবেশিনী প্রৌঢ়ার সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন।

বিভা ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "মেজবৌদি, মেজদা ডাক্‌ছে।"

সাবিত্রীর মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, ঘাড়টা একেবারে নুইয়া পড়িল। যেমন দাদা, তেমনি বোন! দুটিরই বুদ্ধি সমান!

প্রতিবেশিনী হাসিয়া বলিলেন, "আজকালকার ছেলেমেয়েরা সব হয়েছে স্বাধীন, মা খুড়ী মানে না। আমাদের কালে রাত বারোটার আগে ঘরমুখো হবার জো ছিল না।"

তারাসুন্দরী কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। ছোটমেয়েকে একটা চড় দিতে পারিলে হইত ভাল, কিন্তু সে তাহা হইলে আরো কি যে বলিবে, তাহার ঠিকানা নাই। বধূর লজ্জাকে একটু চাপা দিবার চেষ্টায় বলিলেন, "যাও মা, দে'খে এস কি চায়; পানটান পায়নি হয়ত।" প্রতিবেশিনীকে বলিলেন, "ছেলের বয়সই হয়েছে, আক্কেল হয়নি। সারাদিন পড়া আর

পড়ান তার এক বাতিক। বোন, ভাই, বৌ, কেউ বাদ যাচ্ছে না। পারলে আমাকেও পড়াতে বসে।"

সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়াই অস্বাভাবিক ঝাঁঝের সহিত বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, তোমার আক্কেল কি রকম বল দেখি?"

স্ত্রীর মুখে এহেন স্বর শুনিতে নিরঞ্জন অভ্যস্ত ছিল না। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন? আমার আক্কেল সম্বন্ধে সংশয় হল তোমার কিসে?"

সাবিত্রী বলিল, "মায়ের ঘরে রয়েছি, সেখান থেকে কি ব'লে আমায় ডাকতে পাঠালে? ওবাড়ীর খুড়ীসুদ্ধ সেখানে ব'সে। ছি, ছি, লজ্জায় আমি বাঁচি না।"

নিরঞ্জন বিরক্ত হইয়া গেল। এইটুকু মেয়ের মুখে এ ধরণের কথা কেন? সে বলিল, "আমি ত গুণতে জানি না, কাজেই মায়ের ঘরে আছ সেটা বুঝতে পারি নি। আর বুঝলেই বা কি? ডেকে পাঠানোটা এমন কিছু অপরাধ নয়, ওতে ছি ছি করবার কিছু নেই। এসব পাকামি আমার ভাল লাগে না।"

স্বামীর ভৎসনার স্বরে সাবিত্রী একটু দমিয়া গেল। জিনিষটায় অপরাধ যে কোন্‌খানে তাহা সে নিজেই ঠিক জানে না। বড়দের যেমন বলিতে শুনিয়াছে, নিজেও তেমনি বলিয়া বসিল। কিন্তু স্বভাবটা তাহার জেদী, তর্ক করাতেও উৎসাহ খুব। সে বলিল, "আহা, ঐ রকম বুঝি করে? হিন্দুর ঘরে ওরকম কেউ করে না, ওতে নিন্দে হয়।"

নিরঞ্জন বলিল, "হিন্দুর ঘরে নিন্দে হলেই যে কাজটা খারাপ তা প্রমাণ হয় না। এরপর নিন্দে করবার মত অনেক কাজই হয়ত তোমাকে করতে হবে।"

সাবিত্রী নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "মাগো, কি ঘেন্না। আমি কখনই তা করব না।"

নিরঞ্জন তাহাকে ডাকিয়াছিল পড়া সুরু করিবার জন্য কিন্তু কলহের সূত্রপাত দেখিয়া তাহার মনটা নিরুৎসাহ হইয়া গেল। একটু রাগও হইল। এক ফোঁটা ত মেয়ে, কথা বলে যেন প্রপিতামহীর মত। একটু ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞাসা করিল, "অত পাকাপাকা কথা এরই মধ্যে শিখলে কি ক'রে? এতে নিন্দে হয় না?"

সাবিত্রী রাগে অভিমানে আটখানা হইয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

৩

নিরঞ্জন ও সাবিত্রীর দাম্পত্য-কলহটা ঠিক সনাতন-প্রথামত হইত না। তাহাদের আরম্ভই হইত বরং সামান্য, এবং শেষটা তাহাই তুমুল ব্যাপারে দাঁড়াইত। কলহের মাঝখানে অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া স্বামীকে অনুতপ্ত এবং স্নেহ-কোমল করিয়া তোলার বিদ্যাটা সাবিত্রীর ঠিক জানা ছিল না। তর্ক আরম্ভ করিলে সে প্রাণপণে তর্ক করিত, এবং সুযুক্তি যেখানে না জুটিত, সেখানে রাগের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া কাজ সারিয়া লইত। তর্কে হারিলে কাঁদিত বটে, কিন্তু তাহাতে ঝগড়ার মিটমাট হইত না। নিরঞ্জন তাহাকে কাঁদিতে দেখিলে কাছে আসিয়া, আদর করিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু ফল হইত তাহাতে অন্যপ্রকার। সাবিত্রী নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া আবার ফোঁস করিয়া উঠিত। এত তর্ক, এত রাগারাগিতেও যে-স্বামীর মতের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটান যায় না, তাহার আদরের আবার মূল্য কি? সাবিত্রী নিজের মনোভাব স্পষ্ট করিয়া বুঝিত কিনা সন্দেহ, তবে খানিকটা এই ধরণের ধারণাই তাহার ছিল বোধ হয়।

নিরঞ্জন আবার পত্নীকে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু খুব যে সফল হইল তাহা বলা যায় না। স্বামীর বাধ্য হওয়া উচিত, হিন্দুনারীর ইহাই ধর্ম্ম। অগত্যা সাবিত্রী অনেক কষ্টে ঘণ্টাখানেক বসিয়া নিরঞ্জনের বক্তৃতা শুনিত। কিন্তু তাহার বাধ্যতা ঐ পর্য্যন্ত। নিরঞ্জন তাহাকে যাহা যাহা করিয়া রাখিতে বলিত, তাহার একটাও সে করিত না। স্বামী বিরক্ত হইলে, নানারকম ওজর আপত্তি দেখাইতে বসিত। তাহার কত কাজ, সংসারের কাজ ফেলিয়া বই লইয়া বসিলে শাশুড়ী কি মনে করিবেন? দিনের বেলা স্বামীর কাছে বসিয়া থাকিলে, সকলে তাহাকে ভয়ানক ঠাট্টা করে, ইত্যাদি।

নিরঞ্জন একদিন একটু রাগিয়া বলিল, "আসল কথা পড়তে তুমি চাও না।"

সাবিত্রীর স্বভাব ছিল কাহাকেও রাগিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার চেয়েও বেশী করিয়া রাগিয়া ওঠা, সেও বেশকিছু ঝাঁঝের সহিত বলিল, "বিয়েই ত হয়ে গেছে, এখন আর পড়ার কি দরকার?"

নিরঞ্জন বলিল, "তবেই হয়েছে। মেয়েদের পড়াটা তাহলে কেবল বিয়ের জন্তে? নিজে মানুষ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই?"

সাবিত্রী বলিল, "আহা, কতগুলো ছাই পাশ ইংরাজী না পড়লে আর মানুষ হওয়া যায় না নাকি? আমাদের মা-মাসীরা তাহলে কেউই মানুষ নয়। যাতে চরিত্রের বল বাড়ে, ভাল গৃহিণী, ভাল মা হতে শেখায়, সেই শিক্ষাই আসল শিক্ষা।"

নিরঞ্জন হাসিয়া বই রাখিয়া দিল। বলিল, "থাক্, আর প'ড়ে কাজ নেই। ছাত্রী হওয়ার চেয়ে গুরুমশাই হলেই তোমায় মানায় ভাল। চরিত্রের বল বাড়া, সুগৃহিণী, সুমাতা হওয়ার জন্য যে কি কি দরকার তার সব ধারণাই তোমার হয়ে গেছে।"

পড়াশুনার উৎপাত চুকিয়া গেল, দেখিয়া সাবিত্রী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, ইহার পর আর বোধ হয় তাহাদের ঝগড়া হইবে না। তাহাদের সখীদের মত সেও নিশ্চিন্ত মনে স্বামীর আদরিণী হইয়া দিন কাটাইতে পারিবে। কিন্তু কপালই ছিল তাহার খারাপ। দুইদিন একরকম কাটিল, তিন দিনের দিন আবার ঝগড়া বাধিয়া গেল। বেলা দশটা এগারোটায় নিরঞ্জন বেড়াইয়া ফিরিতেছিল। তাহাদের বাড়ী আসিবার পথ, গ্রামের পুকুরের পাশ দিয়া গিয়াছে। সাবিত্রী আরো দুই চারিটি মেয়ের সঙ্গে স্নান করিয়া, কলসীতে জল লইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। পল্লীর প্রথামত তাহার পরণে শুধু একখানি শাড়ী, জলে ভিজিয়া একেবারে স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছিল। উহার ভিতর দিয়া তাহার গৌরবর্ণ তনুর আভা দিব্য বাহির হইতেছিল। নিরঞ্জন এইসব নিলর্জ্জতা দুচোখে দেখিতে পারিত না। সাবিত্রীকে দেখিয়াই মন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর যখন দেখিল প্রতিবেশী-পুত্র যাদব মিত্র কিছুদূরে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া মেয়েগুলিকে দেখিতেছে, তখন তাহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া গেল। দ্রুতপদে গিয়া যাদবের কান ধরিয়া মুখটা সে অন্যদিকে ফিরাইয়া দিল।

বাড়ী আসিয়া দেখিল, সাবিত্রী তখন ভিজা কাপড় ছাড়িয়া চুল আঁচড়াইয়া সিন্দুর-টিপ পরিতেছে। স্বামীকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা জব্দ করেছ বাঁদরটাকে। আমরা হেসে মরি আর কি!"

নিরঞ্জন হাসিল না, মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "এসব বাঁদরের সৃষ্টি তোমরাই কর। দোষ দুজনেরই, মার খেলে আবশ্য একলা সে।"

সাবিত্রী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তার মানেটা কি হল ?"

নিরঞ্জন বলিল, "মানেটা এই যে, ওরকম বেহায়ার মত ক'রে পথে ঘাটে চললে, যদি কেউ হাঁ ক'রে তাকায়, তাকে দোষ দেবার কোন অধিকার তোমাদের অন্ততঃ নেই। তোমরাই না জগতের মধ্যে সবচেয়ে লজ্জাবতী ব'লে প্রসিদ্ধ ? তাহলে ওরকম ক'রে লোকের সামনে বেরোও কোন্ আক্কেলে ? একখানা শাড়ীর বেশী কিছু পরলে যদি তোমাদের ধর্ম্মচ্যুত হতে হয়, তাহলে ঘরের মধ্যে থাকা উচিত তোমাদের। বাইরে বেরোতে হলে একটু সভ্যভাবে বেরোনো দরকার।"

সাবিত্রী রাগের আতিশয্যে কাঁদিয়াই ফেলিল। ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "যা মুখে আসে তাই বল্‌বে নাকি আমাকে ? আমি একলা ঐরকম করি নাকি ? তোমার বোনেরা করে না ? তোমার মা খুড়ী জ্যেঠী করেন নি ? তাঁদের বল্‌তে পারো এমনি ক'রে ?"

নিরঞ্জন বলিল, "না, তা পারি না। কিন্তু তাঁরা করেছেন ব'লেই অন্যায়টা ন্যায় হয়ে যেতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কেবল পরস্পরকে আদর করবার আর মিষ্টি কথা বলবার নয়। দুজনের সবদিকে উন্নতি অবনতির জন্যে দুজনে দায়ী। আমি অন্যায় করলে বা বোকামী করলে তোমার আমাকে বলবার যেমন অধিকার আছে, আমারও তেমনি আছে।"

সাবিত্রী কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, "দেখতে না পারলে, মানুষের চলন বাঁকা হয়। গোড়ার থেকে আমার কিছু তুমি ভাল চোখে দেখ না। মেম সাহেব পছন্দ ত তাই বিয়ে করলেই হত ? ভাই যেমন করেছে ?"

নিরঞ্জন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ফলে সাবিত্রীর রাগ বাড়িল বই কমিল না। নিরঞ্জনের ছুটি ফুরাইয়া গেল। স্ত্রীর সঙ্গে সব কথায় তর্ক করিয়া, আর তাহার ফোঁশ-ফোঁশানি শুনিয়া শুনিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কলকাতায় ফিরিয়া আসিয়া একরকম সে হাঁফ ছাড়িয়াই বাঁচিল। মনে একটা অশান্তি তাহার থাকিয়াই গেল। নিজের বিবেক-বিরুদ্ধ কাজ করার প্রতিফল তাহাকে পাইতেই হইবে, তাহা সে বুঝিতে পারিল। সাবিত্রীকে নিজের মনের মতন করিয়া গড়িবার ক্ষমতা তাহার যে নাই তাহা ত দেখাই গেল। এখন হয় চিরদিন তাহাকে একলা কাটাইতে হইবে, না-হয় নিজের মতামত বিসর্জ্জন দিয়া স্ত্রীর বাধ্য অনুচর হইতে হইবে।

পূজার ছুটিতে সে আর বাড়ী গেল না। তারাসুন্দরী অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া চিঠি লিখিলেন, সাবিত্রী রাগ করিয়া চিঠি লেখা ছাড়িয়াই দিল, তবু নিরঞ্জনের সঙ্কল্প টলিল না। সে পড়াশুনায় ডুবিয়া রহিল, নিজেকে কিছু ভাবিবার অবকাশও দিল না।

কয়েকটা বছর কাটিয়া গেল। তাহার পড়াশুনার পালা সাঙ্গ হইল, বেশ ভালভাবেই হইল। এখন একবার বাড়ী না যাইলেই নয়।

অবশ্য এ কয় বছরের ভিতর একবারও সে বাড়ী যায় নাই, তাহা নহে। তারাসুন্দরী অত সহজে ছাড়িবার পাত্রী ছিলেন না। তবে সববারে সাবিত্রীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত না। নিরঞ্জনের উপর রাগ এবং অভিমান তাহার দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিল। স্বামী যখন তাহাকে একরকম ত্যাগই করিয়াছে, তাহাকে যখন তাঁহার পছন্দই নয়, তাহা হইলে কেন অনর্থক সে তাঁহার গায়ে পড়িয়া ভাব করিতে যাইবে? সুতরাং ছুটির পূর্ব্বে অত্যধিক রকম কান্নাকাটি করিয়া, সে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী চলিয়া যাইত। যেবার থাকিত সেবার ঝগড়াঝাটি হইত, আবার ভাবও হইত। কিন্তু নিরঞ্জন কলিকাতায় যাইবার সময় দুজনের মনেই একটু অনুতাপ দেখা দিত। সাবিত্রী ভাবিত, 'ক'টা দিন মাত্র ছিলেন, অত ঝগড়া না করলেই পারতাম। অদৃষ্টে ত বছরের মধ্যে একটা মাসের বেশী ওঁকে চোখে দেখাও লেখা নেই।' নিরঞ্জন ভাবিত, 'মানুষের স্বভাব যায় না ম'লে কথাই আছে। সুতরাং শুধু শুধু মেয়েটাকে কাঁদিয়ে আর হবে কি? দুজনে দুপথে চল্‌তে হবে, এটা মেনে নিলেই পারি।'

পরীক্ষায় পাশ যে হইবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ তাহার ছিল না। কাজের সন্ধান কিছু করিয়া তবে বাড়ী যাইবে মনে করিয়া, সে কলিকাতায় একটু দেরী করিতে লাগিল। কিন্তু এই সময় সাবিত্রীর এক পত্র আসিয়া সব প্ল্যান উলট্‌পালট্ করিয়া দিল।

সাবিত্রীর সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছিল। অভিমান করিয়া পূর্ব্বে সেকথা নিরঞ্জনকে সে জানায় নাই। নিরঞ্জন নিশ্চয়ই জানে মনে করিয়া তারাসুন্দরীও আর ছেলেকে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি সাবিত্রীর শরীরের অবস্থা এমন হইয়া উঠিয়াছে, যে স্বামীকে না জানাইয়া আর সে পারিল না। সন্তান হইবার জন্ত সে পিতৃগৃহে যাইতেছিল, কারণ তারাসুন্দরী তাহাকে রাখিতে ভরসা পাইতেছিলেন না। নিরঞ্জনকে

একবার আসিয়া শেষ দেখা দিয়া যাইবার জন্য সে মাথার দিব্য দিয়া অনুরোধ করিয়া চিঠি শেষ করিয়াছিল।

নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি দেশে চলিয়া আসিল। মায়ের কাছে কয়েকদিন থাকিয়া, সে সাবিত্রীকে দেখিতে গেল। পত্নীর অবস্থা দেখিয়া তাহার মন আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সাবিত্রীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার প্রস্তাবও করিল, কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ী কাহারও মত হইল না। তাঁহারা নিরঞ্জনের কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন। ছেলে হওয়া আর এমন কি ব্যাপার, যাহার জন্য কলিকাতায় দৌড়াইতে হইবে? নিজের বাড়ী হইলে নিরঞ্জন জেদ করিতে পারিত, কিন্তু এখানে সঙ্কোচ বোধ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

প্রসবের সময় সাবিত্রীকে লইয়া রীতিমত যমে-মানুষে টানাটানি আরম্ভ হইল। শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা অত্যন্তই গোঁড়া, তাঁহারা খ্রীষ্টান লেডী ডাক্তার পর্য্যন্ত ডাকিতে প্রস্তুত নন। পাড়াগাঁয়ের অজ্ঞ ধাত্রীর উপর তাঁহাদের অগাধ বিশ্বাস। প্রথম দিন নিরঞ্জন কোনমতে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন সাবিত্রীর যন্ত্রণা-কাতর চীৎকার তাহার লজ্জা সঙ্কোচ সব দূর করিয়া দিল। শ্বশুর-শাশুড়ীর অমতেই সে ডাক্তার নার্স প্রভৃতি জোগাড় করিয়া আনিল। দুই দিন দুই রাত মাতাকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করাইয়া নিরঞ্জনের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

সাবিত্রীর অবস্থা একটু ভাল হইতেই নিরঞ্জন কলিকাতায় ফিরিবার জোগাড় করিতে লাগিল। কয়দিন এই আচার-বিচারের অচলায়তনে থাকিয়াই তাহার যেন নিঃশ্বাস-রোধ হইয়া আসিতেছিল। সকল রকম অন্ধতা এবং অজ্ঞতার উপর সে চিরদিনই খড়্গহস্ত ছিল, এখন তাহার মন আরো কঠিন হইয়া উঠিল, নিজের পত্নীর দশা দেখিয়া। সে উপস্থিত না থাকিলে সাবিত্রী যে নিশ্চয় মারা যাইত, এবিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কুসংস্কার এবং অজ্ঞতার সহিত আপোসে মিটমাট করিয়া একটু শান্তিতে থাকিবার যে ইচ্ছা তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে সে নির্ম্মমভাবে মন হইতে বিদায় করিয়া দিল। না, এ সংগ্রাম জীবন থাকিতে তাহার মিটিবার নয়। সাবিত্রীর ঘরে যাওয়াটাও এবাড়ীর লোকে পছন্দ করিত না। তবে সে ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যখন স্ত্রী-কন্যাকে দেখিতে গেল তখন কেহ বিশেষ কিছু আপত্তি প্রকাশ করিল না। অশুচি দেহে তাহাদের ছোঁয়া না লাগিলেই হইল।

সাবিত্রীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, "আচ্ছা, চল্‌লাম তবে এখন। দেখো, খুব সাবধানে থেকো। জলটল ঘেঁটে অসুখ বাধিও না যেন।"

শিশু তখন নিদ্রামগ্ন। তাহাকে দেখাইয়া সাবিত্রী বলিল, "এইবার আর উড়ে উড়ে বেড়াতে পারবে না, এইবার পায়ে বেড়ি পড়বে। মায়ার বন্ধন কা'কে বলে বুঝবে।"

নিরঞ্জন বলিল, "ভাল কথা মনে ক'রে দিয়েছ। খুকীর নাম তাহলে মায়াই থাক।"

সাবিত্রী বলিল, "শুধু মায়া আবার কি রকম নাম হবে? এতটুক? তার চেয়ে নাম থাক মহামায়া। বেশ শুনতেও ভাল, ঠাকুর দেবতার নাম।"

নিরঞ্জন বলিল, "তা বেশ, যা তোমার খুসি। যদিও মেয়ের আকৃতি এখন যতটুকু, তাতে 'মহা' ওয়ালা নাম ঠিক মানায় না। মায়া ব'লে ডাকলেই চল্‌বে এখন।"

নিরঞ্জন কলিকাতায় চলিয়া আসিল। মায়ার জন্মগ্রহণে তাহার চোখে জগৎ-সংসার এখন অনেকটাই অন্য মূর্ত্তি ধরিল। সন্তানকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার একটা দৃঢ় সংকল্প তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। মায়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী সে। তাহার শুভাশুভ সকলই নির্ভর করিতেছে তাহার পিতামাতার উপর। সাবিত্রী সম্বন্ধে নিরঞ্জন একরকম হতাশই হইয়া পড়িয়াছিল, কন্যার শিক্ষাদীক্ষার ভার যে একলা তাহাকেই লইতে হইবে, এবং তাহা লইয়াও যে সাবিত্রীর সঙ্গে ঝগড়া বাধিবে, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। কিন্তু কন্যা সবে মাত্র কয়েকদিন হইল জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এখনও তাহার সম্বন্ধে অত ভাবনা না ভাবিলেও চলে, মনে করিয়া এসব চিন্তা নিরঞ্জন মন হইতে দূর করিয়া দিল। এখন তাহার সাংসারিক উন্নতির বিষয় ভাবিতে হইবে, কারণ অর্থহীন লোকের যে সকল-দিকেই বাধা পাইতে হয়, তাহা নিরঞ্জন এই অল্প বয়সেই হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিল। সে ভাল কাজের চেষ্টায় দিনরাত ঘোরাঘুরি লেখালেখি করিতে লাগিল।

কাজ দুই-চারিটা জুটিতে লাগিল, কিন্তু প্রায়ই বাংলা দেশের বাহিরে। পূর্ব্বে হইলে নিরঞ্জন বিন্দুমাত্র আপত্তি করিত না, কিন্তু এখন বাংলা দেশ ছাড়িয়া বেশী দূরে যাইতে তাহার মন উঠিল না। কন্যাকে তাহা হইলে সে বৎসরে একবারও দেখিতে পাইবে কিনা সন্দেহ। অবশেষে অপেক্ষাকৃত

অল্প টাকারই একটা চাকরি লইয়া সে কলিকাতার কাছাকাছি এক জায়গায় বাসা করিয়া বসিল।

সাবিত্রী এবং মায়াকে নিজের কাছে লইয়া আসিবার একটা আকাঙ্ক্ষা তাহাকে ক্রমাগত অস্থির করিতে লাগিল। কিন্তু সহজে যে তাহা হইবার নয়, তাহাও সে মনে মনে বুঝিল। তারাসুন্দরী ত বাধা দিবেনই এবং সাবিত্রী নিজেও আসিতে চাহিবে না। তবু চেষ্টা করিয়া দেখিবার ইচ্ছায়, নিরঞ্জন মাতা এবং পত্নী উভয়কেই এ বিষয়ে চিঠি লিখিল।

যেমন আশঙ্কা করিয়াছিল, ঠিক তাহাই ঘটিল অবশ্য। তারাসুন্দরী কান্নাকাটি, অনুযোগ, হা হুতাশ করিয়া তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিলেন। নিরঞ্জনও তাহা হইলে মনোরঞ্জনের দলেই ভিড়িতে চায়? মায়ের সুবিধা অসুবিধা দেখা কি কলিকালের ছেলেদের বারণ? স্বার্থই কি সব? বাপ-পিতামহের আদর্শ দেখিয়াও কি তাহারা শেখে না? ইত্যাদি।

সাবিত্রীর নিকট হইতেও বিশেষ আশাজনক উত্তর কিছু আসিল না। শাশুড়ী যাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন এমন কোনো কাজ করা তাহাদের উচিত নয়। তাহার উপর মায়া এখন একেবারে শিশু, সাবিত্রী একলা তাহাকে সামলাইতে পারে না, কিছুদিন মা বা শাশুড়ী কাহারও নিকটে তাহার থাকা প্রয়োজন। তাহার নিজেরও শরীর ভাল নয়, সহরে গিয়া আরও হয়ত খারাপ হইবে। নিরঞ্জন বুঝিল, আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া তাহার কাছে আসিয়া থাকার ইচ্ছা স্ত্রীর নাই। দেশে থাকিলে সে আপনার মতে চলিতে পারে, কারণ নিরঞ্জন ভিন্ন সকলেই তাহার সঙ্গে সেখানে একমত। কিন্তু এখানে আসিলে নিতান্তই স্বামীর হাতের মুঠায় আসিয়া পড়িতে হইবে, মনে মনে এ ভয়ও সাবিত্রীর ছিল বোধ হয়।

নিরঞ্জন তখনকার মতন চুপ করিয়া গেল। সুবিধা পাইলেই বাড়ী গিয়া স্ত্রী-কন্যাকে দেখিয়া আসিত। মায়ার চেহারা তাহার সুন্দরী মাতার ধরণেরই হইয়াছিল, আশেপাশে ও নিজের বাড়ীতে তাহার আদরের সীমা ছিল না। আদরের আতিশয্যে মেয়ের পাছে মাথা ঘুরিয়া যায়, এ ভয় নিরঞ্জনের মধ্যে মধ্যে হইতে লাগিল।

মায়া যখন দুই বৎসরের তখন নিরঞ্জন আরও ভাল কাজ পাইল। এবারেও সাবিত্রীকে লইয়া যাইতে চাহিল। তারাসুন্দরীর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সেই ওজরে, এবারও সাবিত্রী যাইতে অস্বীকার করিল।

নিরঞ্জন বুঝিল, স্ত্রী-কন্যা লইয়া ঘর করা তাহার অদৃষ্টে নাই। কর্ম্মস্থানে কলাই গেল। তবু মায়ার বন্ধনে যে সে সত্যই ধরা দিয়াছে তাহা বুঝিতে ারিল। ছুটি পাইলেই মেয়েকে সে আসিয়া দেখিয়া যাইত।

৪

তারাসুন্দরীর শ্রাদ্ধের পর দিন-তিন-চার কাটিয়া গিয়াছে। নিরঞ্জনের টি আর মাত্র কয়েকদিন আছে। এবারে সে কি প্রকার ব্যবস্থা করিয়া ইবে, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না। সাবিত্রীকে এখন ার এখানে রাখার কোন প্রয়োজনই নাই। বরং রাখার অনেক অসুবিধা। ক তাহাদের দেখাশোনা করিবে? আশে পাশে জ্ঞাতিশত্রুর অভাব নাই। ারাসুন্দরী বাঁচিয়া থাকিতে বিশেষ ভাবনা ছিল না। এক কথা শুনিলে, তনি বাড়ী বহিয়া গিয়া দশ কথা শুনাইয়া আসিতেন। কিন্তু সাবিত্রী ছেলেমানুষ এবং বৌ মানুষ, সে এতটা জোর খাটাইতে পারিবে না। ারঞ্জনের বোন ইন্দু বৎসর খানেক হইল বিধবা হইয়া বাপের বাড়ী ফিরিয়া াসিয়াছে, সেও সাবিত্রীর সমবয়সী, কাজেই বৌয়ের তত্ত্বাবধান করা তাহার ারা হইবে না। ছোট বোন শ্বশুরবাড়ীতে, এবং ছোট দুই ভাইয়ের ভতর বড়টি কলিকাতায় কলেজে পড়ে, ছোটটি এই বৎসর গ্রামের স্কুল ইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে।

নিরঞ্জনের ইচ্ছা ছিল যে, সাবিত্রীকে এবং ইন্দুকে নিজের সঙ্গে লইয়া ায়। ছোট ভাই ইচ্ছা করিলে তাহার সঙ্গেও থাকিতে পারে, না হয় লিকাতার বোর্ডিংএ থাকিয়াও পড়াশুনা করিতে পারে।

দেশের বাড়ী বন্ধ করিয়া গেলেই হইবে। আত্মীয়-স্বজনেরও অভাব ই, তাহাদেরও কাহাকেও আনিয়া বাড়ীর চৌকিদারী করিতে রাখিয়া াওয়া যায়। অবশ্য পরিবার দেশে থাকিলে খরচপত্রের দিক্ দিয়া অনেক বিধা; সঙ্গে লইয়া গেলে, নিরঞ্জনের মাহিনার প্রায় সবই খরচ হইয়া াইবে, টাকা জমানো বেশী ঘটিয়া উঠিবে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, উহাদের ঙ্গে লইয়া যাওয়াই যে সবদিক্ দিয়া শ্রেয় বিবেচনা করিতেছিল।

কিন্তু এবারেও তাহা ঘটিয়া ওঠা সম্বন্ধে তাহার মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল। বিত্রীর মতামতের দৃঢ়তা বয়সের সঙ্গে বাড়িয়াছে বই কমে নাই। আচার- ষ্ঠায় এবং দেবদ্বিজে ভক্তিতে এখন যে-কোনো বর্ষীয়সীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায়

সে জয়লাভ করিতে পারে। দিনে কতবার যে সে স্নান করে এবং কাপড় ছাড়ে, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। বালিকা মায়ার পৃষ্ঠে চড় কিল প্রায় সারাদিনই বর্ষিত হয়, তাহার স্লেচ্ছ ধরণ-ধারণের জন্য। নিরঞ্জন আসিবার সময় সঙ্গে করিয়া মেয়ের জন্য জুতা মোজা, রেশমী ফ্রক, প্রভৃতি লইয়া আসিয়াছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই ফ্রক, মোজা, জামা, জলে কাচার চোটে শুদ্ধ হইয়া এমন রূপ ধারণ করিল যে, রেশম বলিয়া সেগুলিকে চিনিবার আর কোনো উপায় রহিল না। অবশেষে জুতাজোড়াও যেদিন এঁটো ভাত মাড়ানোর অপরাধে সাবিত্রী বেশ করিয়া ধুইয়া দিল, সেদিন নিরঞ্জন সেগুলিকে ছুঁড়িয়া একেবারে প্রাচীর পার করিয়া দিল। স্ত্রীর সম্বন্ধে কি যে করা যায় ভাবিয়া আর সে কূল দেখিতে পাইল না। ইহাকে রাখিয়া গেলেও বিপদ্, লইয়া গেলেও বিপদ্। তবু শেষোক্ত বিপদ্‌টাই বরণ করিয়া লইবার জন্য সে মনে মনে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। স্ত্রীর সংশোধনের অতীত অবস্থা, কিন্তু মায়াকেও আর বেশীদিন কেবলমাত্র তাহার হাতে ফেলিয়া রাখিলে, সেও শীঘ্রই মাতার পদানুসরণ করিবে।

সেদিন দুপুরবেলা খাইয়া-দাইয়া সকলে বিশ্রাম করিতেছিল। মায়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিরঞ্জন একখানা বই লইয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতেছিল, সাবিত্রী কিছুদূরে বসিয়া একখানা কাঁথা সেলাই করিতেছিল।

বই পড়িতে পড়িতে নিরঞ্জনেরও একটুখানি তন্দ্রা আসিয়া পড়িয়াছিল হঠাৎ সাবিত্রীর কণ্ঠস্বরে সজাগ হইয়া সে আবার বইখানা চোখের সামনে ভাল করিয়া তুলিয়া ধরিল।

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "আর তোমার ছুটি ক'দিন?"

নিরঞ্জন বলিল, "বেশী আর কই? শেষ ত হয়ে এল। আর হপ্তাখানেক-মাত্র।"

সাবিত্রী বলিল, "সবাই আছে, অথচ একজনের অভাবে বাড়ী যেন খাঁ খাঁ করছে। এবার তুমি চ'লে গেলে, মনে হবে যেন একলা বাড়ীতে আছি।"

নিরঞ্জন ভাবিল, তাহা হইলে এখানে থাকা সাবিত্রী স্থির করিয়া রাখিয়াছে। মুখে বলিল, "এবার ত তোমাদের সকলকে নিয়ে যাব ভাবছি

সাবিত্রীর হাত হইতে কাঁথা পড়িয়া গেল। সে বলিল, "ওমা, তা কি ক'রে হবে? বাড়ীঘর দেখবে কে? ঠাকুরঝি রয়েছে, ছোটঠাকুরপো রয়েছে, তাদের ফে'লে যাওয়া যায় নাকি?"

নিরঞ্জন বলিল, "তাদের ফে'লে যাওয়ার কথা কে বলছে? তোমার ওজর একটা না একটা লেগেই আছে। ইন্দু, খোকা আমাদের সঙ্গেই যাবে। খোকাকে কলকাতার স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেব। মেয়েটাও পাঁচ বছরের হতে চলল, ওরও কিছু দিনের মধ্যেই পড়াশুনো আরম্ভ করতে হবে, নইলে একেবারে বয়ে যাবে।"

সাবিত্রী বলিল, "সে তোমার যা খুসি। মেয়ের উপর আমার হাত নেই। আমি কিন্তু ঘর ছেড়ে যেতে পারব না। মা মরবার সময় তাঁকে কথা দিয়েছি, শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে যাব না। ঘরে প্রদীপ জ্বল্‌বে না, গৃহদেবতা উপোস থাক্‌বেন, এতে অকল্যাণ হবে না?"

নিরঞ্জন বলিল, "তা বেশ, সব ব্যবস্থাই হয়ে গেছে দেখছি। আমার সঙ্গে তাহলে তুমি কিছুতেই যাবে না?"

সাবিত্রী বলিল, "কি ক'রে আর যাওয়া চলে?"

নিরঞ্জন বলিল, "ভাল! কিন্তু নিজে যখন তুমি নিজের মতেই চল্‌বে, তখন আমিও তাই চল্‌ব। এতদিন ভাল ভাল কাজ সব হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছি, কেবল তোমাদের কাছাকছি থাকার জন্যে। কিন্তু সেটা আমার বোকামীই হয়েছে, কারণ আমার সঙ্গের কোনো প্রয়োজন তোমার নেই। এখনও ইচ্ছে করলে ভাল কাজ আমি পেতে পারি, দূরে গেলে। এবার তাই যাবও। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, আমার সঙ্গে যেতে এত প্রবল আপত্তি হওয়ার কারণটা কি? আমি তোমায় নিয়ে গিয়ে মেরে ফেল্‌ব বা কেটে ফেল্‌ব, এ রকম মনে করার কোনো হেতু আছে কি?"

সাবিত্রী খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "মরা মানুষকে কথা দিয়েছি। শ্বশুরের ভিটেয় প্রদীপ না জ্বল্‌লে তিনি স্বর্গ থেকে অসন্তুষ্ট হবেন।"

নিরঞ্জন বলিল, "তার বেশ ভাল ব্যবস্থা ক'রে তবে তোমায় নিয়ে যাব।"

সাবিত্রী তখন বলিল, "দেখ, তবে আসল কথা খুলেই বলি। সহরে গিয়ে আমি থাকতে পারব না। সেখানে আচার-বিচার কিছু রক্ষা করা যায় না। তুমি আমার কথামত কিছু চলবেও না। এই নিয়ে ক্রমাগত ঝগড়াঝাঁটি হতে থাকবে। সুখশান্তি কিছু থাকবে না। তার চেয়ে যে যার মত থাকা ভাল নয় কি? বেশ ত আছি, মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎও হচ্ছে।"

নিরঞ্জনের মুখ একেবারে প্রলয়াকাশের মত কালো হইয়া উঠিল। সে বলিল, "এই জন্যে যেতে চাও না? স্বামীর চেয়ে তোমার আচারই বড় হল?"

সাবিত্রী বলিল, "হিন্দুর মেয়ে, ধর্ম্ম ছাড়লে তার আর থাকে কি?"

নিরঞ্জন বলিল, "আমার সঙ্গে গেলে তোমার ধর্ম্ম ছাড়তে হবে?"

সাবিত্রী কলহের সুরে বলিল, "তা এক রকম হবে বৈকি? এমনিতেই বলে কত কথা শুনি, আমার মা-বোনেরা জিজ্ঞেস করলে চেপে যাই।"

নিরঞ্জন বলিল, "কি শোন? চেপে যাবার মত কি কথা তুমি শুনতে পার?"

সাবিত্রী বলিল, "তুমি নাকি হোটেলে মুরগী খাও, পৈতে ফে'লে দিয়েছ। আবার নাকি ব্রাহ্মসমাজেও যাও? তোমার কলকাতার লোকেই বলেছে।"

নিরঞ্জন বলিল, "কিছু মিথ্যে বলে নি।"

সাবিত্রী গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, এই ত নিজের মুখেই স্বীকার পেলে। তবে আমি যাই কি ক'রে? শেষে আমাকেও জুতো মোজা ঘাঘরা পরিয়ে ব্রাহ্মসমাজে টেনে নিয়ে যাও আর কি? আমার বাপ-মা আর তাহলে আমার ছোঁয়া জল খাবে না।"

নিরঞ্জন উঠিয়া পড়িল, বলিল, "ভাল, সব কথা খোলাখুলি যে হয়ে গেল, তাতে লাভ বই লোকসান নেই। এইখানেই থাক, যেমন খুসি থাক। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম, কিন্তু এর পর কোথায় কখন থাকব কিছু ঠিক ঠিকানা নেই। অতটুকু বাচ্চা তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারবেও না। আর দুবছর পরে ওকে নিয়ে যাব। কিন্তু তুমি আর কোনোরকমের কোনো দাবী আমার উপর রেখো না। মনে মনেও না।"

সাবিত্রী কাঁদিতে আরম্ভ করিল। নিরঞ্জন উঠিয়া চলিয়া গেল।

নিরঞ্জন তাহার পরদিনই যাত্রার জোগাড় দেখিতে লাগিল। ভাই-বোনেরাও এইখানেই থাকিবে স্থির হইয়া গেল। মায়াকে পড়াইবার জন্য গ্রামের পণ্ডিত মহাশয়কে সে বলিয়া স্থির করিয়া গেল।

সাবিত্রী দুই-চারবার আবার তাহার না-যাওয়ার কারণগুলি ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নিরঞ্জন আর সেকথায় কানই দিল না। পত্নীর ব্যবহারে তাহার মনে কঠিন আঘাত লাগিয়াছিল। পত্নীর প্রতি মমতা ভালবাসা তাহার যথেষ্টই ছিল। ঝগড়াঝাঁটি প্রায়ই হওয়া সত্ত্বেও

সে এতদিন মনে করিত, সাবিত্রীও তাহাকে ভালই বাসে। কিন্তু এতদিনে বুঝিতে পারিল, স্বামীর প্রতি ভালবাসার অভাবই এত কলহের প্রধান কারণ। তাহার কাছে স্বামী সংসারের পাঁচটা মানুষের একটা, শাস্ত্রে আছে স্বামীকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে হয়, তাই সে যতটা পারে ভক্তি করিতে চেষ্টা করে। হিন্দুর মেয়ে, স্বামীর উপরেই তাহাদের একমাত্র নির্ভর; সুতরাং প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিতে সে এতদিন পারিয়া ওঠে নাই। কিন্তু যখনই স্বামীর জন্য তাহার মতামত বা স্বার্থ একটু কণামাত্র ছাড়িবার ডাক আসিয়াছে, তখনই সে উগ্রভাবে অস্বীকার করিয়াছে। যাহার হৃদয়কেই সে জয় করিতে পারিল না, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আইনের জোরে তাহাকে দখল করিয়া রাখার ইচ্ছাও নিরঞ্জন মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। মানুষ মাত্রেরই স্বাধীনতার অধিকার আছে। সাবিত্রী হিন্দু ঘরের স্ত্রী হইলেও মানুষ! তাহার জীবনে স্বামীর যদি প্রয়োজন কিছু না-ই থাকে, তাহা হইলে নিরঞ্জন কেন বর্ব্বরের মত সেখানে স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে? তবে মায়ার উপর তাহার অধিকার সে ত্যাগ করিবে না। তাহার সন্তানের শুভাশুভের জন্য সেই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। কন্যা যাহাতে মনুষ্য-জীবনকে সার্থক করিতে পারে, এমন শিক্ষাদীক্ষা তাহাকে দিতে হইবে। তাহার জীবন যেন কোথাও পঙ্গু না হয়, তাহার দৃষ্টি যেন ক্ষীণ না হয়। কিন্তু এখনই তাহাকে লইয়া যাইবার কোনো উপায় নাই। সম্মুখের কয়েকটা বৎসর তাহাকে কেবল প্রাণপণে আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। এই একমাত্র সন্তান তাহার মায়া, তাহাকে যেমন করিয়া গড়িতে চায়, তাহার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তাহার হইবে। তখন যেন অর্থাভাবে তাহাকে বিফলপ্রযত্ন না হইতে হয়।

নিরঞ্জন যে একেবারেই যাইতেছে তাহা সাবিত্রী ভিন্ন আর কেহই জানিত না। তাহার জিনিষপত্র বাঁধা হইতেছে দেখিয়া মায়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বাবা, আমি যাব তোমার সঙ্গে।"

নিরঞ্জন বলিল, "এর পরের বার এসে তোমায় নিয়ে যাব, মা।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "আবার ক'দিন পরে আসবে বাবা?"

নিরঞ্জন বিষণ্নভাবে বলিল, "অনেক দিন পরে মা।"

মায়ার স্বভাব, কথা একবার আরম্ভ করিলে সে সহজে থামিতে চায় না। আবার প্রশ্ন হইল, "আমার জন্যে কি আনবে?"

নিরঞ্জন বলিল, "তোমার জন্তে সব আনব, যা যা চাও।" এমন লোভনীয় সম্ভাবনায় অতিশয় খুসী হইয়া মায়া পিসীমাকে খবর দিতে চলিয়া গেল।

নিরঞ্জনের ট্রেণ দুপুরে। সকাল সকাল স্নানাহার সারিয়া সে প্রস্তুত হইয়া লইল। সাবিত্রী সকাল হইতে বিষণ্ণ হইয়া আছে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াটা এতখানি প্রবলরূপ ধরিবে, তাহা সে মনে করে নাই। স্বামী কি সত্যই তাহাকে ত্যাগ করিলেন নাকি? ইহার পর লোকের কাছে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? সকলে তাহাকেই দোষী করিবে। যে বাপের বাড়ীর নিন্দার ভয় তাহার এতখানি, তাহারাই কি আর তাহাকে ছাড়িয়া কথা কহিবে? মা বাবা নাই বলুন, বোনেরা ভাজেরা এই লইয়া নিশ্চয় বলাবলি করিবে। কিন্তু সাবিত্রী নিরুপায়। স্বামীর মতিগতি যে দিকে গড়াইতেছে, আর কিছুদিনের মধ্যে সে খ্রীষ্টান কি ব্রাহ্ম কিছু একটা হইয়া বসিবে। তাহার সঙ্গে থাকিতে হইলে সাবিত্রীকে আত্মীয়স্বজন, ধর্ম্ম, মত, সব বিসর্জ্জন দিতে হইবে। তাহা হইলে বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? মা গঙ্গা তাহাকে শীঘ্র কোলে টানিয়া লইলে সে বাঁচে! হিন্দুর মেয়ে সে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কুলে তাহার জন্ম। তাহাকে যেন গোভাগাড়ে গিয়া মরিতে না হয়। ইহকালে সুখ অদৃষ্টে নাই, কিন্তু পরকালে সদ্‌গতি যেন হয়।

ইন্দু আসিয়া প্রণাম করিল। বলিল, "মেজদা, পৌছেই খবর দিও। কি ক'রে যে এ বাড়ীতে থাক্‌ব!"

নিরঞ্জন বলিল, "হ্যাঁ, খবর দেব। তুই চিঠিপত্র লিখিস্। বুড়ো পণ্ডিত ঠিক মত মায়াকে পড়ায় কিনা জানাস্। তাকে মাসে মাসে দশ টাকা ক'রে পাঠাব, ঠিক ক'রে যাচ্ছি।"

ইন্দু বলিল, "ওসব খবর ত বৌয়ের চিঠিতেই পাবে।"

নিরঞ্জন বলিল, "তবু তুই লিখিস্ ত। খোকাকে দিয়ে ইংরেজীতে ঠিকানা লিখিয়ে নিস্। ভাল চাকরি গোটা দুই সন্ধানে আছে, বাংলা দেশের বাইরে। সেখানে ইংরেজীতে ঠিকানা না লিখলে চিঠি পৌছাবে না।"

ইন্দু এসব কথার সোজাসুজি অর্থই বুঝিল। সাবিত্রী আধঘোমটা দিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বুঝিল, নিরঞ্জন আর তাহার সঙ্গে চিঠি-পত্র লেখার সম্পর্কও রাখিবে না। বাড়ীর খবর যাহাতে বোনের চিঠিতেই পায় তাহার জন্যই এত ব্যবস্থা দিয়া যাইতেছে।

মায়াকে চুম্বন করিয়া নিরঞ্জন গাড়ীতে গিয়া উঠিল। সাবিত্রীকে কোনোপ্রকার বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া গেল না।

বৌয়ের মন ভাল নাই মনে করিয়া ইন্দু খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে একলা রাখিয়া নিজেই ঘরের কাজ করিতে লাগিল। মায়াকেও কাছে কাছে রাখিল।

কিন্তু মায়ার দুধ-খাওয়ানোর সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবু সাবিত্রীর দেখা নাই। ইন্দু এঘর-ওঘর খুঁজিয়া দেখিল, সাবিত্রী ঠাকুর-ঘরে। বিগ্রহের সম্মুখে সে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে।

ইন্দু বিস্মিত হইয়া বলিল, "ওকি বৌ? অমন করে কাঁদ্‌তে আছে? দাদার অকল্যাণ হবে যে? দুদিনের জন্য গেছে বই ত নয়? বাবা, এত ঢংও তোমাদের আসে।"

সাবিত্রী উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ঢংই বটে! চিরদিনের মত স্বামী মুখে ঝাঁটা মেরে ত্যাগ ক'রে গেল, একটু কাঁদলেও সেটা ঢং হল?"

ইন্দু বলিল "ওমা, কি বল গো? ত্যাগ ক'রে গেল কি রকম? কেন?"

সাবিত্রী বলিল, "মেমসাহেব সাজতে পারিনি, আচার-বিচার ছাড়তে পারিনি, এই অপরাধে। তোমাদের সামনেই রয়েছি, আমার আর কি অপরাধ হয়েছে তোমারাই বল।"

ইন্দু বেশী উত্তেজনা বা আবেগের সময় সাবিত্রীকে তুই-তোকারি করিতে ছাড়িত না। সে বলিল, "এই সব নিয়ে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্ বুঝি? ছেলের মা হলি, তোর বুদ্ধি হবে কবে? পুরুষ মানুষের সঙ্গে কি লড়াই ক'রে জেতা যায়? তাদের কাছে হার মেনেই তাদের হার মানাতে হয়।"

সাবিত্রী বলিল, "হিন্দুর মেয়ে হয়ে, আচার-বিচার সব বিসর্জ্জন দিতে বল? তাহলে বেঁচে লাভ কি?"

ইন্দু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, "তোদের মধ্যে কতদূর কি হয়েছে জানি না বাপু। তবে দাদা যদি সত্যি না আসে আর, তাহলে এমনিতেও আর বেঁচে তোর কোনো লাভ হবে না। স্বামীকে এ জন্মের মত হারিয়েছি, তাই তার মূল্য এখন ভাল ক'রে বুঝি। মরবার সাহস নেই, তাই মরতে পারি না, কিন্তু আমার বাঁচার কোনো মানে নেই। ধর্ম্ম রাখার জন্যে স্বামী ছাড়লি? ধর্ম্ম তোকে কি সান্ত্বনা দেবে লো?

মেয়ে-মানুষের দেবতা পাথরের ঠাকুর নয় রে, রক্তমাংসের মানুষ। তুই তোর ঠাকুরকেও আজ হারিয়েছিস্ স্বামীর সঙ্গে। ফিরোবার পথ যদি থাকে ত তাকে ফিরিয়ে আন্।"

৫

নিরঞ্জন কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল, তাহার বক্ষের উপর যে বেদনার পাষাণভার চাপিয়া বসিয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও সে ভুলিতে পারিতেছিল না। এক জন্মের ভিতরেই তাহাকে জন্মান্তর ঘটাইতে হইবে। কাল যে-নিরঞ্জন দেশের বাড়ীতে ছিল, তাহার স্ত্রী আছে, কন্যা আছে, সংসার সমাজ সকলই আছে। কিন্তু আজ যে-নিরঞ্জন মহানগরীর বক্ষে একাকী দাঁড়াইয়া, তাহার কেহ নাই, এমন কি কেহ থাকার স্মৃতি পর্য্যন্ত এত বেদনাময়, যে, উহাও সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু চাহিলেই ত পারা যায় না? আর সব ভোলা যায়, কিন্তু মায়াকে সে কি প্রকারে ভুলিবে? সে যে তাহার জীবনের মূলে আপনার ক্ষুদ্র রাজত্ব পাতিয়া বসিয়াছে। তাহার সুন্দর মুখ, তাহার পাখীর কাকলীর মত অবিশ্রাম অনর্গল কথা, তাহার নানা ভঙ্গীতে নৃত্য ও ক্রীড়া, এ সকলের স্মৃতি কি পিতৃহৃদয় হইতে বিদায় দেওয়া সম্ভবপর? সত্য বটে সে সাবিত্রীকে বলিয়া আসিয়াছে যে, মায়া বড় হইলে সে তাহাকে লইয়া যাইবে, কিন্তু ভবিষ্যতেব গর্ভে কি আছে কে তাহা বলিতে পারে? মায়াকে আর কোনদিন সে চোখে দেখিবে কিনা তাহাই বা কে জানে? সাবিত্রীর কথা সে প্রাণপণ শক্তিতে মন হইতে দূর করিয়া দিল। যে-স্ত্রীর হৃদয়ে তাহার কোনোই স্থান নাই তাহাকে কেবল-মাত্র সামাজিক আইনের বলে দখল করিয়া রাখিবারও তাহার কোনো অধিকার নাই। সুতরাং তাহার জন্য দুঃখ পাইবারও প্রয়োজন নাই।

বাসায় আসিয়া উঠিয়া চারিদিকের বিশৃঙ্খল এবং অপরিচ্ছন্ন ভাবে তাহার মন আরো বিরক্ত হইয়া উঠিল। চাকর মোটেই আশা করে নাই যে, নিরঞ্জন এত শীঘ্র ফিরিবে, কাজেই মনের আনন্দে দিন কাটাইয়াছে, ঘরগুলি দিনে একবার ঝাঁট দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করে নাই। নিরঞ্জনকে হঠাৎ উপস্থিত হইতে দেখিয়া সে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

প্রভুর নিকট হইতে দু'-চারটা চড় চাপড় উপহার তাহার মিলিতে পারিত, যদি প্রভু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু চাকরের

কর্ত্তব্যে অবহেলার প্রতি খুব বেশী দৃষ্টি দিবার মত অবস্থা নিরঞ্জনের তখন ছিল না। "বাক্স বিছানা ভিতরে নিয়ে যা আর ঘরগুলো ঝাঁট দে," এই বলিয়া সে তক্তপোষের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। ভৃত্য এত সহজে নিষ্কৃতি পাইয়া কৃতজ্ঞচিত্তে ঘরদ্বার পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল।

ছুটির যে দুইটা দিন বাকী ছিল, তাহা হাজার ভাবনা ভাবিয়াই শেষ হইয়া গেল। বাংলা দেশে থাকিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। বাহিরের কাজের সন্ধান সে সর্ব্বদাই করিত, এখনও তাহার হাতে দুই তিনটা ভাল কাজ ছিল। এতদিন তারাসুন্দরী এবং সাবিত্রীর প্রতিকূলতায় সে এসব কাজ লইবার কথা ভাল করিয়া ভাবিতেও সাহস পায় নাই। কিন্তু এখন সে স্বাধীন। ভগবান্ মাকে লইয়া গিয়াছেন, পত্নী ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে মুক্তি দিয়াছে, তাহার আর কোন বাধা নাই। যেখানে ইচ্ছা সে যাইতে পারে, যেমনভাবে খুসি জীবন যাপন করিতে পারে।

তিনটা কাজের একটা পাঞ্জাবে, একটা মধ্যপ্রদেশে এবং একটা বর্ম্মায়। তৃতীয় স্থানেই মাহিনা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। নিরঞ্জন বর্ম্মা যাওয়াই মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিল। দেশ হইতে যত দূরে হয় ততই ভাল। ইহার পর যেভাবে সে দিন কাটাইবে, তাহাতে অর্থের প্রয়োজন যথেষ্টই হইবে। আর কোথাও কাহারও সঙ্গে তাহার আপোষ করিতে হইবে না। নিজের মতকে একবার বলি দিয়া তার যে পুরস্কার মিলিল, তাহাতে ও পথে যাইবার আগ্রহ তাহার চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে। আর কোথাও কোনো প্রকারেই সে নিজের মতকে ক্ষুণ্ণ করিবে না। তাহাকে সমালোচনা করিবার মানুষ এখন জগতে কেই বা আছে? তাহার কার্য্যে দুঃখ পাইবারও কেহ নাই। পত্নীর সহিত সকল সম্পর্ক তাহার ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং নিরঞ্জনের কার্য্যে কাহারও দুঃখ পাইতে হইবে না। ভগিনীদের মনে আঘাত লাগিলেও লাগিতে পারে। কিন্তু ভাইয়ের কথা বেশী ভাবিবার অবসর তাহাদেরই বা কোথায়? ইন্দু ত সংসারে থাকিয়াও নাই, ছোট বোন নিজের নূতন সংসারে, স্বামী-প্রেমের নূতন আস্বাদেই মজিয়া আছে। ভাইয়ের কথা মাসে একদিন তাহার মনে হয় কি না সন্দেহ। সুতরাং কাহাকেও আঘাত দিবার ভয়ে নিরঞ্জনকে নিরস্ত হইতে হইবে না।

তিনটা জায়গাতেই সে কাজের জন্য দরখাস্ত করিল, কারণ বর্ম্মার কাজটা যে হইবেই এমন কোনো কথা নাই। তবে তিনটার ভিতর একটা পাওয়ার

সম্ভাবনা তাহার খুবই আছে। এখানকার কাজেও সে নোটিশ দিল। কর্তৃপক্ষ তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহার কাজ ছাড়িতে চাওয়ায় সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিলেন। মাহিনা বাড়ানোর প্রস্তাবও উঠিল, কিন্তু নিরঞ্জন যাইতে বদ্ধপরিকর দেখিয়া শেষে সকলেই নিরস্ত হইল।

আসিয়া পর্য্যন্ত বাড়ীতে সে কোনো খবর দেয় নাই। অন্যান্যবার আসিয়াই টেলিগ্রাম করিত। এবার সাবিত্রীর কাছে চিঠিপত্র কিছুই লিখিবে না স্থির করিয়াছিল, সুতরাং টেলিগ্রাম করিল না। দিন-পাঁচসাত পরে ইন্দুকে একখানা পোষ্টকার্ড লিখিয়া নিজের কুশল এবং পৌছানর খবর দিল। তাহাদের দেশে জমিজমা হইতে যে আয় হয়, তাহাতে খাইয়া পরিয়া মোটামুটি থাকা যায়, কিন্তু হাত-খরচ বা লেখাপড়ার খরচের জন্য এক পয়সাও উদ্বৃত্ত থাকে না। মনোরঞ্জন একটি ভাইকে কলিকাতায় পড়িবার খরচ দেয়। ইহাই সে যথেষ্ট মনে করে। অন্যান্য খরচ এতকাল নিরঞ্জনই চালাইয়া আসিয়াছে। বরাবরই যে উহা তাহাকে চালাইতে হইবে সে বিষয়ে তাহার কোনো সন্দেহ ছিল না, এবং আপত্তিও ছিল না কিছু। কিন্তু টাকা এতকাল মায়ের কাছে পাঠাইয়া সে নিশ্চিন্ত ছিল, এখন কাহার কাছে পাঠাইবে এই হইল এক ভাবনা। ভগিনীর নিকট পাঠাইলে সাবিত্রী রাগে এবং অভিমানে তাহার এক পয়সাও স্পর্শ করিবে না, অথচ টাকার প্রয়োজন তাহার যথেষ্টই আছে। মাঝ হইতে মায়া বেচারী নানা দিকে কষ্ট পাইবে। ছোট ভাইটি বালক মাত্র, তাহার উপর ভরসা নাই। জ্ঞাতি যাহারা আছে, তাহারা কেহই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল, যাহার যত প্রয়োজন, তাহাকে তত টাকা আলাদা আলাদা পাঠাইয়া দিবে। তাহা হইলে কাহারও আর কিছু বলিবার থাকিবে না। সাবিত্রীর কাছে মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইলে নিরঞ্জনের বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইন্দুর নিকট হইতে শীঘ্রই উত্তর আসিল। সে মস্ত বড় চিঠি লিখিয়াছে। সকলের কুশল-সংবাদ দিয়া, এবং মায়ার অসাধারণ বুদ্ধির গুটিকয়েক নমুনা দিয়া, বাকি কাগজ সে সাফাই গাহিয়াই ভরাইয়া দিয়াছে। সাবিত্রী হাজার হইলেও ছেলেমানুষ, বুদ্ধিও এমন কিছু প্রখর নয়, সে যদি বোকামী করিয়া অন্যায় ব্যবহার কিছু করিয়া থাকে, বা অন্যায় কথা কিছু বলিয়া থাকে, তাহাতে এতখানি ক্রুদ্ধ হওয়া কি নিরঞ্জনের উচিত? বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীকে

কি এই সামান্য অপরাধে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করা যায়? বিশেষ তাহাদের সন্তান হইয়াছে একটি। মাকে ত্যাগ করিলে বালিকাকেও এক রকম ত্যাগই করা হয়। তাহার কি অপরাধ?

"যত সব বাজে বক্তৃতা" বলিয়া নিরঞ্জন চিঠিখানা অসহিষ্ণুভাবে দেরাজের ভিতর গুঁজিয়া রাখিয়া দিল। এসকল কথায় আর তাহার সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটিতে সে দিবে না।

দিনকয়েক পরে সে বাড়ীতে একসঙ্গে চারটি মনিঅর্ডার করিল। একটি ইন্দুর নামে, একটি সাবিত্রীর নামে, একটি ছোটভাই প্রভাসের নামে এবং চতুর্থটি গ্রামের পণ্ডিত-মহাশয়ের নামে, যিনি মায়াকে পড়াইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইন্দুর কাছে ছোট একখানা চিঠি দিল। নিজের কুশল-সংবাদ দিল, সকলের কুশল প্রশ্ন করিল, মায়ার পড়া ঠিকমত হইতেছে কি না তাহার খবর লইল; কিন্তু সাবিত্রীর নাম উল্লেখও করিল না। তাহার বিষয়ে ইন্দু যাহা কিছু লিখিয়াছে, তাহার কোনোই উত্তর দিল না। কথায় কথা বাড়ে, সুতরাং সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, এ বিষয় যে যতই বক্তৃতা করুক, কাহারও কথার উত্তর সে দিবে না। এক সাবিত্রী যদি তাহার কাছে আসিতে রাজী হয়, তাহা হইলেই একথা আবার উঠিবে, না হইলে এই শেষ।

নিরঞ্জনের কপাল একদিক্ দিয়া মন্দ হইলেও, আর একদিকে ভালই ছিল। বর্মার কাজটি তাহার জুটিয়া গেল। এখানকার সব ব্যবস্থা সে তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল, কারণ পরের মাসের প্রথমেই তাহাকে কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে।

একেবারে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার মনটা এখন যেন একটু পিছাইতে আরম্ভ করিল। স্বদেশ, স্বজন, সন্তান সকলই ত্যাগ করিতে হইবে। অল্প-অল্প অনুতাপ হইতে লাগিল, বাংলা দেশ ছাড়িলেই কি যথেষ্ট হইত না? সাবিত্রীর নিকট হইতে দূরে থাকা তাহাতেও সমানই হইত। কিন্তু আর এখন ফেরা চলে না। তাহা ভিন্ন অর্থ উপার্জ্জনের পথ ব্রহ্মদেশে যে প্রকার সুগম সে শুনিয়াছে, ভারতবর্ষে থাকিলে ততটা সুবিধা পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই।

নিরঞ্জন বাড়ী ছাড়িয়া দিল, আসবাব-পত্রও নিলাম করিয়া দিল। চাকরটাকেও বিদায় দিল, স্থির করিল আর যে-ক-দিন আছে এক বন্ধুর বাড়ীতেই খাইবে। সামান্য টাকা, যাহা সে সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাও পোষ্ট

[illegible]
লিখিল, তাহাকে সব কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিল। সে দূরদেশে যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে চিন্তিত হইবার কিছুই নাই। ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালীর কিছুমাত্র অভাব নাই, তাহাদের গ্রামেরও এক ভদ্রলোক রেঙ্গুনে থাকেন। নিরঞ্জন প্রতি মেলেই চিঠি লিখিবে, যদি কখনও দৈবগতিকে নাই লিখিতে পারে, তাহা হইলে উক্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে খোঁজ করিলেই তাহার খবর পাওয়া যাইবে। কলিকাতার কত লোক যে ব্রহ্মদেশে আছে তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। সুতরাং মনোরঞ্জনও তাহার খবর সর্ব্বদাই পাইবে। নিরঞ্জন টাকা ঠিক নিয়মমত পাঠাইবে, সেজন্য কোনো চিন্তা নাই। ইন্দু যেন নিয়মমত চিঠি লেখে, প্রতিবার মায়ার খবর দেয় এবং পণ্ডিত-মহাশয় তাহাকে কেমন পড়ান সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

তাহার এখানকার কাজে ছুটি হইতেই সে কলিকাতায় চলিয়া আসিল। মনোরঞ্জনের বাড়ী উঠিতে তাহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কারণ মনোরঞ্জন শ্বশুরবাড়ীতেই বাস করে। তবু নিজের ভাই থাকিতে অন্য কোথাও উঠিলে, দেখিতে অত্যন্ত খারাপ হয় বলিয়া সে অগত্যা মনোরঞ্জনের ওখানে গিয়া উপস্থিত হইল।

দাদা বৌদিদি সকলেই খুব সমাদর করিয়া অভ্যর্থনা করিল। অল্প বয়সেই লেখাপড়া অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি সব দিকেই বেশ উন্নতি করিয়াছে বলিয়া, এ বাড়ীতে নিরঞ্জনের খুব খাতির ছিল। মনোরঞ্জনের স্ত্রী প্রায়ই স্বামীকে খোঁটা দিত। কাজেই এ হেন কৃতী দেবরের কোনো অনাদর হইল না।

আহারাদির পর দুই ভাইয়ে আসিয়া মনোরঞ্জনের শয়নকক্ষে বসিল। পানের ডিবা হাতে, একটু পরেই মনোরঞ্জনের স্ত্রীও আসিয়া জুটিল। স্বামী এবং দেবরকে পান মশলা দিয়া খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরপো, একেবারে দেশত্যাগী হয়ে চল্‌লে যে ?"

ভিতরের কথা কাহাকেও জানাইবার ইচ্ছা নিরঞ্জনের ছিল না, সে বলিল, "দেশে থাকলে ত আলোচাল আর কাঁচকলার বেশী কিছু জুটবে না ?"

বৌদিদি বলিলেন, "আহা, ও তোমার এক গা-জুরি কথা। এরই মধ্যে তিরিশ পাচ্ছিলে, দেখতে দেখতে কত বেড়ে যেত। আসল কথা, আমাদের কাছে থাকতে চাও না।"

নিরঞ্জন হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় বলিল, "কেন, তোমরা কি আমাকে কামড়াচ্ছ ?"

বৌদিদি বলিলেন, "তা কি জানি বাপু ? পুরুষ মানুষের জাত, শেকল কাটার জাত। বেশি দিন শেকল তাদের ভাল লাগে না, সোনার হলেও না।"

মনোরঞ্জন বিজ্ঞভাবে বলিল, "আহা, যত বাজে কথা বল কেন ? বর্মায় প্রসপেক্ট কি রকম! দেখতে দেখতে লাখপতি হয়ে যেতে পারে, এখানে আর কতই মাইনে বাড়ত ?"

মনোরঞ্জনের স্ত্রী খানিকটা ঠাট্টা এবং খানিকটা গম্ভীর ভাবেই বলিল, "ওমা, তবে তুমিও একটু গিয়ে দেখ না ? এখানে তো বিশেষ কিছু হচ্ছে না।"

দাদা পাছে স্ত্রীর কথায় আঘাত পায়, সেইজন্য নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি বলিল, "বেশ, বেশ, বৌদি। একেই ত বলে পতিব্রতা। টাকার লোভে স্বামীকে সগার পার ক'রে দিতে ব্যস্ত।" মনটা কিন্তু তাহার খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল, সব স্ত্রীই এই রকম নাকি ? স্বামীকে আসলে তাহাদের কোনো প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন কেবল স্বামীর টাকার ?

মনোরঞ্জন অত শত বুঝিল না। সে বলিল, "কেন, মন্দই বা এমন কি হচ্ছে ? এখানে কম্পিটিশন কি রকম !"

বৌদিদি কথাটা ঘুরাইয়া বলিল, "ঠাকুরপো, জাহাজের টিকিট কিনে নিয়েছ না কি ?"

নিরঞ্জন বলিল, "না, কাল যাব। এই প্রথম সমুদ্র-যাত্রা, একটু ভয়ভয় করছে।"

মনোরঞ্জন বলিল, "ভয় আর কি ? এ সময়ে সমুদ্র ত বেশ ভালই থাকে ব'লে শুনেছি। আর তুমি ত সেকেণ্ড ক্লাশে যাবে, তোমার আর কি ভাবনা। With diet টিকিট করবে, না without ?"

মনের কি একটা বাধা জোর করিয়া দূর করিয়া নিরঞ্জন বলিল, "With diet করব ; আবার কে অত খাওয়ার হাঙ্গাম করে ?"

মনোরঞ্জনের স্ত্রী হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, "এত হাসির খোরাক কিসের মধ্যে পেলে বৌদি ?"

বৌদিদি বলিল, "একে ত কালাপানি পার হচ্ছে, তার উপর জাহাজের

শূওর গরু সব পেটে পুরতে পুরতে যাবে। সেজবৌ আর তোমায় কাছ দিয়ে হাঁটতেও দেবে না। বাড়ী ফিরবার আগে প্রয়াগে গিয়ে, গঙ্গাস্নান ক'রে, মাথা মুড়িয়ে তবে বৌ-এর কাছে যেও।"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল, "তাই করা যাবে না-হয়। অত দূরেই যাচ্ছি যখন, তখন প্রয়াগে যাওয়াটা আর বেশী কথা কি ?"

বৌদিদি বলিল, "কিন্তু বৌকে নিয়ে যেতে পারছ না। সে শক্ত মেয়ে।"

নিরঞ্জন হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, খুবই শক্ত। তা সে না-হয় দেশেই থাকবে। একলা থাকা তারও অভ্যাস আছে, আমারও আছে। এক মায়াটার জন্য ভাবনা। পড়বার ব্যবস্থা অবিশ্যি ক'রে এসেছি, তবে কার্য্যতঃ কতটা হয়ে উঠবে বল্‌তে পারি না।"

মনোরঞ্জন বলিল, "ছেলেপিলের এডুকেশন নিজেরা না দেখলে কিছুই হয় না। এরই জন্যে না মায়ের হাজার গাল খেয়েও আমি সহর থেকে নড়িনি ?"

নিরঞ্জন বলিল, "দেখাই যাক। মেয়ে ত এখন বাচ্চা, মায়ের কাছ থেকে নিয়ে আসা চলে না। একটু বড় হলে আলাদা ব্যবস্থা করতেই হবে। একটা ত মাত্র মেয়ে, তাকেও মূর্খ ক'রে রাখলে কিছুতেই চলবে না।"

মনোরঞ্জনের স্ত্রী বলিল, "তুমি ত থাকবে বিদেশে, মেজ-বৌ হয়ত আট বছরে গৌরীদান ক'রে ব'সে থাকবে।"

নিরঞ্জন বলিল, "অতটা আর নয়। বাড়ীতে আরো মানুষ ত আছে, আমি খবর নিশ্চয়ই পাব। তা ছাড়া সাবিত্রী অমন কাজ করবে না। তার দোষ যেমন আছে, গুণও তেমনি আছে। মেয়ের উপর আমার অধিকার সে পুরোমাত্রায় স্বীকার ক'রে চলে।"

৬

উঠানের এক কোণে বসিয়া মায়া গভীর মনোযোগ সহকারে একটা মাটির ঢিপি তৈয়ারী করিতেছিল। পাশে কয়েকটা আধশুক্‌নো গাছের ডাল, দুই-চারি গোছা পাতা এবং গোটা-দুই ফুল পড়িয়া। পাহাড় প্রস্তুত হইলেই তাহাতে গাছপালা বসাইতে হইবে, গাছে ফুল থাকাও দরকার। গতকল্য এক খেলুড়ীর সে মাটির পাহাড়, ঘর, গাছ, নদী কত কি দেখিয়া আসিয়াছে, আজ বাড়ীতেই সে-সব রচনা করিবার চেষ্টায় আছে। তবে

তাহারা তিন-চারজন মিলিয়া যেমন ভাল করিয়া গড়িয়াছিল, তাহার ছোট দুখানি হাতে তেমন নিপুণ সৃষ্টি হইতেছে না; কিন্তু মায়ার তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ নাই। পাহাড় হইলেই হইল এবং দুই চারিটা গাছপাতা থাকিলেই হইল। ঘর বানাইতে সে পারিবে না, তাহা বুঝিতেই পারিয়াছিল, তবে নদী কাটিবার জন্য সে ভাঙ্গা একটা খুন্তি পিসীমার কাছ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।

হঠাৎ তাহার কার্য্যে ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। সদর দরজার কাছে কে যেন ডাকিয়া বলিল, "আমার টুকটুকে মা-মণি কোথায় গো?"

খেলা ফেলিয়া মায়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। গ্রামের পোষ্টপিওনের সঙ্গে মায়ার বেজায় ভাব। এ ব্যক্তি বাবার চিঠি আনিয়া দেয়, টাকা আনিয়া দেয়, বাবার নিকট হইতে সুন্দর জামা, জুতা, খেলনা, প্রভৃতি যাহা কিছু পাওয়া যায়, সব ইহার মারফতেই আসে। সুতরাং ইহার সহিত ভাব না রাখিয়া উপায় নাই।

দরজার কাছে আসিবামাত্র বৃদ্ধ বাদল একখানা পোষ্ট-কার্ড অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, "এই যে বাবার চিঠি।"

মায়ার উৎসাহ অনেকটাই যেন কমিয়া গেল। সে ক্ষুণ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মোটে একটা, এইটুকু?"

বাদল তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "এর পরের বার দেখো এখন এই মোটা মোটা কত চিঠি নিয়ে আসি। এখন এই চিঠিটা পিসীমাকে দিয়ে এস ত মা-মণি।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "মাকে দেব না?"

পিয়ন বলিল, "না, এটা পিসীমাকে দিও।"

মায়া কিঞ্চিৎ অবাক্ হইয়া, চিঠি লইয়া ভিতরে চলিল। বাবার চিঠি মাকেই দিতে হয় বলিয়া তাহার ধারণা ছিল।

পিসীমা তখন স্নান পূজা সারিয়া সবে রান্নাঘরে তরকারি কুটিতে বসিয়াছে। মায়া দরজার সামনে আসিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, "পিসীমা, বাবার চিঠি এসেছে। বাদল বুড়ো তোমায় দিতে বল্‌ল, মাকে নয়।"

ইন্দু বঁটিখানা কাৎ করিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিল। পোষ্ট-কার্ডখানা হাতে করিয়া পড়িয়া দেখিল। তাহার পর ভাবিতে লাগিল, পোষ্টকার্ডটা সাবিত্রীকে পাঠাইয়া দিবে, না মুখেই নিরঞ্জনের পৌছান খবরটা তাহাকে

দিবে। যাহাই করুক, সাবিত্রীকে খানিকটা আঘাত না দিয়া উপায় নাই। নিরঞ্জন যে তাহাকে কিছু না লিখিয়া বোনের কাছে লিখিয়াছে, ইহাতেই সাবিত্রী যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইবে। মনে মনে বলিল, "আচ্ছা জালা বাপু! নিজেরা করবি ঝগড়া, মাঝ থেকে আমায় কেন বিপদে ফেলা!"

সাবিত্রী ঘাট হইতে ঠিক এই সময় ফিরিয়া আসিয়া ইন্দুর সংশয়ের মীমাংসা করিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কোথার চিঠি গা, ঠাকুরঝি?" তাহার কণ্ঠস্বরে তাহার অজ্ঞাতসারেই অনেকখানি ব্যগ্রতা ফুটিয়া উঠিল।

ইন্দু বলিল, "কলকাতারই। দাদা ভালয় ভালয় পৌঁছেছে, ভাল আছে।"

"ভাল থাকলেই ভাল" বলিয়া সাবিত্রী হন্ হন্ করিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। রাগে, দুঃখে, অভিমানে, তখন তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। বৌয়ের রকম দেখিয়া ইন্দুও আর তখন কোনো কথা বলিল না, আস্তে আস্তে ফিরিয়া গিয়া আবার তরকারি কুটিতে আরম্ভ করিল।

মা-পিসীমার রকম দেখিয়া মায়া এতক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বাবার চিঠি আসাতে অন্যান্য বারে মা কত খুসী হয়, মায়ার কথা বাবা কি কি লিখিয়াছে সব পড়িয়া শোনায়, এবার রাগ করিয়া চলিয়া গেল কেন? ছোট্ট চিঠি বলিয়া? সে ধীরে ধীরে ইন্দুর অনতিদূরে গিয়া বসিয়া ডাকিল, "পিসীমা!

ইন্দু বলিল, "কি গো?"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি লিখেছে, পিসীমা?"

পিসীমা বলিল, "বাবা ভাল আছে, তুমি কেমন আছ, কেমন পড়ছ, সব জিজ্ঞেস করেছে।"

মায়া জিজ্ঞসা করিল, "বাবা মাকে বকেছে পিসীমা?"

এ প্রশ্নের কারণটা বুঝিতে পিসীমার দেরী হইল না। সে সংক্ষেপে বলিল, "না, বক্‌বে কেন?"

মায়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা আবার কবে আসবে পিসীমা?"

পিসীমা বলিল, "শীগগিরই আস্‌বে মা। তুমি এখন যাও, খেলা কর গিয়ে। আমার ঢের কাজ আছে এখন।"

মায়া অগত্যা আবার অসমাপ্ত পাহাড়ের পাশে গিয়া বসিল। কিন্তু উৎসাহ তাহার যথেষ্টই কমিয়া গিয়াছিল। খানিকক্ষণ শুধু শুধু ধূলা-বালি

ঘাটিয়া সে উঠিয়া পড়িল। সন্ধান করিয়া মাকে বাহির করিয়া তাহার নিকটে মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সাবিত্রী ঘরের জিনিষপত্র গুছাইতেছিল, মেয়েকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি-গো, অত হাঁড়িমুখ হয়ে গেল কেন?"

মায়া হঠাৎ ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমার ক্ষিদে পেয়েছে।"

সাবিত্রী আল্না গোছানো রাখিয়া মেয়ের কাছে আসিয়া বলিল, "এই সকালে একপেট খেলি, এরই মধ্যে ক্ষিদে পেয়ে গেল? চল্, ভাঁড়ার-ঘরে মুড়কীর মোয়া আছে, দেব এখন।"

খাওয়ার প্রয়োজন মায়ার বিশেষ তখন ছিল না, মায়ের কোলে চড়িতে পাইয়াই তাহার যাহা প্রয়োজন ছিল তাহা পাওয়া হইয়া গেল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম সারিয়া ইন্দু ধীরে ধীরে সাবিত্রীর ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মায়া তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সাবিত্রী তাহার পাশে বসিয়া আকাশ-পাতাল কি ভাবিতেছিল, সে-ই জানে। ননদকে দেখিয়া বলিল, "কি ঠাকুরঝি?"

ইন্দু তক্তপোশের একধারে বসিয়া বলিল, "তোমাদের মান-অভিমান এমনিই চল্‌তে থাকবে নাকি?"

সাবিত্রী কলহের সুরে বলিল, "তোমার ভাইয়ের মরজি, আমি কি জানি?"

ইন্দু বলিল, "ঝগড়া বাধাতে ত জান, শেষ করতেও জানা উচিত। স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া সব ঘরেই হয়, তাই ব'লে এতখানি বাড়তে কেউ দেয় না। বিশেষ ক'রে দাদা যখন বিদেশে থাকে।"

সাবিত্রী বলিল, "তোমার ভাই যখন, তখন তার দোষ ত দেখবেই না। আমি পরের মেয়ে, ভাল করলেও মন্দ হয়। এই যদি ঘরবাড়ী ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে নাচতে যেতাম মেমসাহেব সেজে, তাহলে তোমরা আমার নামে ঝাঁটা মারতে। কপাল মন্দ তার আর তোমাদের কি বলব? কিন্তু যা হবার হবে, ধর্ম্ম ছাড়তে পারব না।"

ইন্দু বলিল, "আচ্ছা বাপু, মানলাম নাহয়, দাদারই দোষ। কিন্তু তাই ব'লে স্বামী ছেড়ে থাকবে নাকি? দাদার মত মতিগতি আজকালের অধিকাংশ ছেলেরই, তাদের বৌরা কি সব ছেড়ে দিচ্ছে? ওরই মধ্যে মিটমাট ক'রে থাকে। তুমিও তাই কর না কেন? বাঙ্গালীর মেয়ে, অত তেজ দেখালে চলবে কেন? স্বামী বই গতিও ত নেই?"

সাবিত্রী একটু নরম হইল, বলিল, "তা কি করতে হবে তুমিই বল। স্বামী ছেড়ে আমার ক্ষতি বই লাভ নেই, তা কি আর আমি বুঝি না? কিন্তু দেখছ ত তার ব্যবহারটা? গিয়ে আমায় একটা খবর পর্য্যন্ত দিল না।"

ইন্দু বলিল, "তা তুমিই লেখ না বাপু আগে! স্বামীর কাছে নীচু হতে কোনো অপমান নেই। তখন রাগের মাথায় চ'লে গেছে, এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, বোঝালেই বুঝবে।"

সাবিত্রী তৎক্ষণাৎ বাঁকিয়া বসিল, "সে আমার দ্বারা হবে না। মেয়েমানুষ ব'লে কি আর একটা মান-অপমান নেই? সে যদি না লেখে, আমিই বা কেন লিখতে যাব? সব দোষ আমার নাকি?

ইন্দু বলিল, "তবে মর্‌গে যা! অতি বাড় আবার ভাল নয়।" সে বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। নিরঞ্জনকে সে সব ভাই-বোন অপেক্ষা ভালবাসিত। তাহার সাংসারিক সুখ চিরদিনের মত বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনায় ইন্দু শঙ্কিত হইয়া উঠিল। নিরঞ্জনের নিকট নিজেই সাবিত্রীর হইয়া যথাসাধ্য ওকালতি করিয়া চিঠি লিখিল।

কিন্তু কোনো লাভ হইল না। সাবিত্রী-সম্বন্ধে কোনো কথার নিরঞ্জন উত্তরই দিল না। সাবিত্রী শুনিলে পাছে আরো চটিয়া যায়, এই ভয়ে ইন্দু চিঠি লেখার কথা একেবারে চাপিয়া গেল।

দিনকয়েক পরে বাড়ীতে একসঙ্গে তিনটা মনিঅর্ডার আসিয়া সকলকে বেশ খানিকটা বিস্মিত করিয়া তুলিল। এ রকম করার আসল অর্থ বুঝিল কেবল সাবিত্রী। নিরঞ্জনের প্রতি একটু কৃতজ্ঞতা তাহার মনে দেখা দিল। যাক্, তাহাকে শাস্তি দিবার কোনো ইচ্ছা তাহা হইলে নিরঞ্জনের নাই। না হইলে, স্বচ্ছন্দেই সে স্ত্রীকে ভগিনীর বা অন্য কাহারও অধীন করিয়া রাখিতে পারিত। যত তেজই দেখাক, সাবিত্রী কার্যতঃ স্বামীর অধীন ত বটেই?

আবার কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর নিরঞ্জনের ব্রহ্মদেশ-যাত্রার খবর আসিয়া পৌছিল।

ইন্দু চিঠিখানা সাবিত্রীর কাছে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "এই নাও গো তেজস্বিনী, স্বামী ত সাগর পার হয়ে চলল। এখন তোমার তেজ নিয়ে ধুয়ে খাও।"

সাবিত্রী চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া পড়িয়া দেখিল। তাহার মুখটা বিবর্ণ

হইয়া গেল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে ঠাকুর-ঘরে গিয়া খিল দিল। সমস্ত দিন কেউ তাহাকে সেখানে হইতে নড়াইতে পারিল না। মায়া বেচারী পিসীকে আশ্রয় করিয়াই দিন কাটাইয়া দিল।

৭

বর্ষাকালের দুপুর বেলা। ইহারাই মধ্যে গ্রামের উপর যেন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। পথঘাট এক রকম জনশূন্য, নিতান্ত প্রয়োজন না থাকিলে এক হাঁটু কাদা ভাঙ্গিতে কেউ ঘরের বাহিরে আসিতেছে না।

কিন্তু বর্ষাই হউক, আর বাদলই হউক, ঘরের কাজ না করিয়া মানুষের উপায় নাই। গ্রামের ঘরে ঘরে কলের জল বা গ্যাসের চুলা নাই, বিজলীর বাতিরও অভাব। কাজেই ভিজা গামছা মাথায় দিয়া পুকুর হইতে জল আনা, এ সব পল্লীবাসিনীদের করিতেই হয়। ঝমাঝম্ বৃষ্টি নামিবার আগে বাহিরের কাজ যথাসাধ্য সকলে সারিয়া রাখে, যাহাদের কপাল মন্দ তাহাদের জলে ভিজিয়া, কাদা ঘাঁটিয়া হয়রাণ হইতে হয়।

পথিকহীন পথ দিয়া, একটি তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে পুকুরের দিকে চলিয়াছিল। পরণে একখানা লালপেড়ে মোটা শাড়ী, হাতে দুগাছি সোনার রুলি, কানে একজোড়া ইহুদি মাকড়ী। ইহাতেই তাহার যেন রূপ ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাহার রংটা খুব ফরসা, তবে পাড়াগাঁয়ের জলের কল্যাণে একটু যেন ম্লান। মুখ এক রকম নিখুঁৎ বলিলেই হয়, কেবল নাকের গঠনে কিছু ত্রুটি আছে। উহা ঠিক বাঁশীর মত নয়। কিছু চাপা, তবে সুগঠিত বটে। পিঠে এক ঢাল চুল, কটিদেশ ছাড়াইয়া পড়িয়াছে। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় চুল বোধ হয় হাতখোঁপা করিয়া জড়ানো ছিল, চলিতে চলিতে খুলিয়া গিয়াছে। এখন আর জড়াইবার উপায় নাই, কক্ষের পিতলের কলসীটি সামলাইতেই সে ব্যস্ত, চুল জড়াইবে কি করিয়া? তাহার উপর কাদার ভিতর দিয়া চলিতেও সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

যাহা হউক, কোনোমতে সে পুকুরের ঘাটে আসিয়া পৌছিল। বৃষ্টির জলে পুকুর একেবারে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, দুই-একটি সিঁড়ি মাত্র জলের উপর জাগিয়া আছে। ঘাটও জনশূন্য বলিলেই হয়। কেবল একজন বর্ষীয়সী স্নান করিতেছেন। বালিকা আসিয়া সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

বর্ষীয়সী তাকাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "ওমা, মায়া নাকি রে? এমন সময় একলা ঘাটে এসেছিস? ভয়ানক জল আসছে যে রে।"

মায়া মুখ ম্লান করিয়া বলিল, "কি করব কায়েত দিদি। মায়ের আজ জ্বর বেশী, কিছুতেই উঠতে পারল না। পিসীমার একাদশী, সে শুয়ে প'ড়ে আছে; ঘরে একটুও খাবার জল নেই, তাই এলাম।"

বৃদ্ধা বলিল, "যত সব অনাছিষ্টি! একদিন চাকরে জল নিয়ে গেলে কি হত? এমন সময় মেয়েটাকে একলা পাঠিয়েছে ঘাটে! বিপদ্-আপদের ভয় নেই!"

মায়া বলিল, "পিসীমা তাই বলেছিল, তা মা বল্‌লে, গদা জল আন্‌লে সে খাবে না। তোমার হয়েছে কায়েত দিদি?"

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি জল ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "নে বাছা, নে। আমি দাঁড়াচ্ছি একটু। খানিকটা তোকে এগিয়ে দিয়ে যাব। তোর মায়ের এমন আক্কেল না হলে, এমন কপাল হবে কেন? এই ত সেদিন আমার লোচন লিখেছে, তোর বাপ এখন টাকার ছালার ওপর ব'সে আছে। স্বামীর কাছে থাক্‌লে এতদিন রাণীর হালে থাকৃত; তা নয়, দশা দেখ না। হ্যাঁরে, তোদের কাছে টাকাকড়ি আসে?"

বাপ-মায়ের আলোচনা উঠিলে মহামায়া সর্ব্বদাই চুপ হইয়া যাইত। আর সকলের মা-বাবা হইতে তাহার বাবা-মা যে বেশ কিছু অন্য রকম, তাহা সে অল্প বয়সেই বুঝিতে শিখিয়াছিল। বাবার কথা কেহ পাড়িলেই মা এবং পিসীমা চুপ করিয়া যায়, ইহাই সে শৈশব হইতে দেখিয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহারও এই প্রকার অভ্যাস হইয়াছিল। বৃদ্ধার প্রশ্নের উত্তরে, "হ্যাঁ, প্রতি মাসেই আসে", বলিয়া সে তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া পড়িল। বর্ষীয়সী উপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভিজা কাপড়ে শীতে কাঁপিতে লাগিলেন।

মায়া আবার ডুব দিতেছে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ওমা, ক'বার চান করবি লো, এই না সকালে একবার ডুব দিয়ে গেলি?"

মায়া বলিল, "মায়ের খাবার জল নিচ্ছি, তাই।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "মাগো মা, বিধবার বাড়া আচার হয়েছে তোর। তোর মা সত্যিই ক্ষেপেছে দেখছি; নে বাছা শীগগির ক'রে সারু; শীতে আর দাঁড়াতে পারি না।"

মায়া তাড়াতাড়ি কলসী মাজিয়া জল লইয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার পর

সিক্ত বস্ত্রেই বৃদ্ধার সহিত চলিতে আরম্ভ করিল। ঝোড়ো হাওয়া হু হু করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, পথের পাশের গাছপালা থাকিয়া থাকিয়া যেন এই নিষ্ঠুর আঘাতে তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। বৃদ্ধা বলিলেন, "আমি তবে যাই, তুই পা চালিয়ে চ'লে যা, ঝড়বৃষ্টি আসছে।"

মহামায়া যত জোরে চলিতেছিল তাহার চেয়ে জোরে চলিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। একে পূর্ণ কলসের ভারেই সে নুইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর সিক্ত বস্ত্র পায়ে পায়ে জড়াইয়া যাইতেছে, পথ কাদায় ভরা। তবু যথাসাধ্য জোরে সে চলিতে লাগিল, বৃষ্টি আসিয়া পড়িবার ভয়ে। পথে আর লোক নাই, কেবল বাতাসের শব্দ আর থাকিয়া থাকিয়া মেঘের গর্জ্জন।

হঠাৎ পথে আর-একটি পথিকের আবির্ভাব হইল। একটি কুড়ি-একুশ বছরের যুবক একটা বাড়ীর সদর দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার পা খালি, কাপড় মালকোঁচা মারিয়া পরা, হাতে একটা ছাতা। বাহির হইয়াই সে মায়াকে দেখিতে পাইল, দ্রুতপদে তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, "এ কি মায়া? এমন সময় বেরিয়েছ একলা? বাপ্, এতবড় কলসী, এটা তোমার চেয়ে ভারি বোধ হয়। কে তোমায় পাঠিয়েছে? দাও, কলসী দাও, আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

যুবক আর-একটু হইলেই কলসী ধরিয়া ফেলিয়াছিল আর কি! মায়া তাড়াতাড়ি পিছন হঠিয়া গিয়া বলিল, "না, প্রভাস-দা, ছোঁবেন না, আমি মায়ের জন্যে জল নিয়ে যাচ্ছি।"

যুবক হাসিয়া বলিল, "তা হলেই বা। আমি ত মুচীও নই, মুদ্দফরাশও নই যে, জল তোমার মা খেতে পারবেন না।"

মায়া অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না, তা কেন। তবে ডুব না দিয়ে জল আন্‌লে, সে জল তিনি খেতে চান না।"

প্রভাস বলিল, "আকাশ থেকেই তো এখনই স্নান করাবার ব্যবস্থা হবে, কাজেই আমাকে দিলে ক্ষতি নেই। একেই ত চল্‌তে পারছ না, এর ওপর বৃষ্টি এলে আছাড় খেয়ে মরবে।"

মায়া ভীতকণ্ঠে বলিল, "না প্রভাস-দা, মা জানতে পারলে ভয়ানক বক্‌বে, এক ফোঁটা জল খাবে না। আমি নিয়ে যাই, আর বেশী দূর নয় ত?"

যুবক বলিল, "বৃষ্টিও আর বেশী দূরে নয়। আচ্ছা চল, তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

বলিতে বলিতেই মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। যুবক তাড়াতাড়ি ছাতা খুলিয়া মাথার উপর ধরিয়া বলিল, "যতটা পার তাড়াতাড়ি চল। তাই ব'লে আছাড় খেয়ো না যেন।"

মায়া বলিল, "কিন্তু আপনি যে ভিজে যাচ্ছেন ?"

প্রভাস বলিল, "আমি ভিজলে কিছু এসে যাবে না। আমি একটু ভিজবার জন্যেই বেরিয়েছিলাম।"

মায়াদের বাড়ী আর বেশী দূর ছিল না। তাহারা শীঘ্রই আসিয়া পৌছিল। প্রভাস বলিল, "গিয়ে শীগ্‌গির কাপড় ছেড়ে ফেল। চুলগুলোও একেবারে ভিজে গেছে। শুকোতে একদিন লাগবে বোধ হয়। তোমরা মেমদের মত চুল 'বব' কি 'শিঙ্গ্‌ল্‌' করে ফেল না কেন ? তাহলে একটা আপদ্‌ অন্ততঃ ক'মে যায়।"

মায়া বলিল, "আমরা ত মেম নই, হিন্দুর মেয়ে।"

প্রভাস বলিল, "আচ্ছা, তা যা হও, এখন ঘরে ঢুকে পড়, আর ভিজো না।" বলিয়া সে হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়া গেল।

মায়া প্রথম রান্নাঘরে ঢুকিয়া জলের কলসী নামাইয়া রাখিল। তাহার পর পায়ের কাছে শাড়ীর অংশটার জল খানিক নিংড়াইয়া ফেলিয়া এবং পায়ের কাদা ধুইয়া শোবার ঘরে চলিল।

বাড়ীখানির চেহারা পূর্ব্বের মতই আছে প্রায়, তবে বাড়ী এখন নীরব, নির্জন। নিরঞ্জনের ভাইরা সকলেই এখন সহরে বাসা বাঁধিয়াছে, ছোটটি আইন পড়ে, অন্যটি কাজ করে। গ্রামের বাড়ীতে কেবল তিনটি রমণী—ইন্দু, সাবিত্রী আর বালিকা মায়া। ঘরের কাজ নিজেরাই সারিয়া লয়। বাহিরের কাজের জন্য ভৃত্য গদাধর আছে। সে ভাল জাতের হইলেও ঘরের কোনো কাজে প্রয়োজন হইলেও সাহায্য করিতে পারে না। সাবিত্রী আচার-নিষ্ঠায় এখন বিধবা ইন্দুকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। গ্রামের মধ্যে তাহার নাম বিখ্যাত। কন্যা মহামায়াকেও সে সম্পূর্ণ নিজের মতে মানুষ করিতেছে, পান হইতে চুণ খসিলে বালিকার লাঞ্ছনার অন্ত থাকে না। ইন্দু মাঝে মাঝে আপত্তি করে, তাহাতে ননদ-ভাজে এক পালা তর্ক-বিতর্ক ভিন্ন আর কোনো লাভ হয় না। নিরঞ্জন মাসে মাসে বেশ দরাজ হাতে টাকা পাঠায়, এবং ইন্দুকে এক-একখানা পোষ্টকার্ড লেখে। বাড়ীর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ঐ পর্য্যন্ত। প্রথম প্রথম মায়ার কাছেও লিখিত,

মায়া তখন চিঠির উত্তর দিতে না পারায়, এখন আর তাহার কাছে চিঠি আসে না।

ঘরের ভিতর বিছানায় সাবিত্রী শুইয়া ছিল। তাহার আর পূর্ব্বের মত চেহারা নাই। শরীর শীর্ণ, গায়ের রং মলিন হইয়া গিয়াছে। মুখের ভাব কোনো কালেই বিশেষ কোমল ছিল না। এখন অত্যন্তই রুক্ষ দেখায়। হাতে দু-গাছি শাঁখা ভিন্ন কোনো অলঙ্কার নাই, পরণে মহামায়ার মতই একখানা মোটা লাল পেড়ে শাড়ী।

মায়া ঘরে ঢুকিতেই সাবিত্রী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ রে, বুড়ো ধেড়ে ত হয়েছিস্, তোর আক্কেল হবে কবে ?"

বালিকা ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা ?"

সাবিত্রী মেয়েকে ভ্যাঙাইয়া বলিল, "কেন মা ? মেমসাহেব হয়েছেন, অন্য একজন ছাতা ধরবে, তবে উনি হেঁটে আস্‌বেন ! তোর লজ্জা করে না মুখপুড়ী ! প্রভাসের সঙ্গে কি ব'লে এলি ? এই নিয়ে কেউ কোনো কথা বলে ত তোর পিঠের চামড়া আস্ত রাখব না।"

মায়া কিছু উত্তর দিবার আগেই ইন্দু আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল, "নাও, নাও, চেঁচিয়ে আরো জ্বর দু ডিগ্রী বাড়াতে হবে না। একেই ত আজ ১০৩ ডিগ্রী ছাড়িয়ে গেছে। মেয়েকে শাসন পরে করলেও চলবে, এখন মুখে দাও কিছু। ওষুধ খাবার সময় হল, মায়া। আগে কাপড়টা ছাড়, ভিজে চুপ চুপ করছে। চুলগুলো মোছ ভাল ক'রে।"

মায়া পিসীমার আজ্ঞা পালন করিল। তাহার পর খল মুড়ী, কবিরাজের বড়ি, অনুপান প্রভৃতি লইয়া সাবিত্রীর ঔষধ তৈয়ারী করিতে বসিল। মাস চার-পাঁচ হইতে সাবিত্রী অসুখে ভুগিতেছে। তাহার জ্বর ছাড়ে না, কোনো প্রকারের খাদ্যই প্রায় হজম হয় না। কলিকাতায় গিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য মনোরঞ্জন, তাহার স্ত্রী, সকলেই লিখিতেছে, কিন্তু সাবিত্রী একেবারেই নারাজ। কবিরাজের চিকিৎসাই চলিতেছে। মাঝে একটু উন্নতি দেখা গিয়াছিল, কিন্তু দিন-কতক খুব ঠাণ্ডা লাগানোতে অসুখ আবার বাড়িয়া উঠিয়াছে, ঔষধ প্রস্তুত করিয়া মায়ের কাছে রাখিয়া মায়া জল আনিতে গেল।

ইন্দু বলিল, "অনেকদিন ত হ'য়ে গেল, এখন একবার চিকিৎসা বদ্‌লে দেখলে ভাল। বড়দা, বৌদি সবাই এতবার ক'রে লিখছে, না-হয় একবার

কলকাতাই চল? তাদের বাড়ী না থাকতে চাও, আলাদা বাসা ভাড়া ক'রে থাকলেই হবে। টাকার ত আর অভাব নেই ?"

সাবিত্রী বলিল, "টাকা আছে ব'লে কি জলে ফে'লে দিতে হবে নাকি? টাকার কাজও ঢের আছে। মেয়ে বড় হচ্ছে, বিয়ে দিতে হবে না?"

ইন্দু বলিল, "নাড়তে চাড়তে ত ঐ এক মেয়ে। তাকে এখুনি বিদায় না করলে ঘুম হচ্ছে না বুঝি? আর তার বিয়ের জন্যে তোমার অত ভাবনা কেন? না খেয়ে না প'রে, একশ'র মধ্যে আশীটাকা যে জমাচ্ছ, তা দিয়েই সব কাজ উদ্ধার হবে? মেজদার ত মায়া বই সন্তান নেই, টাকা হয়েছে এক কাঁড়ি, মেয়ের বিয়ের ভাবনা সেই ভাববে। তুমি এখন নিজের প্রাণটা একটু দেখ।"

সাবিত্রী বলিল, "এতদিন যদি মেয়ের সব ভাবনা ভাবতে পেরে থাকি, তার বিয়ের ভাবনাটাও ভাবতে পারব। তোমার ভাইয়ের টাকায় আমার বাবুগিরি করবার মতি যেন কোনোদিন না আসে। শাশুড়ী বিয়ে দিয়ে এনেছিলেন, তাঁকে কথা দিয়েছিলাম, তাই এ ভিটে আগ্‌লে প'ড়ে আছি, না হ'লে কবে নিজের পথ দেখতাম। ওর টাকার থেকে কখনও একপয়সা নিজের জন্যে খরচ করিনি, যা খরচ মায়ার জন্যেই হয়েছে। মরবার আগে ওর বিয়ে আমি দিয়ে যাব। না হলে বাপ যে ওর হাড়ি কি মুচি ধ'রে বিয়ে দেবে না, তার স্থিরতা নেই।"

ইন্দুরও মেজাজ কিছু গরম হইয়া উঠিল, তবে সাবিত্রীর অবস্থা দেখিয়া সে আর কথা বাড়াইল না। এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া সাবিত্রী হাঁপাইতেছিল। উত্তেজনায় তাহার রক্তহীন মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। মায়া এই সময় জল লইয়া ফিরিয়া আসায় তর্কটা থামিয়াই গেল; ইন্দুর শরীর ভাল ছিল না; সে নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া আবার চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

মাকে ঔষধ পথ্য দিয়া মায়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, কাজেই সে অন্য একটা ঘরে আশ্রয় লইল। বাড়ীতে ঘরের অভাব নাই, এখন মানুষেরই অভাব। যদিও সাবিত্রীর কাছেই মায়াকে বেশীর ভাগ সময় থাকিতে হইত, তবু নিজের জন্য সে একটি ঘর দখল করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাতে বিশেষ কিছুই ছিল না। কাপড়ের বাক্স একটি, বইয়ের তাক একটি, শুইবার জন্য তক্তপোষ একটি। বাক্সে

অবশ্য এ ঘরে সে শুইত না, ইন্দুর সঙ্গে শুইত। অসুখ হওয়ার পর হইতে সাবিত্রী আর মেয়েকে নিজের কাছে রাখিত না। বইগুলির মধ্যে কয়েকখানি মহামায়ার পড়ার বই, বাকি কয়েকটা পুরাতন রামায়ণ, মাহাভারত, পুরাণ, প্রভৃতি। সংস্কৃত, বাংলা দুইই আছে। ইংরাজী বইয়ের চিহ্নও নাই। বাংলা নাটক-নভেলও নাই, কবিতার বই দু-একখানা, জীবন-চরিত, ইতিহাস, প্রভৃতি আছে। সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া মায়া কিছু পড়ে না, এই কয়েকখানা বই মাত্র তাহার পড়িবার সুবিধা হইয়াছে।

কাপড়ের বাক্সে সর্ব্বদা পরিবার কাপড়-চোপড়, দু-একটা ভাল কাপড়, জামা, দুইটা গরম জামা। এ সকলের নীচে তাহার ছেলেবেলাকার খেলনা, জামা দু-চারটা সাজানো আছে। সবার নীচে লুকানো আছে নিরঞ্জনের একটি ছবি, এবং তাহার গুটি-কয়েক চিঠি। এগুলিকে মায়ের চোখ হইতে সে সযত্নে লুকাইয়া রাখে। মাতা এবং পিতার মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক নাই, তাহা সে শৈশব হইতেই জানে। ছবিখানি ইন্দুর নিকট হইতে অনেকে সাধ্যসাধনায় সে চাহিয়া লইয়াছে। চিঠিগুলি তাহার নিজেরই সম্পত্তি।

৮

প্রভাস এই গ্রামেরই ছেলে। তাহার পিতা দূরদেশে কাজ করিতেন। পরিবারাদি মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট গিয়া থাকিত, বেশীর ভাগ সময় গ্রামেই থাকিত। প্রভাস গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ করিয়া কলিকাতায় বোর্ডিংএ থাকিয়া পড়াশুনা করিত। সম্প্রতি বি-এ পরীক্ষা দিয়া ছুটিটা সে গ্রামে কাটাইতেছে। পাশ হইলে কলিকাতায় গিয়া ল কলেজে ভর্ত্তি হইবে।

সাবিত্রীর প্রথম হইতেই এ ছেলেটিকে খুব পছন্দ। অপরূপ রূপবান্ না হইলেও দেখিতে শুনিতে মোটের উপর ভালই। তা পুরুষ মানুষের রূপের বিশেষ কোনো প্রয়োজন নাই। পড়াশুনায় ছেলেটি ভাল, স্বাস্থ্য চমৎকার। সব চেয়ে ভাল কথা এই যে, ছেলেটির সাহেবী ধরণ মোটেই নাই। নিষ্ঠাবতী স্ত্রীর হাতে পড়িলে সনাতন ধর্ম্মের গণ্ডী সে মানিয়া চলিবে। গ্রামেরই ছেলে, তাহার পরিবার-পরিজন, কুলশীল সবই জানা। ইহাকেই

সাবিত্রী মনে মনে মহামায়ার পাত্র স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। কথা অবশ্য এখনও পাড়ে নাই। মেয়ের বিবাহ সে আপন মতেই দিবে স্থির করিয়াছিল, নিরঞ্জনকে আগে কিছু জানাইবে না ইহাও এক-রকম স্থির ছিল। কিন্তু জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা শক্ত। শ্বশুর-গোষ্ঠীর ভিতরে থাকিয়া স্বামীর অজ্ঞাতে এবং অমতে কিছু করিয়া তোলা কঠিন। এইজন্য এতদিন সাবিত্রী মনের কথা মনেই রাখিয়াছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিতে ব্যস্ত ছিল, এমন সময় রোগে পড়াতে সব ব্যবস্থা উলট-পালট হইয়া গেল।

প্রভাস ছেলেটি যে রকম, তাহাতে তাহাকে জামাইরূপে পাইলে যে-কোনো হিন্দু কন্যার পিতা কৃতার্থ বোধ করিত। কিন্তু নিরঞ্জনের কথা স্বতন্ত্র। সে ত আজকাল ঘোরতর সাহেব হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া শোনা যায়, টাকা করিয়াছে লাখ লাখ, অত দূরদেশ, তায় আবার ব্রহ্মদেশ, স্বভাব-চরিত্র কি আর ঠিক রাখিতে পারিয়াছে? মেয়েকে লইয়া যাইবার কথা থাকিয়া থাকিয়া তোলে, আবার কি মনে করিয়া চুপ করিয়া যায় তাহা সেই জানে। একবার বিবাহ দিয়া ফেলিতে পারিলে নিশ্চিন্ত, তাহার পর আর কাহারও জারিজুরি চলিবে না। না হইলে মায়ার অদৃষ্টে দুঃখ আছে। বিধর্মী, অনাচারী পিতার হাতে পড়িলে, তাহার ধর্ম্মকর্ম্ম সব চুলায় যাইবে। বারো তেরো বছরের মেয়ে কিছু জোর করিয়া নিজের মতে চলিতে পারিবে না। তাহার পর কোনো এক বিলাত-ফেরত মাতাল ব্যারিষ্টারের সহিত বিবাহ হইয়া তাহার জীবনটা একেবারে মাটি হইবে।

সাবিত্রী স্থির করিয়াছিল, গোপনে প্রভাসের সঙ্গে বিবাহ স্থির করিয়া মেয়ে লইয়া সে বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবে। সেইখানে বিবাহ হইয়া গেলে পর, স্বামীকে এবং শ্বশুরবাড়ীর সকলকে খবর দিবে। স্বামী অবশ্য খুবই রাগ করিবে, কিন্তু তখন তাহার রাগে আসিয়া যাইবে কি? পত্নীকে সে ত্যাগ করিয়াই রাখিয়াছে, না হয় খোরাকীও বন্ধ করিবে। তা করুক, মেয়ের বিবাহ হইয়া গেলে, এক মুঠা ভাতের জন্য তাহার আটকাইবে না। বাপের বাড়ীতে গিয়া পড়িলে, তাহারা কিছু দূর করিয়া দিবে না।

এখন ছেলের বাপ রাজী হইলে হয়। মেয়ে অবশ্য খুবই সুন্দরী, পাড়াগাঁয়ে এ রকম মেয়ে সচরাচর দেখাই যায় না। সাবিত্রীর নিজের

গহনাগাঁটি যাহা আছে, সব সে মেয়েকেই দিবে, এতকাল ধরিয়া টাকা জমাইয়া সে হাজার-পাঁচ টাকা করিয়াছে, তাহাও দিবে। কিন্তু বাপের অমতে বিবাহ, ইহাতে গোলমাল আছে, সেই ভয়ে যদি পিছাইয়া যায়। নিরঞ্জনের টাকার খ্যাতি এখন দেশবিখ্যাত, সে-লোভও থাকিতে পারে। কিন্তু নিরঞ্জন যে কোনোমতেই এ পাত্রের সহিত বিবাহে রাজী হইবে না, তাহা উহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া শক্ত হইবে না। আজকাল বি-এ পাস পাত্রে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, পাঁচ হাজার টাকা, সুন্দরী বড় ঘরের পাত্রী, তিন হাজার টাকার গহনা সকলের অদৃষ্টেই জোটে না। এই সব ভাবিয়া তাহারা রাজী হইলেও হইতে পারে।

কিন্তু সাবিত্রীর রোগ সারিবার কোনোই লক্ষণ দেখাইতেছিল না, বরং দিনের দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল। তিন-চার দিন হইল সে উত্থানশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাবনাও শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। মেয়ের বিবাহ না দিয়া যাইতে পারিলে সর্ব্বনাশ। আর এক বিপদের কথারও সম্ভাবনায় সে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। অসুখে পড়িবার সময় সে ইন্দুকে অনেক করিয়া মাথার দিব্য দিয়া বারণ করিয়াছিল, যেন নিরঞ্জনকে তাহার অসুখের খবর না দেওয়া হয়। কিন্তু অসুখ যে প্রকার বাড়িয়া চলিয়াছে, ইন্দু ইহার পর তাহার কথা নাও রাখিতে পারে। আর সে রাখিলেও, কলিকাতার আত্মীয়গণ দয়া করিয়া খবর দিতে পারেন। নিরঞ্জন একবার যদি দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কন্যার বিবাহ দিবার আর কোনোই উপায় থাকিবে না। সাত-পাঁচ ভাবিয়া তাহার মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়িয়া যাইতেছিল। ধাক্কা সাম্‌লাইতে হইল বেচারী মায়াকে এবং খানিক পরিমাণে ইন্দুকেও।

আজ মায়াকে প্রভাসের সঙ্গে আসিতে দেখিয়া সাবিত্রী কর্ত্তব্যের খাতিরে কন্যাকে গালি দিল বটে, মনে মনে একটু খুসীও হইল। প্রভাসের হয়ত মায়ার প্রতি মনটা পড়িয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে সাবিত্রীর কাজ ঢের সহজ হইয়া যায়। ইচ্ছা করিলেই প্রভাসকে তাহার রোগশয্যার পার্শ্বে ডাকিয়া সে মায়ার সহিত তাহাকে আরো খানিকটা মেলামেশা করিতে দিতে পারিত, কিন্তু তাহার মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। যে সকল অনাচারের বিরুদ্ধে সে চিরকাল লড়িয়াছে, নিজের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য

যাহার জন্য বিসর্জন দিল, একটুখানি সুবিধা পাইবার আশায় তাহারই শরণ লইতে পারিবে না। সে নিজে প্রস্তাব করিয়া দেখিবে, প্রভাসকে যথাসাধ্য অনুরোধ করিবে, তাহার পিতামাতাকে অর্থের লোভ দেখাইবে, তাহার পর যাহা হয় হইবে।

আর দেরি করিতে তাহার ভরসা হইতেছিল না। যে রকম তাহার শরীরের দশা, কখন কি হয় বলা যায় না। ঔষধপথ্যাদি খাইয়া সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার পর ডাকিল, "মায়া, শুনে যা।"

মায়া তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই মা?"

সাবিত্রী বলিল, "দে'খে আয় ত তোর পিসীমা কি করছে।"

মায়া ইন্দুর ঘরের কাছে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আস্তে আস্তে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "পিসীমা ঘুমোচ্ছে।"

সাবিত্রী বলিল, "আচ্ছা, একবার গদাকে ডেকে দে, দিয়ে তুই নিজের ঘরে যা।" মায়া কিঞ্চিৎ অবাক্ হইয়া চলিয়া গেল।

গদা ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। সাবিত্রী বলিল, "দেখ্ গদা, একবার মুখুজ্জেদের ওখানে গিয়ে প্রভাসের মাকে ডেকে আন্ ত। বলবি; মায়ের বড় অসুখ, উঠতে পারে না, আপনি একবার যদি আসেন।"

গদাধর প্রস্থান করিল। সাবিত্রী মনে মনে গুছাইয়া ঠিক করিতে লাগিল, কেমন করিয়া কথা পাড়িবে, কি কি যুক্তি দিবে, কি লোভ দেখাইবে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে গদার সঙ্গে একটি স্থূলাঙ্গিনী প্রৌঢ়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাবিত্রীর ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "রোজই আসব আসব করি, যে বর্ষা, ঘর থেকে বের হওয়াই দায়। আজ কেমন আছ?"

সাবিত্রী বলিল, "আর কেমন! ভাল থাকার দিন পার হয়ে গেছে, এখন কাজ চুকিয়ে যেতে পারলেই বাঁচি।"

প্রভাসের মা বলিলেন, "ষাট, ও কি কথা? তোমার কি যাবার বয়স, না যাবার অবস্থা? ক'দিনেই সেরে উঠবে। ভাল ক'রে চিকিচ্ছে হচ্ছে না কিনা, তাই দেরি হচ্ছে।"

সাবিত্রী বলিল, "সে যাই হোক বোন, এখন অন্য কথা আছে।

মরা-বাঁচা ত ভগবানের হাত, কিন্তু নিজের কাজ সেরে নিতে চাই। আমার ত ঐ এক মেয়ে, তাকে রোজই দেখছ। চেহারা স্বভাব-চরিত্র কিছুই তোমাদের অজানা নেই। আমাদের কুলশীল বংশ সবই জান। তোমার ছেলেটিকেও আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি। ওকে যদি আমায় দাও, তাহলে আমি দায়মুক্ত হই।"

প্রভাসের মা ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "ওমা, তোমার মেয়েকে পাওয়া ত ভাগ্যের কথা বোন। কোনোদিকেই ত খুঁৎ নেই। বাছার যেমন রূপ তেমন গুণ। আমিই কথা পাড়ব পাড়ব করছিলাম, তবে মায়ার বাপ এখানে নেই, তোমাদের টাকাকড়িও ঢের; হয়ত বড়লোকের ছেলে চাইবে ব'লে ভরসা ক'রে কিছু বলিনি। তা তোমরা যদি রাজী হও, ত আমাদের দিকের কিছু আপত্তি নেই। কর্ত্তাকে বললে তিনি এক্ষুনি রাজি হবেন। ছেলে আমাদের বড় বাধ্য, আমরা যা বলব তাতে কখনই অমত করবে না। আর অমত করবার আছেই বা কি? মায়ার মত মেয়ে কি আর পথেঘাটে পাওয়া যায়?"

সাবিত্রী একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি ভালবেসে যা বল দিদি। কিন্তু এর মধ্যে একটু কথা আছে, শুনে যদি রাজী হও, তাহলেই বিয়েটা হয়। মায়ার বাপের কথা ত তোমরা সবাই জান। ন'বছর হল গেছে, একবার ঘরমুখো হয়নি। টাকা পাঠায়, এই পর্য্যন্ত তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। মেয়েকে দেখতেও তার ইচ্ছে হয় না। বর্ম্মায় থাকে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করে। টাকা দিয়ে কি যে সে করে তা সে-ই জানে। এখানে থাকতেই তাতে আমাতে বনত না, তার সাহেবী-আনার জন্যে। এখন ত শুনছি পুরো সাহেব, শূওর গরু খায়। সে কি এখন মেয়ের বিয়ে দিতে চাইবে? বুড়ো ধেড়ে ক'রে রেখে দেবে। বিয়ে দিলেও মাতাল, নাস্তিক বিলেত-ফেরতের সঙ্গে দেবে। তাই তাকে না জানিয়েই আমি মেয়ের বিয়েটা দিয়ে যেতে চাই। নইলে মেয়ের অদৃষ্টে দুঃখ আছে। এখন মেয়ে দে'খে আর আমার উপর দয়া ক'রে যদি মত দাও।"

প্রভাসের মা একেবারেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া সাবিত্রী প্রমাদ গণিল। তাড়াতাড়ি বলিল, "তাই ব'লে মনে ক'রো না যে তোমাদের আমি ফাঁকি দেব। অন্য জায়গায় যা পেতে এখানে

তার কম কিছু পাবে না। আমার তিন হাজার টাকার গহনা আছে, এই দুগাছি শাঁখা ছাড়া কিছু পরি না, পরব না, সব মেয়েকে দেব। হাজার-পাঁচ টাকা জমিয়েছি, তাও দেব। তারপর অদৃষ্টে থাকে ত বাপের সব সম্পত্তিই সে পাবে, তারই পাওনা। এখন কি বল

প্রভাসের মা বলিলেন, "আমি একলা ত বললেই হবে না, বোন। ছেলের বাপকে লিখে দেখি, তিনি কি বলেন। এর ভিতর একটু গোলমাল রয়েছে কিনা! তিনি যা বলেন তোমায় জানাব। তোমার মেয়েকে বৌ করতে আমার কিছু অসাধ নেই।"

সাবিত্রী বলিল, "আচ্ছা, তা লিখে দেখ। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি ক'রো বোন, আমার ডাক আসতে আর দেরি নেই। তোমাদের কল্যাণে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।"

প্রভাসের মা উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "না, না, সে কি কথা! সেরে উঠবে বৈ কি? আমি আজ গিয়েই চিঠি লিখব এখন।"

সাবিত্রী বলিল, "আর একটা কথা দিদি। একথা যেন এখন বাইরে প্রকাশ না হয়। শ্বশুরবাড়ীর এঁরা জানলে সবই মাটি হবে।"

"না, আমি কাউকে বলব না," বলিয়া প্রভাসের মা প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার সময় ইন্দু উঠিয়া সাবিত্রীর জ্বর পরীক্ষা করিতে আসিল। আরো একটু বাড়িয়াছে দেখা গেল। শঙ্কিতচিত্তে ইন্দু থার্ম্মোমিটার তুলিয়া রাখিয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিল। সাবিত্রী ত ভাল হইবার কোনোই লক্ষণ দেখাইতেছে না, সব দায়িত্ব ঘাড়ে করিয়া সে একলা মেয়েমানুষ কতদিন বসিয়া থাকিবে? নিরঞ্জনকে কিছু না জানানো কি উচিত হইতেছে? হাজার হউক তাহার স্ত্রী ত বটে? এত সাংঘাতিক অসুখ শুনিলে সে কি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে? কিন্তু সে যে সাবিত্রীর কাছে কথা দিয়াছে, যে, কোনমতেই নিরঞ্জনকে অসুখের কথা বলিবে না? এখন কি উপায়?

মায়া ঘরে প্রদীপ জ্বালাইয়া দিল। জলছড়া ঝাঁট আগেই সারিয়া রাখিয়াছিল। শাঁখের আওয়াজ একবার মৃদুভাবে শোনা গেল। ইন্দু তখন উঠিয়া পড়িয়া মায়াকে নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিল। মায়াকে বসাইয়া বলিল, "তোর মায়ের জ্বর ত ক্রমেই বেড়ে চলেছে রে।"

মায়া ভীতভাবে বলিল, "তাহলে কি হবে পিসীমা? অন্য ডাক্তার ডাক না?"

ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ তোমার মা-টি তেমনি সোজা মানুষই বটে। ডাক্তার ডাকলেই ওষুধ খাবে। কিন্তু এমন ক'রে ত চল্‌বে না। তোর বাবার একবার আসা উচিত। মানুষের প্রাণের ত কিছু ঠিকানা নেই, কখন কি হয়।"

মায়ার চোখে জল আসিয়া পড়িল। আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "তুমি বাবাকে আসতে লেখ।"

ইন্দু বলিল, "তোকেই লিখতে হবে। আমি বৌকে কথা দিয়েছি লিখব না ব'লে।"

মায়া বলিল, "আমি কোনোদিন তাঁকে চিঠি লিখিনি। কি রকম ক'রে লিখব?"

ইন্দু বলিল, "কেমন ক'রে আবার? শুধু খবরটা দিয়ে দে। এই বেলা লেখ্, তোর মা ঘুমোচ্ছে। জাগলে ত মিনিটে মিনিটে ডাক পড়বে।"

মায়া কাগজ কলম লইয়া পিসীমার ঘরে আসিয়া বসিল। কি লিখিবে সে? শ্রীচরণেষু, বাবা, লিখিয়া সে অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিল। একখানা কাগজ নষ্ট হইল। সাবিত্রী পাছে উঠিয়া তাহাকে ডাকে সে ভয়ও ছিল। আর একখানা কাগজ লইয়া তাড়াতাড়ি লিখিল,

শ্রীচরণেষু—

বাবা, মায়ের ভয়ানক অসুখ। ক্রমেই বাড়ছে। তুমি বাড়ী এস। আমাদের বড় ভয় করছে। তুমি আমার প্রণাম জেনো।

ইতি সেবিকা মায়া।

খামের মধ্যে চিঠি ভরিয়া সে ইন্দুর কাছে দিয়া আসিল। ইন্দু ঠিকানা লিখিয়া ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল। সাবিত্রী তখন ঘুমের মধ্যে মায়ার বিবাহের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

৯

ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন সহরটি আয়তনে নিতান্ত ছোট নয়, যদিও ইহার লোকসংখ্যা সে অনুপাতে নয়। নিজ সহরটি বাদে ইহার চারিদিকে সহরতলী অনেকগুলি। যাঁহারা কোনো কারণে সহরের ঠিক ভিতরে বাস করিতে চাহেন না, অথচ নগরবাসের সুখ-সুবিধা খানিকটা অন্ততঃ ভোগ করিতে চাহেন, তাঁহারাই এ সকল স্থানের স্থায়ী অধিবাসী। সহর হইতে

সহরতলীগুলিতে যাতায়াতের উপায় অনেক। ট্রেণ আছে, ট্রাম আছে, মোটর বস্ আছে। সনাতন ঘোড়ার গাড়ী ত আছেই। তদুপরি ব্রহ্মদেশের অতিপ্রিয় যান রিক্শ সস্তার চূড়ান্ত, দু আনা, চার আনার বেশী খরচ নাই। অথচ নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া যেখানে খুসি যাওয়া চলে। সুতরাং সহর হইতে একটু দূরে থাকিলে কোনোই অসুবিধা নাই।

এখানকার ধনী এবং সাহেবীআনার পক্ষপাতী বাসিন্দারা বেশীর ভাগ কোকাইন নামক স্থানে বাস করেন। কোকাইন লেক নামক একটি ঝিল এই স্থানে থাকাতে, ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর। সহর হইতে এখানে আসিবার বেশ ভাল রাস্তা আছে। সম্প্রতি এইদিকে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতেছে বলিয়া রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু স্থানটির নির্জ্জনতা এখনও দূর হয় নাই। এক-একটি বাড়ীর পর অনেকদূর পর্য্যন্ত বাড়ীঘর কিছুই হয়ত নাই, খোলা মাঠ পড়িয়া। কোথাও বা দূরে বনশ্রেণী দেখা যায়, কোথাও রবার গাছের বাগান পথিকের কৌতূহল উদ্রেক করে। বাড়ীগুলির স্থাপত্য ও আকার অধিবাসীদের জাতি ও রুচিভেদে নানাপ্রকার। চীনা, ভারতীয় ও ব্রহ্মদেশীয় এই তিনজাতীয় স্থাপত্যেরই প্রাদুর্ভাব অধিক। তবে ভারতীয় স্থাপত্যও এখানে ভেজাল মিশিয়া আধা ব্রহ্মদেশীয় হইয়া উঠিয়াছে। খাঁটি ভারতবর্ষীয় বাড়ী একটিও চোখে পড়ে না।

পথে পথিক বিরল। মাঝে মাঝে সশব্দে মোটর বস্ চলিয়াছে। মোটরকার প্রায়ই দেখা যায়। অন্য প্রকার যান বিরল। এই স্থানটি রেঙ্গুন সহর হইতে অনেকখানিই দূরে অবস্থিত হওয়ায় মোটর ভিন্ন অন্য প্রকার গাড়ী ব্যবহার করিয়া সুবিধা হয় না। স্থানটি দেখিতে সুন্দর বলিয়া, পর্য্যটকের আগমন সারাক্ষণই হয়। তাই মোটর বস্‌গুলিতে কখনও যাত্রীর অভাব হয় না।

বর্ষাকালের সন্ধ্যায় এই পথ দিয়া একখানি মোটর গাড়ী দ্রুতবেগে চলিয়াছিল। ভিতরে একটি মাত্র আরোহী, মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। সাহেবী পোষাক পরা, তবে সাহেব যে নয়, তাহা গায়ের রংএই বোঝা যায়। রগের কাছে চুল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চারিদিকে বাগান-ঘেরা বড় একটি দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। গেটের ভিতর দিয়া লাল সুরকি-ঢালা পথ গাড়ীবারাণ্ডার

নীচ পর্য্যন্ত। ভদ্রলোক গাড়ী হইতে নামিবামাত্র তাঁহার খাসভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া টুপী এবং ছড়ি লইয়া গেল। তাহাকে চা দিতে আদেশ করিয়া প্রভু নিজের অফিস কক্ষে ঢুকিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য ভদ্রলোক আমাদের পূর্ব্বপরিচিত নিরঞ্জন। ব্রহ্মদেশে আসিয়া বছর খানেক মাত্র তিনি চাকরী করিয়াছিলেন, তাহার পর কন্ট্রাক্টরী এবং ব্যবসা করিয়া এখন প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইয়া বসিয়াছেন। প্রথম প্রথম সহরে ভাড়াটে বাড়ীতেই বাস করিতেন, সম্প্রতি বছর-দুই হইল নিজে বাড়ী করিয়াছেন। সহরের মধ্যে অফিসের জন্য এখনও একটি ভাড়াটে বাড়ী আছে।

কোকাইনের বাড়ীটি অনেকখানি জায়গার উপর নির্ম্মিত, আয়তনেও বেশ বড়। কিন্তু অধিকাংশ ঘরই শূন্য। গৃহকর্ত্তার কাজ নীচের তলায়ই, রাত্রে শুইতে কেবল তিনি একবার দোতলায় ওঠেন। এতবড় বাড়ী যে তিনি কাহার জন্য করিয়াছেন, তাহা কেহ ভাবিয়াও পায় না! স্ত্রী-কন্যাকে লইয়া আসিবেন ইহাই সকলে প্রত্যাশা করিয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোনো চিহ্ন না দেখিয়া বিশেষ আর কেহই ভরসা করে না।

নিরঞ্জনের নিজের কি উদ্দেশ্য ছিল বলা শক্ত। মায়াকে লইয়া আসিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রথম হইতেই ছিল। কিন্তু সাবিত্রীর নিকট হইতে তাহার একমাত্র সন্তানটিকেও কাড়িয়া আনিলে তাহার প্রতি বড় বেশী নিষ্ঠুরতা করা হইবে ভাবিয়া এ পর্য্যন্ত সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করা হয় নাই। এখনও আশা ত্যাগ করেন নাই, তবে, এ বছর নয় পরের বছর, করিয়া আনিবার দিন ক্রমেই পিছাইয়া যাইতেছে। উপরতলার দু'তিনটি ঘর মায়ার জন্য সাজানো হইয়া আছে, বড় পিয়ানো, অর্গ্যান্ কেনা হইয়া পড়িয়া আছে, তাহা ব্যবহার করিবার লোক নাই। একখানা মোটর আছে, আর-একখানা কিনিবার মতলবও গৃহকর্ত্তার মাথায় ক্রমাগত আসে। তাঁহার গাড়ী ত কাজে সারাক্ষণ ঘুরিতেছে; মায়া আসিলে, তাহার বেড়াইবার জন্য, স্কুলে যাইবার জন্য আর একটা গাড়ীর দরকার হইবে। কাহাকে প্রাইভেট টিউটার রাখিবেন, কাহাকে বাজনা শিখাইবার জন্য রাখিবেন, সবই তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এখন মেয়ে আসিলেই হয়। কিন্তু তাহার আগমনের সম্ভাবনা ক্রমেই যেন সুদূর-পরাহত হইয়া আসিতেছে। তাহার অভাবে এই সুসজ্জিত গৃহ যেন প্রতিমাবিহীন মণ্ডপের মতন শ্রীহীন হইয়া আছে। নিরঞ্জন নিজের অফিস ঘরে ঢুকিয়া কি কতকগুলি দরকারি কাগজপত্র দেখিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর কয়েকটা চিঠি পিতলের একটি সিংহমূর্ত্তি দ্বারা চাপা রহিয়াছে। সে দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া তিনি আবার কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

বেয়ারা আসিয়া খবর দিল, চা দেওয়া হইয়াছে। নিরঞ্জন হাতের কাগজ আবার দেরাজে ঢুকাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। অত্যন্ত জরুরী কাজ না থাকিলে, খাওয়া-দাওয়ার সময় তিনি নিয়ম-মত পালন করিয়া যাইতেন। এইজন্য তাঁহার স্বাস্থ্য এ পর্য্যন্ত অটুট।

চা খাইতে বসিয়া তিনি ছোকরাকে চিঠিগুলি বসিবার ঘর হইতে লইয়া আসিতে বলিলেন। একতাড়া চিঠি, পোষ্টকার্ড আছে, খামও আছে। বেশীর ভাগই ব্যবসা-সংক্রান্ত। সেগুলি রাখিয়া দিলেন। অন্যগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, ইন্দুর চিঠি আছে কিনা। সচরাচর সে পোষ্টকার্ডেই চিঠি লেখে। এবারে কিন্তু খামের উপর তাহার হস্তাক্ষর। সাবিত্রীর অসুখ হইয়াছে, ইহা নিরঞ্জন কলিকাতার পত্রেই জানিয়াছিলেন, তবে ইন্দু সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখে নাই বলিয়া তিনি ব্যাপারটাকে সামান্যই মনে করিয়াছিলেন। চিঠিতে ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বেশী টাকার প্রয়োজন আছে কিনা, থাকিলে যেন সঙ্কোচ না করিয়া তাঁহাকে জানায়। ইন্দু সাবিত্রীর নির্দ্দেশমত লিখিয়াছিল যে টাকার কোনো প্রয়োজন নাই। অতএব নিরঞ্জন স্ত্রীর অসুখের বিষয় আর বড় একটা কিছু চিন্তা করেন নাই।

ইন্দু খামে চিঠি লিখিয়াছে দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইয়া চিঠিখানা খুলিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দুর আবার বক্তৃতা করিবার সখ হইল নাকি? এতদিন তাহার বোঝা উচিত ছিল যে, বক্তৃতায় কোনই কাজ হয় না। কিন্তু কৈ? এ ত ইন্দুর চিঠি নয়? উপরের ঠিকানাটা মাত্র ইন্দুর লেখা, ভিতরের চিঠি তাঁহার কন্যা মায়ার। এই মায়ার প্রথম চিঠি। মেয়ের হাতের লেখা প্রথম চিঠি পাইয়া নিরঞ্জনের মনে যে আনন্দ হইয়াছিল, চিঠি পড়িয়া সেটুকু কিন্তু নিঃশেষে তাঁহার মন হইতে মুছিয়া গেল। সাবিত্রী অত্যন্ত পীড়িত, তার মেয়ে ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে যাইতে লিখিয়াছে।

প্রথমেই মনে হইল তাঁহার যাওয়া উচিত; সাবিত্রী হয়ত বাঁচিবেই না, শেষ দেখা দেখিয়া আসা কর্ত্তব্য, কিছু যদি তাহার বলিবার থাকে শুনিয়া আসা কর্ত্তব্য। সত্য বটে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তাঁহাদের মধ্যে বহুকাল চুকিয়া

গিয়াছে। পরস্পরের মনেও পরস্পরের আর কোনো স্থান নাই, তবু সাবিত্রী তাঁহার বিবাহিতা পত্নী, তাঁহার সন্তানের জননী। ছাড়াছাড়ি সাবিত্রীর দোষেই যদিও ঘটিয়াছিল, তবু তাহা এখন স্মরণ রাখা উচিত নয়।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, এখানকার কাজকর্ম্মের কথা। এত সব দেখাশোনা করিবে কে? তিনি উপস্থিত থাকিয়াই সব সময় সব দিক্ সামলাইতে পারেন না, উপস্থিত না থাকিলে কারবারের কি যে অবস্থা হইবে, ভাবিতেও তাঁহার মন আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। দেশে একবার গিয়া পড়িলে, ফিরিতে কত দেরী হইবে কে জানে? এখন লম্বা ছুটি পাওয়া তাঁহার অসম্ভব। এ অবস্থায় কি করা যায়?

অনেক ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। চায়ের পেয়ালায় দু-তিন চুমুক দিয়াই উঠিয়া পড়িলেন, অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্য টেবিলে অভুক্ত পড়িয়া রহিল। ছোক্‌রা মহানন্দে সেগুলি উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল। এগুলি তাহারই ভোগে লাগিবে।

নিরঞ্জনের মোটর-চালক সবে গাড়ী 'গারাজে' ঢুকাইয়া চাবি বন্ধ করিবার জোগাড় করিতেছে এমন সময় আবার তাহার ডাক পড়িল। বিরক্ত মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে সে প্রভুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটি চট্টগ্রামী মুসলমান। শার্ট এবং কোট সে খুলিয়া রাখিয়াছিল, গারাজ হইতে আসিবার পথেই কোনমতে আবার সেগুলি গায়ে চড়াইয়া লইল।

নিরঞ্জন টেবিলে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিলেন। চিঠিখানা সাদা একটা খামে ঢুকাইয়া, তাহার উপর তাড়াতাড়ি নাম লিখিয়া বলিলেন, "যাও, ম্যানেজার বাবুর ওখানে। চিঠি তাঁকে দাও, তিনি যদি আস্‌তে পারেন, তাহলে গাড়ী ক'রে তাঁকে নিয়ে এস।"

লোকটি চিঠি লইয়া চলিয়া গেল। নিরঞ্জন দেরাজ খুলিয়া অনেকগুলি চিঠিপত্র টানিয়া বাহির করিলেন। কলিকাতার যে চিঠিতে সাবিত্রীর অসুখের খবর প্রথম পাইয়াছিলেন, সেখানি খুঁজিয়া বাহির করিতে কিছুক্ষণ সময় লাগিল। চিঠিখানি সেজভাই চিত্তরঞ্জনের লেখা। বিশেষ কিছু খবর তাহাতে ছিল না। "দিদির চিঠিতে জানিলাম মেজবৌঠাকুরাণী পীড়িতা আছেন। ম্যালেরিয়া জ্বর বলিয়া সকলে সন্দেহ করিতেছে। গ্রামের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছে, কারণ তিনি ডাক্তারী ঔষধ

খাইতে চান না। বড়দাদা কলিকাতায় লইয়া আসিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি রাজী হন নাই।"

পত্রখানির তারিখ চারমাস আগেকার। তাহার পরে আর একখানা মাত্র চিঠিতে সাবিত্রীর অসুখের উল্লেখ আছে। সে এখনও সারে নাই, এইমাত্র খবর।

নিরঞ্জন চিঠিগুলি উঠাইয়া রাখিলেন। না যাওয়াও ভাল দেখায় না, আবার যাওয়ার ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত মুস্কিল। বাড়ীতে ত পুরুষ মানুষ কেহ নাই, পীড়িতা সাবিত্রীকে লইয়া ইন্দু এবং বালিকা মায়া হয়ত খুবই বিপন্ন বোধ করিতেছে। ভাইরা সকলেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, দেশে গিয়া বসিয়া থাকিবার সময় কাহারও নাই। ম্যানেজার শিবশঙ্কর-বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা হয় ঠিক করিবেন বলিয়া নিরঞ্জন অফিস-ঘরেই বসিয়া রহিলেন।

শিবশঙ্কর রায় এখানে আসার পূর্ব্ব হইতেই নিরঞ্জনের পরিচিত। আগে অন্য কাজ করিতেন, এখন নিরঞ্জনের কারবার দেখেন। বেশীর ভাগ সময় তাঁহাকে মফঃস্বলেই থাকিতে হয়, মাঝে মাঝে রেঙ্গুনেও আসিয়া থাকেন। তাঁহারও একদিক্ দিয়া নিরঞ্জনেরই দশা, সেইজন্য উভয়ের ভিতর শুধু মনিব এবং কর্ম্মচারীর সম্পর্কই নয়, বন্ধুত্বও আছে। শিবশঙ্করের স্ত্রী বহুকাল পূর্ব্বে একটি-মাত্র ছেলে রাখিয়া মারা গিয়াছেন, তিনি আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধ সত্ত্বেও আর বিবাহ করেন নাই। ছেলেটিকে নিজেই মানুষ করিয়াছেন। দেবকুমার বছর-দুই হইল বিলাতে পড়িতে চলিয়া গিয়াছে।

বাহিরে গাড়ী আসার শব্দ হইল। জুতার শব্দে নিরঞ্জন বুঝিলেন, শিবশঙ্করই আসিতেছেন। তাঁহার মোটর-চালকের জুতার এত ঘটা নাই।

শিবশঙ্কর মস্ত মোটা এক ওভারকোট পরিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। মাথার চুলের ভিতর আঙুল চালাইতে চালাইতে বলিলেন, "বেশ সময় ডেকে পাঠিয়েছেন যাহোক, ব্যাপারখানা কি ?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "ব্যাপার সুবিধের কিছুই নয়। বসুন, বল্‌ছি। চা খান এক পেয়ালা।"

শিবশঙ্কর একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলেন, "তা আপত্তি নেই, যা বর্ষার দিন!"

নিরঞ্জন ছোকরাকে ডাকিয়া চা আনিতে বলিয়া দিলেন। তাহার পর

মায়ার চিঠিখানি বাহির করিয়া বলিলেন, "এত কাল পরে মায়ার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম, তাও চমৎকার সুখবর! তার মায়ের ভয়ানক অসুখ, কিছুতেই সারছে না। আমাকে অনেক ক'রে যাবার জন্যে লিখেছে।"

শিবশঙ্কর গলাটা সশব্দে পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "সুখবরই বটে! তা যাবেন যে, এদিকের কি হবে?"

ছোক্‌রা আসিয়া চা দিয়া গেল। চায়ের পেয়ালা অভ্যাগতের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে দিতে নিরঞ্জন বলিলেন, "সেই পরামর্শ করতেই ত আপনাকে ডাকা। আমার যাওয়া কি একেবারে চলে না? দিন-কয়েকের জন্যে না-যাওয়াটা বড় অন্যায় হবে। বাড়ীতে লোকের মধ্যে তিনটি মেয়ে মানুষ, তার ভিতর একজন এরকম পীড়িত। মেয়েটাও বড় হয়ে যাচ্ছে, এর পর তার এডুকেশন আরম্ভ না করলেই নয়। আমার যাওয়াটা খুবই দরকার।"

শিবশঙ্কর বলিলেন, "যাবেন না একথা ত আর বলতে পারি না! কিন্তু এদিক্‌কার অবস্থা সবই ত জানেন! আপনি একদিন না থাকলেই সব উলট-পালট! গেলে আপনার কত দেরি হবে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "ঠিক ক'রে বলি কি ক'রে? সেখানে গিয়ে অবস্থা যেমন দেখব সেই অনুসারে ব্যবস্থা করতে হবে। একমাস অন্ততঃ ধ'রে রাখুন।"

শিবশঙ্করবাবু বলিলেন, "অসম্ভব! ম'রে পিটে দু 'উইক' চালাতে পারি। তার বেশী নয়।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "যেতে আসতেই ত তার দশটা দিন কেটে যাবে। চার পাঁচ দিনে কি আমার ওখানকার কাজ সেরে আসতে পারব?"

শিবশঙ্কর বলিলেন, "তা যাওয়া কি আপনি একেবারে ঠিক ক'রে ফেলেছেন? ছেলেমানুষ ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি যেতে লিখেছে, সত্যি অবস্থা খুব বেশী খারাপ নাও হতে পারে। টেলিগ্রাম ক'রে দেখুন, তারপর যা হয় স্থির করা যাবে। না গেলে না যদি চলে ত যেতেই হবে, মানুষের প্রাণের চেয়ে কি আর কিছু বড়?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আচ্ছা, তাই ক'রে দেখি। আপনি নিয়ে যান টেলিগ্রামটা। আর ভাল কথা, কাল সকালে মনে ক'রে শ'চার টাকাও T. M. O তে পাঠিয়ে দেব। অসুখ-বিসুখের বাড়ী, টানাটানি প'ড়ে গেছে বোধ হয়।"

শিবশঙ্কর বলিলেন, "তাই দেবেন। আচ্ছা, formটা লিখে দিন। যা মেঘের ঘটা, এর পর যাওয়া মুস্কিল হবে। এদিক্‌কার পথে সন্ধ্যের পর মোটরে যেতেও গা ছম্‌ছম্‌ করে।"

টেলিগ্রাম লিখাইয়া লইয়া শিবশঙ্কর প্রস্থান করিলেন। নিরঞ্জনও অফিস ঘর ত্যাগ করিয়া উপরে চলিলেন। পোষাক ছাড়িয়া, ড্রেসিং গাউন আর চটি জুতা পরিয়া খানিক বাগানে ঘুরিয়া আসিলেন। বাগানটি তাঁহার বড় সখের জিনিষ। প্রায়ই নূতন নূতন চারা কিনিয়া আনিতেন, এবং তাহাদের কোন্‌টি কেমন বাড়িতেছে রোজ তাহা একবার করিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া আসিতেন। একটি ওড়িয়া মালী ছিল বটে তবে বাগানে তাহার কৃতিত্ব বিশেষ কিছুই ছিল না।

১০

সমস্ত দিন অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া, সন্ধ্যার একটু আগে সাবিত্রী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মায়া এতক্ষণ তাহার কাছে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতেছিল। কখনও বা বাতাস করিতেছিল। এখন মাকে ঘুমাইতে দেখিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাত ব্যথা করিতেছিল, শরীরও বড় ক্লান্ত, কিন্তু মন যেন তাহার চেয়েও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

পাখাখানা আস্তে আস্তে মায়ের পাশে নামাইয়া রাখিয়া সে পিসীমার সন্ধানে চলিল। ইন্দু তখন ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া সাবিত্রীর জন্য ফলের রস করিতেছিল। তাহার মুখ বড় বিষণ্ণ। সাবিত্রীর সারিবার সম্ভাবনা যে খুবই কম, ডাক্তার আজ তাহাকে সে কথা বলিয়া গিয়াছেন। ইন্দু কোথাও যেন কূলকিনারা দেখিতেছিল না। চার-চারটা ভাই, তাহার ভিতর একটাও কি বাড়ীতে থাকিতে নাই? এইসব কাজ কি তাহার করিবার? নিরঞ্জনের কি একবার আসা উচিত নয়? ঝগড়াই না-হয় হইয়াছে, বহু বৎসর মুখ দেখাদেখি নাই, তাই বলিয়া কি মরার সময়েও দেখিবে না? মায়ার চিঠি এতদিন নিশ্চয়ই পাইয়াছে, জবাবও ত কিছু দিল না।

মায়া এমন সময় দরজার কাছ হইতে ডাক দিল, "পিসীমা!"

ইন্দু মুখ তুলিয়া চাহিল। মায়া বলিল, "মা একটু ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই বাইরে এলাম। আমায় কিছু খেতে দেবে? বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

ইন্দু বলিল, "কপাল আমার! সেই দুপুরে দুগ্রাস খেয়েছিস্. এখন অবধি আমার মনেই হয়নি। বোস্ পিঁড়িটা টেনে, যা আছে নিয়ে আসি।"

মায়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিল। ইন্দু তাড়াতাড়ি ঘরে তৈয়ারী মুড়কী, ঘন দুধ, দুইটা আম এবং বড় একটা ক্ষীরের ছাঁচ লইয়া আসিল। মায়া বলিল, "না পিসীমা, এতগুলো খেতে পারব না।"

ইন্দু তাড়া দিয়া বলিল, "নে, নে, ন্যাকামী রাখ্। এরপর রাত্রে কখন ছাড়া পাবি তার ঠিকানা আছে কিছু? তোদের বয়সে আমরা এর তিন গুণ খেয়েছি।"

অন্য সময় হইলে মায়া তর্ক করিতে বসিত। এখন কিন্তু তাহার মন এতই ভার হইয়া ছিল যে কথা কাটাকাটি করিতে ইচ্ছাই হইল না। নীরবে খাইতে লাগিল। ইন্দু আবার কমলালেবু লইয়া রস করিতে বসিল। পাড়াগাঁয়ে সব-সময় সব ফল পাওয়াই যায় না। তাই সপ্তাহে দুতিন বার করিয়া কলিকাতা হইতে ফল আসে।

বাহির হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, "কই গো, ঘরে কে আছ?"

মায়া তাড়াতাড়ি খাওয়া ফেলিয়া উঠিতে যাইতেছিল দেখিয়া, ইন্দু বলিল, "বোস্, বোস্, আমি দেখছি কে। দু-গ্রাস মুখে না তুলতেই দৌড়ে চলল মেয়ে।"

ইন্দু উঠিয়া গেল। বাহির হইয়া দেখিল, প্রভাসের মা দাঁড়াইয়া আছেন। হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "ওমা, অমন ক'রে বাইরে দাঁডাবার কি দরকার? ঘরে ঢুকে এলেই পারতেন। আপনি ত আর নূতন মানুষ নয়!"

প্রভাসের মা বলিলেন, "অসুখ-বিসুখের ঘর, অমন হট্ ক'রে ঢোকা যায় কি? কখন কেমন থাকে। আজ বৌ-এর জ্বর কেমন? কিছু কমেছে?"

ইন্দু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আর কমেছে! বৌ বোধ হয় আমাদের ফাঁকি দিয়ে চল্‌ল এবার।"

প্রভাসের মা আঁতকাইয়া উঠিবার ভাণ করিয়া বলিলেন, "ওমা, সে কি কথা! এই কি যাবার বয়স? ভাল ক'রে ডাক্তার দেখাও! কলকাতায় নিয়ে যাও না? সেখানে কত বড় বড় ডাক্তার আছে।"

ইন্দু বলিল, "আয়ু ফুরোলে, ডাক্তারে কি করতে পারে? তবু আমাদের দেখান উচিত। কিন্তু বৌ-এর জেদ ত জানেন। সে মরবে তবু জেদ ছাড়বে না। এখান ছেড়ে নড়বে না, ছিষ্টি উল্‌টোলেও না।"

প্রভাসের মা বলিলেন, "তা ভাইকে আসতে লেখ না? এসব কি আর তোমার কাজ? সে এলে দে'খে শুনে ব্যবস্থা করবে।"

ইন্দু বলিল, "চিঠি ত লিখেছি, এখন এলে হয়। আমার আর কিছু ভাল লাগে না, দিদি। কাঁহাতক এই রোগী আগলে প'ড়ে থাকা যায় বলুন ত? যাদের ভাবনা, তারা ভাবুক এসে। নিজের সংসার ত চুকেই গেছে, এখন আমার হরিনাম ক'রে দিন কাটানোর কথা।"

প্রভাসের মা বলিলেন, "সে ত ঠিক কথা। তা বৌকে দে'খে যাই একবার, এলামই যখন।"

ইন্দু বলিল, "এই অল্প আগে একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরে এসে বসুন, ওর ঘুম ত? আধ ঘণ্টার মধ্যেই ছুটে যাবে। তারপর দে'খে যাবেন এখন।"

প্রভাসের মা ইন্দুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘরে গিয়া বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়া কোথায়? তাকে দেখছি না যে?"

ইন্দু বলিল, "একটু জল খেতে বসেছে। সারাদিন ত বেচারীর বিশ্রাম নেই, মায়ের সেবা নিয়েই আছে। এখন মা ঘুমিয়েছে ব'লে বেরিয়েছে।"

অভ্যাগতা বলিলেন, "সত্যি ভারি লক্ষ্মী মেয়ে। কার অদৃষ্টে নাচছে কে জানে?"

এমন সময় সাবিত্রীর তীব্র কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ইহারই মধ্যে সে জাগিয়া উঠিয়াছে। মায়াকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "মরেছিস্ নাকি ছুঁড়ী? ডেকে ডেকে গলা ধ'রে গেল, কারো সাড়াশব্দ নেই।"

ইন্দু বলিল, "ওমা, এই হয়ে গেল ঘুম? মেয়েটা সবে দুটো মুখে দিতে বসেছিল। নিজের মুখে বলতে নেই, নিজেরই ভাইঝি, কিন্তু এমন লক্ষ্মীমেয়ে সত্যি হয় না। মায়ের সেবা যা ক'রে করছে তা ত চোখে দেখছি। তাই কি দুটো ভাল কথা আছে মায়ের মুখে? শুনলেন ত ডাকার ছিরি?"

প্রভাসের মা বলিলেন, "যেতে দাও ভাই। রুগী মানুষের গালমন্দ কিছু ধরতে নেই। চল, বৌকে একটু দে'খে যাই।"

ইন্দুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাবিত্রীর ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। মায়া ডাক শুনিয়াই খাওয়া ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া সাবিত্রীকে বাতাস করিতে বসিয়াছিল। তাহার বকুনি খাওয়াটা তখনও শেষ হয় নাই।

প্রভাসের মাকে দেখিয়া সাবিত্রী হঠাৎ থামিয়া গেল। কিঞ্চিৎ নরম সুরে

মায়াকে বলিল, "ডেকেছি ব'লে কি খাওয়া ফে'লে আসতে বলেছি? যা, দুধটা খেয়ে আয়। আমি অসুখে প'ড়ে মেয়ের যা চেহারা হয়েছে।"

মায়া দুধে জল ঢালিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মায়ের কথামত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ইন্দুকেও বিদায় করা সাবিত্রীর প্রয়োজন ছিল, কি ছুতা করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। একটু ভাবিয়া বলিল, "ফলের রস হয়েছে নাকি ঠাকুরঝি? একটু কিছু খেলে হয় এখন।"

ইন্দু বলিল, "প্রায় হয়েই আছে। অল্প একটু বাকি। আচ্ছা দিদি বসুন, আমি ফলের রসটা নিয়ে আসি।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

সাবিত্রী প্রভাসের মায়ের দিকে তাকাইয়া বলিল, "কর্ত্তার চিঠি পেয়েছেন?"

প্রভাসের মা অতি সংক্ষেপে বলিলেন, "হুঁ"।

সাবিত্রী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "রাজী হননি বুঝি?"

প্রভাসের মা বলিলেন, "কই আর রাজী হলেন? লিখেছেন, সম্বন্ধ ত খুবই ভাল, এমন আর আমার ছেলের অদৃষ্টে জুটবে না। কিন্তু বাপের অজ্ঞাতে বিয়ে হবে। এতে কি ক'রে রাজী হই? শেষে কি বুড়ো বয়সে পুলিস কেসে পড়ব?"

সাবিত্রী শুনিয়া একেবারে যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল। প্রভাসের মা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "তোমার মেয়ের পাত্রের অভাব কি বোন? আমার ছেলের চেয়ে ঢের ভাল ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। তোমাদের অভাব কিসের? যেমন ছেলে চাইবে তেমনি পাবে।"

সাবিত্রী পাশ ফিরিয়া শুইল। ভাঙা গলায় বলিল, "আর সময় কই? ভেবেছিলাম মেয়ের একটা সুগতি ক'রে যাব, কিন্তু আমারই ত মেয়ে, তার কপাল আর কত ভাল হবে? এর পর যা অদৃষ্টে আছে হবে।"

প্রভাসের মা বলিলেন, "আচ্ছা, আজ তবে আসি বোন।" তাঁর সাবিত্রীর সামনে বসিয়া থাকিতেই অস্বস্তি বোধ হইতেছিল।

সাবিত্রী বলিল, "আচ্ছা আসুন। একটা দয়া করবেন, আমি বেঁচে থাকতে আর আমায় দেখতে আসবেন না।"

ভদ্রমহিলার মুখখানা একেবারে লাল হইয়া উঠিল। সুস্থ অবস্থায় কোনো মানুষ এরকম কথা বলিলে, তখনই একপালা হইয়া যাইত বোধ হয়, কিন্তু

সাবিত্রীর তখন এমনি অবস্থা যে নিতান্ত পাগল না হইলে কেহ তাহার সহিত ঝগড়া করিতে পারে না। সুতরাং প্রভাসের মা হন্‌হন্‌ করিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাওয়া ভিন্ন আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

সাবিত্রী দেওয়ালের গায়ে টাঙান একখানি কৃষ্ণের ছবির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। খানিক পরে অস্ফুট স্বরে বলিল, "তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, তুমিই ওর ধর্ম্ম রক্ষা ক'রো।"

ইন্দু ফলের রস লইয়া ঘরে ঢুকিয়া অবাক্ হইয়া গেল, "ওমা, দিদি এরই মধ্যে চ'লে গেলেন?"

সাবিত্রী উত্তর দিল না। ইন্দু শাদা পাথরের বাটি ভরিয়া ফলের রস আনিয়াছিল, রোগিণীর মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, "ঘাড়টা একটু উঁচু কর, তা না হলে চুমুক দিতে পারবে না।"

সাবিত্রী বলিল, "একটু পরে খাব, এখন গা-টা কেমন যেন করছে।"

ইন্দু শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "ডাক্তারের কাছে একবার লোক পাঠাব?"

সাবিত্রী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "পরমায়ু ফুরোলে ডাক্তার কি করবে?"

ইন্দু ভয় চাপা দিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "পরমায়ু ফুরিয়েছে তোমায় কে খবর দিল? শুধু একটু জ্বরেই পরমায়ু ফুরিয়ে গেল? অনেকদিন ভুগছ কি না, তাই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ।"

সাবিত্রী কথার উত্তর দিল না। ফলের রস ঢাকিয়া রাখিয়া ইন্দু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ভৃত্য গদাধর তখন কাজের অভাবে, গরুর খড় কাটিতে বসিয়া গিয়াছিল ইন্দু তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে, একবার পঞ্চানন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয় ত।"

ভৃত্য খড় রাখিয়া উঠিয়া গেল। মায়া বারান্দার এককোণে দাঁড়াইয়া ছিল। সে পিসীর কাছে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন পিসীমা, ডাক্তারকে এখনই ডাকতে পাঠাচ্ছ কেন? মায়ের জ্বর আবার বাড়ল নাকি?"

ইন্দু বলিল, "জ্বর ত দেখিনি। তবে শরীর কেমন করছে বলল, তাই ভাবলাম ডাক্তার একটু দে'খে যাক্। তুই যা না ঘরে। একটু বাতাস কর্ গে যা।"

মায়া তাড়াতাড়ি মায়ের ঘরে ছুটিয়া গেল। ইন্দু ভাঁড়ার ঘরে গিয়া কাজে মন দিল।

মিনিট-কয়েক পরে মায়া ছুটিয়া আবার বাহির হইয়া আসিল। ইন্দুর কাছে আসিয়া ভীতকণ্ঠে বলিল, "পিসীমা, মায়ের জর ভয়ানক বেড়ে গেছে, কি সব বলছে বুঝতে পারছি না। ডাক্তারবাবু এখনও এলেন না? তুমি এস আমার সঙ্গে, একলা মায়ের কাছে আমার বসতে ভয় করছে।"

ইন্দু বঁটি ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। সাবিত্রীর কাছে আসিয়া দেখিল, মায়ার কথা ঠিকই। তাহার চোখ মুখ লাল, অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করিতেছে, অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলিতেছে। ভয়ে ইন্দুর প্রাণ উড়িয়া গেল। মায়াকে বলিল, "ছুটে যা ঘোষাল কাকার বাড়ী, যাকে পাস্, ডেকে নিয়ে আয়।"

মায়া দৌড়িয়া গেল। সাবিত্রীর পাশে দাঁড়াইয়া ইন্দু চোখের জল মুছিতে লাগিল। বৌ তাহা হইলে সত্যই চলিল। কত আশা আনন্দ লইয়া বালিকা বয়সে এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, কি রিক্ততা, কি দুঃখের ভিতর দিয়া অকালেই তাহার জীবনটা সাঙ্গ হইয়া গেল। দোষ তাহারই হয়ত, কিন্তু শাস্তিও সে-ই বহন করিয়াছে। কোনদিন ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে নাই। নিজে যাহা ভাল বুঝিয়াছিল, তাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নাই। ভ্রাতার বিরুদ্ধে তাহার মনে একটা অভিযোগ মাথা ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। সাময়িক কলহকে সে জীবনব্যাপী করিয়া রাখিল? ঝগড়া-ঝাঁটি কোন্ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে না হয়? কিন্তু তাহারা আবার মিটমাটও করে, একসঙ্গে বাসও করে। নিরঞ্জনের সবই অনাসৃষ্টি। স্ত্রী মরিবার সময়ও সে একবার আসিতে পারিল না?

এমন সময় গদাধরের সঙ্গে ডাক্তার এবং মায়ার সঙ্গে ঘোষাল আসিয়া পৌছিলেন। রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। "ওষুধ গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু ভরসা বিশেষ দিতে পারি না। ওঁর স্বামীর কাছে টেলিগ্রাম করুন।"

মায়া কাঁদিয়া উঠিল। ইন্দু তাহাকে তাড়াতাড়ি টানিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া আসিল। ঘোষালকে বলিল, "আমি টাকা দিচ্ছি, আপনি টেলিগ্রামটা ক'রে দিন।"

গদাধরকে আত্মীয়-স্বজন সকলকে খবর দিবার জন্য পাঠাইয়া দিল।

১১

সকাল হইতে বাড়ীখানার উপর একটা ভয়াবহ নীরবতা বিরাজ করিতেছে, অথচ মানুষের অভাব নাই, কাজকর্ম্ম, চলাফেরাও শেষ হয় নাই। কলিকাতা হইতে মনোরঞ্জন সপরিবারে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ইন্দুর কনিষ্ঠা ভগিনী বৌদিদির এরূপ সঙ্কট অবস্থা শুনিয়া স্বামীর কাছে কান্নাকাটি করিয়া কোনোপ্রকারে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার অবশ্য মেয়াদ বেশী দিনের নয়, এক সপ্তাহের মধ্যেই তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

ইন্দু এবং মায়া দুজনেই আজ ছুটি পাইয়াছে। রান্নাবান্নার ভার লইয়াছে মনোরঞ্জনের সঙ্গে আগত বামুন ঠাকুর, এবং রোগিণীর শুশ্রূষা ও পথ্যাদি প্রস্তুতের ভার লইয়াছে বড় বৌ। মনোরঞ্জন বাহিরের ঘরে বসিয়া লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। সাবিত্রীর অবস্থা আজ অত্যন্ত খারাপ, ডাক্তার জবাব দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখন তাহার জ্ঞান নাই। একজন এলোপ্যাথ ডাক্তারকে মনোরঞ্জন ডাকাইয়া আনিয়াছেন। তিনি শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতেছেন। গ্রামের লোক বাড়ীতে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পুরুষরা বৈঠকখানায় মনোরঞ্জনের কাছে খবর লইয়া যাইতেছে, দুই একজন বসিয়া কথাবার্ত্তাও কহিতেছে। মেয়েরা ভিতরে হয় ভাঁড়ার ঘরে ইন্দুর সঙ্গে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে, না-হয় শয্যায় শায়িতা মায়ার পাশে বসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। রোগিণীর ঘরে লোকের ভিড় করিতে ডাক্তার নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা হইলে দরজার কাছ হইতে উঁকি মারা ভিন্ন উপায় নাই। ঘরের ভিতর বড়বৌ ও তাহার ছোট ননদ রোগিণীর শুশ্রূষা করিতেছে।

মায়া এতদিন একলা দুইটা পূর্ণবয়স্ক মানুষের কাজ চালাইয়াছে। আজ কিন্তু তাহার সব বল যেন লুপ্ত হইয়াছে। সকাল হইতে সে বিছানা ছাড়িয়া ওঠে নাই, বালিশে মুখ লুকাইয়া ক্রমাগত কাঁদিতেছে। মায়ের অবস্থা বুঝিতে তাহার দেরি হয় নাই। জগতে এই মাতাই তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া সে ভয়ে আকুল হইয়া উঠিতেছিল। কোথায় যাইবে সে, কি হইবে তাহার? সব যে অচেনা, অজানা, কুয়াসাচ্ছন্ন। পিতাকে সে চেনে না, মায়ের কাছে তাঁহার যে বর্ণনা সে শিশুকাল হইতে পাইয়া

আসিতেছে, তাহাতে তাঁহাকে ভয় না করিয়া সে থাকিতে পারে না। ভালবাসা দিয়া মনে মনে পিতার যে মূর্ত্তি সে স্বজন করিয়াছে, বাস্তবিক তিনি কি তাই, না একেবারে অন্য মানুষ?

ইন্দু আসিয়া একবার তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, "ওঠ্ রে মায়া, বেলা অনেক হল, স্নান ক'রে দুটো মুখে কিছু দে।"

মায়া মাথা না তুলিয়াই বলিল, "আজ থাক্ না পিসীমা। উঠতে এখন একেবারে ইচ্ছে করছে না।"

ইন্দু আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, "না, মা, ওঠ, কিছু খেয়ে নাও। তারপর তোমার মায়ের কাছে যাও একটু। সকাল থেকে ত ও-ঘরে যাওনি একবারও।"

মায়া বলিল, "না পিসীমা, আমি আর ও-ঘরে যাব না, মায়ের মুখের দিকে চাইলে আমার ভয় করে। তাঁকে আর চেনাই যায় না যে?"

ইন্দুর চোখও জলে ভরিয়া গেল। সে ভাঙা গলায় বলিল, "আজ অসুখটার একটু বাড়াবাড়ি যাচ্ছে কিনা, তাই চেহারা ওরকম হয়েছে। আবার একটু কমার মুখে গেলেই যেমন চেহারা তেমনি হবে।"

মায়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মা আর ভাল হবে না, পিসীমা। তোমরা আমায় ঠকাচ্ছ, আমি কিন্তু সব বুঝতে পেরেছি।"

ঘরের ভিতর সকলের চোখই সজল হইয়া উঠিল। ইন্দু তবু মায়াকে বৃথা সান্ত্বনা দিতে লাগিল, "কি যে বলিস, পাগলি। কেন ভাল হবে না? নিশ্চয় ভাল হবে। নূতন ডাক্তার খুব ভাল, কত সাঙ্ঘাতিক রোগ সে সারিয়েছে। তুই ওঠ, খা কিছু, স্নান না-হয় নাই করলি।"

টানাটানিতে মায়া উঠিয়া বসিল। ইন্দু বামুন ঠাকুরকে ভাত আনিতে আদেশ করিয়া মায়ার রুক্ষ চুলের রাশ জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

একজন প্রতিবেশিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, তোমার মেজদা আস্‌বেন না নাকি?"

ইন্দু বলিল, "জাহাজে ত পরশু চড়েছে, এখনও এখানে এসে পৌঁছতে দু-তিন দিন।"

প্রতিবেশিনী ঠোঁট উল্টাইয়া মাথা নাড়িলেন, অর্থাৎ তাহা হইলে আসা না-আসা সমানই।

বামুন ঠাকুর ভাত দিয়া গেল। মায়া উঠিয়া গিয়া আসনে বসিতেই

একটি যুবতী অস্ফুটস্বরে ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তারে কি বলে ইন্দুমাসী? কোনো ভরসা দিচ্ছে কি?"

ইন্দু বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িল। বলিল, "এখন ভগবান্‌ই ভরসা। ডাক্তারের সাধ্যর মধ্যে আর নেই।"

যুবতী বলিল, "আহা, কি বা বয়স! এই কি যাবার সময়? কোথায় মেয়ের বিয়ে দিয়ে কত সাধ আহ্লাদ করবে, না সংসারের মায়া কাটিয়ে চলল। আজকের রাত কাটবে ত মাসী?"

ইন্দু বলিল, "হরিই জানেন। ডাক্তার ত কোনো ভরসা দিচ্ছে না। বৌয়ের চেহারা যা হয়েছে, তা থাকবার চেহারা না। এই বয়সে যমের সঙ্গে খুব চেনা-শোনা হয়ে গেছে বাছা, তার ডাক এলে সে মুখে যে ছাপ দিয়ে যায় তা ভুল করবার নয়।"

মায়া অল্প দু-এক গ্রাস মুখে দিয়া উঠিয়া পড়িল। ইন্দু বলিল, "ও কি রে? ভাত ত সব ফে'লে দিলি?"

মায়া বলিল, "আর পারছি না আমি, আমার গলায় যেন সব জড়িয়ে যাচ্ছে। ও-বেলা আর আমার জন্যে রেঁধো না, শুধু একটু দুধ খাব।"

ইন্দু বলিল, "যা একবার তোর মায়ের কাছে। যদি জ্ঞান হয়ে থাকে, তোকে না দেখলে মনে কষ্ট পাবে।"

মায়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও রোগিণীর ঘরের দিকে চলিল। দরজার কাছে আসিয়াই দেখিল, তাহার ছোট পিসী বাহির হইয়া আসিতেছে। উৎসুকভাবে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ ছোট পিসীমা, মা এখন কেমন আছে? ঘুমোচ্ছে?"

ছোট পিসী বলিল, "একটু যেন ভালই বোধ হচ্ছে রে। জ্ঞান হবে বোধ হয়।"

মায়া একটু আশ্বস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার জ্যাঠাইমা তখন পাখাখানা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "একটু বাতাস কর ত মায়া, আমি আস্‌ছি এখুনি।"

মায়া ভীতভাবে বলিল, "না জ্যাঠাইমা, আমি একলা এ ঘরে থাকতে পারব না। আমার ভয়ানক ভয় করে।"

তাহার জ্যাঠাইমা বলিলেন, "আরে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি এসে পড়ব। কিসের এত ভয়? ছোট ঠাকুরঝিও এখুনি আসবে।"

মায়া অগত্যা মায়ের মাথার পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিল।

মিনিট দুই পরে হঠাৎ রোগিণীর চোখ খুলিয়া গেল। এদিক্ ওদিক্ কিসের সন্ধানে যেন তাকাইল। মেয়েকে দেখিয়া বলিল, "মায়া, ওরা সব কোথায় ?"

মায়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কারা মা ? জ্যাঠাইমা ?"

সাবিত্রী বলিল, "না রে, ঘর ভরা লোক ছিল না ? আমি যেন দেখলাম, শাদা পোষাক পরা কত মানুষ আলো-হাতে আমার বিছানার চারদিকে ঘুরছে। কেউ কি আসেনি ?"

ভয়ে দুঃখে বালিকার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। তবু সে কোনোমতে বলিল, "ও-রকম কেউ ত আসেনি মা। শুধু জ্যাঠাইমা আর ছোট পিসীমা এ ঘরে ছিল।"

সাবিত্রী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর ক্ষীণ দুর্ব্বল হস্ত তুলিয়া দেয়ালের গায়ে ঝোলান কৃষ্ণের পটখানি দেখাইয়া বলিল, "দেখ্, মায়া, তোকে ওঁর হাতে দিয়ে গেলাম। ঠাকুর কখনও মানুষকে ভোলেন না, কিন্তু তুইও যেন কখনও ভুলিস্ না। তোকে আর দেখবার কেউ রইল না। তুই আমার মেয়ে, মনে রাখিস্। সব ছেড়ে ছিলাম, কিন্তু ধর্ম্ম ছাড়িনি। তুইও যেন ছাড়িস্ না। তোর বাপ হয়ত জোর করবে, কিন্তু জোরের কাছে হার মানিস্ না।"

মায়া ইহার অর্দ্ধেক কথাও ভাল করিয়া বুঝিল কিনা সন্দেহ। তাহার দুই চোখ দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে আরম্ভ করিল। মায়ের বালিশে মাথা গুঁজিয়া সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওগো মাগো, তুমি আমায় ফে'লে চ'লে যেও না। আমি থাকতে পারব না।"

কান্নার শব্দে যে যেখানে ছিল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মনোরঞ্জনের স্ত্রী তাড়াতাড়ি মায়াকে ঘর হইতে টানিয়া লইয়া গেলেন। বলিলেন, "করিস্ কি রে ? রোগী মানুষের ঘরে ও রকম ক'রে কাঁদে ?"

মায়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। প্রাণপণে ডাকিতে লাগিল, "ঠাকুর, মাকে ভাল ক'রে দাও, আমার আর কেউ নেই। আমি মাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।"

সাবিত্রীর জ্ঞান বেশ ফিরিয়া আসিয়াছিল, জা, ননদ সকলকে চিনিতে পারিল। সকলের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল। ইন্দু বলিল, "বৌ, অত কথা ব'লো না। দুর্ব্বল শরীর, কি হতে কি হয়ে বসবে।"

সাবিত্রী বলিল, "আর কথা বলবার সময় পাব কখন? তোমরা কি আমায় কচি খুকী পেয়েছ? নিজের অবস্থা আমি বুঝি না? এতদিন ভুগে, এতক্ষণ অজ্ঞান থেকে, হঠাৎ যখন জ্ঞান হয়েছে, তখন আর আশা নেই আমার। নিজের মাকে যেতে দেখেছি, শাশুড়ী ঠাকুরুণকে যেতে দেখেছি। যাক্ গে, কাজ যা ছিল, ক'রে ত যেতে পারলাম না। মেয়েটাকে তোমরা দেখো।"

ইন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমাদের দেখতে হবে কেন বৌ? তার অমন বাপ, যে দুশো মানুষকে অন্ন দিচ্ছে, সে কি আর নিজের মেয়েকে দেখবে না?"

সাবিত্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তার দেখাকেই আমার ভয় গো। না দেখাকে নয়। তোমার ভাইয়ের নামে তোমার কাছে আর কি বলব।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "আমার বড় ট্রাঙ্কটার ভিতরে সব গহনা আছে, আমার মেয়ের বিয়ের সময় দিও। বেণারসী শাড়ী দুখানা, অন্য সব কাপড় চোপড় যা আছে, তাও দিও। কেবল দুধে গরদের লাল পেড়ে শাড়ীখানা, ওটা আমার মায়ের পূজোর শাড়ী ছিল, ওখানা দিও না। আমায় যখন পাঠাবে, ঐ শাড়ী পরিয়ে দিও। টাকাকড়ি যা কিছু, তার কাগজপত্র ঐ হাতবাক্সের ভিতর আছে। তোমার ভাই এলে দিও, সে-ই ব্যবস্থা করবে। তারই টাকা মেয়ের বিয়ের জন্যে আমি জমিয়ে রেখেছিলাম।"

ইন্দু বসিয়া কাঁদিতে লাগিল, সাবিত্রীর কথার কোনো উত্তর দিল না। খানিক পরে বড়বৌ আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া দিল।

ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। তাহার পর হঠাৎ সমস্ত বাড়ী যেন শিহরিয়া সজাগ হইয়া উঠিল। চেঁচামেচি, ছুটাছুটি লাগিয়া গেল। ডাক্তার আসিল, এবং মিনিট-পাঁচ পরে মুখ কালি করিয়া রোগিণীর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মায়াকে সকলে টানিয়া বিছানা হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিল, সে কিছুতেই উঠিল না। বালিশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া বুকফাটা কান্না কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে ফেলিয়া সকলে গিয়া সাবিত্রীর ঘরের ভিতর দরজার সামনে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দু খাটের শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। সাবিত্রীর দৃষ্টি একবার যেন তাহারই অন্বেষণে উপরে উঠিল, তাহার পর একেবারে স্থির হইয়া গেল। ধীরে ধীরে বক্ষের স্পন্দন থামিয়া গেল।

১২

রেঙ্গুনের জাহাজ ধীরে ধীরে উটরাম ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। যাত্রীর দল জিনিসপত্র গুছাইয়া, ডাঙায় নামিবার জন্য সাজসজ্জা করিয়া ডেকের উপর আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। অতি পরিচিত সৌধশ্রেণী, অতি পরিচিত পথঘাট, গড়ের মাঠ, সব ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

জাহাজ আরো কাছে আসিয়া পড়িল। যাত্রীদের অভ্যর্থনা করিতে ঘাটে লোকসমাগম হইয়াছে প্রচুর। প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রিয়জনটিকে বাছিয়া বাহির করিতে ব্যস্ত। শুধু চোখে দূরের মানুষের মুখ স্পষ্ট বোঝা যায় না। যাহাদের কাছে দূরবীণ আছে তাহারা দূরবীণ কষিয়া দেখিতেছে। অন্যরা ঝুঁকিয়া পড়িয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে যদি কাহাকেও চেনা যায়।

নিরঞ্জনও অন্য সকল যাত্রীদের সঙ্গে ডেকে দাঁড়াইয়া কলিকাতার তীরভূমির দিকে চাহিয়া ছিলেন। দীর্ঘ আট বৎসর পরে তিনি দেশে ফিরিতেছেন। আত্মীয়স্বজন দেখিতে পাইবার আশায় তাঁহারও মনে একটু আনন্দের আভাস দেখা দিতেছিল, আবার পরক্ষণেই নিজের আগমনের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া মনটা বিষণ্ণ হইয়া উঠিতেছিল। গিয়া কাহাকে কেমন দেখিবেন কে জানে? মায়া কি এখন তাঁহাকে চিনিতে পারিবে? এই অপরিচিত পিতা কি তাহার ভালবাসা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারিবে? সে এখন কেমন হইয়াছে কে জানে? তাঁহার মনে যে অনিন্দ্যসুন্দর শিশুমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, তাহার সহিত বেশী বিবাদ হইবে না ত?

জাহাজ আসিয়া ঘাটে ভিড়িয়া গেল। মিনিট কুড়ি-প'চিশ কেবল হৈ হৈ, রৈ রৈ—কুলির দৌড়, যাত্রীর চীৎকার, মাল ফেলার ধুপধাপ শব্দ। থার্ডক্লাস যাত্রীর দল নামিয়া যাওয়ার পর একটু যেন কান পাতা গেল। তখন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সকলে ধীরেসুস্থে জিনিষ-পত্র গুছাইয়া নামিতে আরম্ভ করিল। নিরঞ্জনের সঙ্গে জিনিষপত্র অতি অল্পই ছিল, সুতরাং নামিয়া পড়িতে তাঁহার বেশী বিলম্ব হইল না।

মনোরঞ্জন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন, তাহা জাহাজ হইতেই

তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। কাস্টম্‌সের কর্মচারীদের মাল পরীক্ষা করার উৎপাতে তাঁহার আরো খানিক দেরি হইল। গেটের মুখেই দুই ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইল।

নিরঞ্জন ভাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সময়ে এসে পৌঁছতে পারিনি, না? তোমার মুখ দে'খে তাই যেন মনে হচ্ছে।"

মনোরঞ্জন বিষণ্ণ মুখে বলিলেন, "ঠিকই বুঝেছ। মেজ-বৌমাকে আমরা রাখতে পারিনি।"

নিরঞ্জন নীরব হইয়া গেলেন। ভিড় ঠেলিয়া, বাহিরে গিয়া মনোরঞ্জন একখানা ট্যাক্সি জোগাড় করিলেন। দুই ভাই উঠিয়া বসিবার পর নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে গেল?"

মনোরঞ্জন বলিলেন, "তিন দিন হল।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হয়নি ত? টাকাকড়ির জন্য আমাকে ইন্দু কিছুই লেখেনি, তবু আমি চার শ' টাকা ক'দিন আগে পাঠিয়েছিলাম।"

মনোরঞ্জন বলিলেন, "জানই ত, তাঁর কি রকম জেদ ছিল। ডাক্তারী চিকিৎসা করতেই দেননি মোটে। হোমিওপ্যাথী ওষুধবিষুধ খাচ্ছিলেন। আমি খবর পেয়ে শেষ সময়ে যখন গিয়ে পড়লাম, তখন আর কিছু করবার ছিল না। তবু তখন ডাক্তার আনিয়েছিলাম। সে কিছু ক'রে উঠতে পারল না। টাকাকড়ির অসুবিধা কিছু হয়নি সম্ভবতঃ, মেজবৌমা তোমার পাঠানো টাকার অনেকটাই জমিয়ে রেখে গেছেন শুনলাম।"

নিরঞ্জন মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়া কোথায়? কেমন আছে?"

মনোরঞ্জন বলিলেন, "এখানেই সব। পরদিনই সকলকে নিয়ে চ'লে এলাম আর কি? বাড়ী এখন তালা বন্ধ, চাকর দুটো শুধু আছে। মায়া ভালই আছে শারীরিক, তবে তার মন বড় ভেঙে পড়েছে। মা ছাড়া কিছুই জানত না একেবারে।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্যাক্সি আসিয়া মনোরঞ্জনের গৃহের দ্বারে লাগিল। তিনি এখন স্বতন্ত্র বাড়ীতেই বাস করেন। শ্বশুর কয়েক বৎসর হইল মারা গিয়াছেন, তাঁহার নিজেরও প্র্যাক্‌টিস কিছু বাড়িয়াছে। বাড়ীখানি বিশেষ বড় নয়, তবে ব্যবস্থা ভাল এবং হালফ্যাশানের

দুই ভাই নামিয়া পড়িলেন। সদর দরজা খোলাই ছিল। একজন ভৃত্য বাহির হইয়া আসিয়া জিনিষপত্র নামাইতে প্রবৃত্ত হইল।

বড়বৌএর সঙ্গে ইন্দু নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। নিরঞ্জনকে দেখিয়াই সে মুখে কাপড় চাপা দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বড়বৌ বলিলেন, "আহা, কি কর ঠাকুরঝি। এখন কেঁদে আর লাভ কি? এতটা পথ আস্‌ছে, এখন একটু সুস্থির হতে দাও। চল ঠাকুরপো উপরে।"

ইন্দু দাদাকে একটা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেই লাগিল। নিরঞ্জন তাহাকে সুদ্ধ ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ ঘরে কেহই কথাবার্ত্তা বলিল না। বড়বৌ অবশেষে বলিলেন, "মায়াকে নিয়ে আসি, ঠাকুরপো? বেচারী মা যাবার পর বড় কাতর হয়ে পড়েছে। এক মা ছাড়া কাউকে ত এতদিন জানেনি?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "নিয়ে এস।"

বড়বৌ বাহির হইয়া গেলেন। কয়েক মিনিট পরে মায়াকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মায়া, এই যে তোমার বাবা।"

মায়াকে দেখিয়া নিরঞ্জনের বুকের ভিতরটা ব্যথায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। কি অপার দুঃখের ছায়া তাহার সজল চোখদুটির মধ্যে, মুখের কি অসহায় ভাব! মেয়ে দেখিতে মায়ের মত সুন্দরীই হইয়াছে, বর্ণে, গঠনে, মুখশ্রীতে এ সেই কিশোরী সাবিত্রীকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু বড় যেন অনাদরে লালিত। লক্ষপতি পিতার একমাত্র সন্তান, তাহার এ দশা কেন? পরণে মোটা শাড়ী, ছেঁড়া সেমিজ, রুক্ষচুলের রাশ মুখের চারি ধারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মাতৃবিয়োগের তিন দিন পরে কেহ অবশ্য সাজিয়া গুজিয়া থাকে না, কিন্তু ইহাকে দেখিলে মনে হয় এই ভাবেই যেন সর্ব্বদা থাকে। হাতে দুগাছি অতি সরু রুলী ভিন্ন কোনো গহনাই তাহার নাই।

মায়া সাহেবী পোষাক পরা বাপের দিকে তাকাইয়া দেখিল। পিতার যে মূর্ত্তির ক্ষীণ স্মৃতি তাহার মনে ছিল, তাহার সঙ্গে একটু যেন সাদৃশ্য আছে। একটু আশ্বাস অনুভব করিয়া সে কম্পিত পদে নিরঞ্জনের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

নিরঞ্জন বালিকাকে নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। স্নেহের-স্পর্শে মায়ার চোখের জল আবার ফাটিয়া পড়িল। মা হারানোর দুঃখ যেন পিতাকে পাইয়া তাহার আরো বেশী

করিয়া মনে পড়িয়া গেল। ইন্দু খানিক পরে তাহাকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল, বলিল, "একটু শান্ত হও মায়া। আর কেঁদে কি হবে? তোমার মা স্বর্গে গেছে, তার জন্যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "থাক, থাক, নিয়ে যাবার দরকার নাই। কেঁদে মনটা একটু হাল্‌কা হতে দাও।"

মিনিট কয়েক পরে মায়া নিজে হইতেই উঠিয়া পাশের চেয়ারে বসিল। বড়বৌ তখন দেবরের স্নানাহারের জোগাড়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইন্দু মায়াকে স্নান করাইবার জন্য লইয়া গেল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আবার সকলে বসিবার ঘরে আসিয়া জুটিল। বড়বৌ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরপো কি খুব শীগ্‌গিরই ফিরে যাবে নাকি?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "হঁ্যা, এখন আর থাকবার দরকারও কিছু নেই। তোমাদের সঙ্গে দেখাও এখানেই হয়ে গেল, নইলে একবার দেশে যেতাম। যত দেরি করব, তত ওদিকে আমার কাজের ক্ষতি। তিন চারদিন পরেই ফিরব মনে করছি।"

মনোরঞ্জন বলিলেন, "দেশের বাড়ীঘরের, জমিজমার কি ব্যবস্থা হবে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রে দিও। আমি আর কি বলব? বাড়ীটা বন্ধ থাকলে ত নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু থাকবার লোকও ত দেখছি না।"

চিত্তরঞ্জন বলিল, "পাড়াগাঁয়ে ভাড়াটে পাওয়া যায় না। তবে একঘর লোক থাকতে চাইছে, দিদির কাছে শুনছিলাম। তাদেরই দিয়ে দাও না?"

ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ, ঐ যে ঘোষাল-কাকার বোন নিস্তারিণী পিসী, বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী এসে পড়েছে। ঘোষাল-কাকা বৈ তাঁরও আর আপনার জন কেউ বড় নেই। তাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভাইয়ের কাছেই থাক্‌তে চান। কিন্তু ওদের বাড়ীতে ত তিল ফেলবার জায়গা নেই, তার উপর ঘোষাল কাকীর সঙ্গেও পিসীর বিশেষ বনে না। তাই বল্‌ছিলেন, বাড়ীটা যদি তাঁকে দেওয়া হয়, তাহলে বড় ভাল হয়। ভাড়া অবশ্য কিছু দিতে পারবেন না, তবে ঘরদোর খুব যত্নে থাকবে, গরু-বাছুরগুলোও দেখবেন তিনিই। বাড়ীঘর যখন যা মেরামত করা দরকার তিনি করাবেন। আমি ত বলি ভালই হয় দিলে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তাই দিয়ে দাও। পাড়াগাঁয়ে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি হবে?"

বড়বৌ বলিলেন, "মায়া ত তোমার সঙ্গেই যাবে এবার?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "হ্যাঁ, কিছুদিনের জন্যে ইন্দুকেও নিয়ে যাব ভাবছি।"

ইন্দু বলিল, "আমাকে আর কেন মেজদা? এতদিন ত তোমার সংসার আগ্‌লালাম, এখন আমায় ছুটি দাও। আমার আর মন টেঁকে না ঘরে, একটু তীর্থ করতে বেরোব মনে করছি।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তীর্থ ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না? গেলেই হবে এখন কিছুদিন পরে। এখন আপাততঃ আমার সঙ্গে চল্, তা না হলে এটুকু মেয়ে একলা অচেনার মধ্যে থাকতে পারবে কি ক'রে?"

মায়া ব্যগ্রভাবে পিসীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, সে কি বলে শুনিবার জন্য। ইন্দু যখন বলিল, "আচ্ছা, তা না-হয় মাস কয়েক থেকেই আসি," তখন যেন সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বড় বৌ বলিলেন, "তা দুতিন দিন পরে যদি যাও, তাহলে এখন থেকে জোগাড় করতে হয়। মেয়ে এতদিন পাড়াগাঁয়ে ছিল, কাপড়-চোপড় তেমন কিছুই নেই। সব ত করাতে হবে? ষ্টীমারে যাবে, জুতো মোজাও নেই, কিছুই নেই। খান-কয়েক ভাল শাড়ী মেজবৌএর বাক্সে আছে, কিন্তু সেমিজ পেটিকোট ব্লাউস্ সব করাতে হবে। জুতো মোজা ত এখন পরবে না, রেঙ্গুনে গিয়েই কিনো এখন। ষ্টীমারে খালি পায়ে খুবই অসুবিধা হবে, তা আর কি করা? ট্রাঙ্ক একটা কিনতে হবে। বিছানা ভালই আছে। শুধু একটা ভাল শতরঞ্চি কি হোল্ডঅল কিনে নিলেই হবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "সব আজই অর্ডার দিয়ে দাও। কিনবার জিনিষ যা কিছু তা আমি বিকেলে বেরিয়ে কিনে নিয়ে আস্‌ব। ইন্দুরও বোধ হয় কাপড়-চোপড় দরকার হবে কিছু। অন্ততঃ গরম জামা টামা কয়েকটা ষ্টীমারের জন্যে ত লাগবেই।"

ইন্দু বলিল, "আমার ও-সবে দরকার নেই বাপু, পরা অভ্যাসও নেই। র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে কাটিয়ে দেব এখন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "ও সব রাখ এখন। বৌদি, আপনার দরজী থাকে ত ডেকে পাঠান।"

বড় বৌ কন্যা জয়ন্তীর সন্ধানে চলিলেন। দরজী ডাকান, কাপড়-চোপড়ের প্যাটার্ন ঠিক করা, অর্ডার দেওয়া, প্রভৃতি বিষয়ে সেই তাঁহার সহায়। জয়ন্তী স্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে, সে নিতান্ত একটা কেও কেটা নয়। মায়ার চেয়ে সে বছর দুইয়ের বড়।

জয়ন্তী আসিয়া বলিল, "দরজীকে আর ডাকতে হবে না, আজই সে আমার ব্লাউস নিয়ে আসবে। লোকটার খুব কথার ঠিক, যা বলে তা করে। তবে দুদিনে অত জিনিষ ক'রে উঠতে পারবে কি না জানি না। কিছু কিছু রেডিমেড কিনে নিলে হয় না?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তোমার দরজী না পারলে তাই নিতে হবে বৈকি?"

মায়া বসিয়া চুপ করিয়া শুনিতেছিল। এবার সে একেবারে অচেনার উদ্দেশে চলিল! দেশ নূতন, জীবনের ধারা নূতন, পরিবার পরিজন সবই নূতন। পিসীমাও ত তাহাকে রাখিয়া চলিয়া আসিবে। তখন কেমন করিয়া, কি ভাবে তাহার দিন কাটিবে কে জানে? নিজের বিগত জীবনের জন্য মমতায় তাহার বুক টন্ টন্ করিতে লাগিল। সে-জীবনকে ত জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করিয়া চলিল। কালে হয়ত অবজ্ঞাভরে তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিবে। তাহার মা মরিবার সময় তাহাকে কত কি যে বলিয়া গিয়াছিল! সব কথা কি তাহার মনে আছে? সে কি সে-সব রক্ষা করিতে পারিবে? বাবা যদি বিরক্ত হন? যদি বারণ করেন? তাহার সাধ্য হইবে না, বাবার কথার উপর একটি কথা বলিবার। পিসীমা যদি বরাবর থাকিত, তাহা হইলেও বা ভরসা ছিল। সে মায়ের মত অত গোঁড়া না হইলেও, হিন্দুরই মেয়ে ত? কিন্তু বাবার সঙ্গে একলাই সে থাকিবে, তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই হয়ত তাহাকে করিতে হইবে।

এমন সময়ে পিসীমার একটা কথায় তাহার চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল। ইন্দু বলিতেছিল, "একেবারে শ্রাদ্ধশান্তি ক'রে গেলে ভাল হত, ওখানে বিদেশে বিভূঁয়ে কি সুবিধা হবে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা কিছু অসুবিধা নেই। ওখানেও দুর্গাবাড়ী আছে, পুরুত আছে, সবই আছে। হাজার হাজার বাঙ্গালীর বাস ওখানে, সব কিছুরই ব্যবস্থা করা যাবে। গিয়েও পৌছবে সময়মত, কিন্তু শুক্রবারে ষ্টীমারটা ঠিক ধরা চাই। তা না হলে দেরি হয়ে যাবে।"

ইন্দু বলিল, "তুমি টিকিট কেন না, আমাদের জন্যে দেরি হবে না।"

নিরঞ্জন অবিলম্বে ষ্টীমার অফিসে একখানি কেবিনের জন্য চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

ইন্দু খানিক পরে বলিল, "আর এক কথা, মেজদা। আমাকেও নিয়ে যেতে চাচ্ছ, কিন্তু হিন্দুঘরের বিধবার অনেক ঝঞ্ঝাট জান ত?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কোন্ ঝঞ্ঝাটের কথা বলছিস্? রান্নাবান্নার?"

ইন্দু বলিল, "রান্নাবান্না ত নিজেই করব, কিন্তু জলটল আনবার লোক ত চাই? তোমার চাকর বাকর কি সব?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "বাঙ্গালী চাকর একটা ঠিক ক'রে রাখতে না-হয় এখনই টেলিগ্রাম করছি। এখন যারা আছে সব মান্দ্রাজী, নয় মুসলমান।"

বড় বৌ বলিলেন, "বিদেশে সবই চলে। আমাদের ইনি যে কিছুই মানেন না, তবু চাকর বাকর রাখার বেলা ভাল জাতের দে'খেই ত রাখতে হয়। আত্মীয়-স্বজনের মুস্কিল না-হলে।"

১৩

সকাল হইতে বাড়ীতে জিনিষ গোছান, বিছানা বাঁধার ধুম লাগিয়া গিয়াছে। আজ নিরঞ্জনের বর্ম্মা যাত্রার দিন। তাঁহার নিজের জিনিষপত্র বেশী নয়। কিন্তু মায়া এবং ইন্দুর জিনিষেই ঘর ভরিয়া উঠিবার জোগাড় করিয়াছিল। টাকার টানাটানি ছিল না, সুতরাং বড়বৌ এবং তাঁহার মেয়ে সখ মিটাইয়া মায়ার জন্য পোষাক পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়াছেন। ইন্দুর পোষাকের উৎপাত বেশী ছিল না, কিন্তু খুঁটিনাটি জুটিয়া গিয়াছিল ঢের। বিদেশে বিভূঁয়ে কি পাওয়া যাইবে, কি না পাওয়া যাইবে, তাহার ঠিকানা নাই। অতএব সে নিজের যাহা কিছু প্রয়োজন ঘটা সম্ভব, সমস্তই লইয়া চলিয়াছিল। পিতলের ঘড়ায় দু ঘড়া গঙ্গাজল চলিয়াছে। ষ্টীমারের জল সে খাইবে না, এবং ওখানে পূজা-পালিতেও ব্যবহার করিবে। কলিকাতায় নিউ মার্কেট ঘুরিয়া যত রকম ফল পাওয়া গিয়াছে, সবই কিছু কিছু কিনিয়া আনা হইয়াছে। দুইটি বেশ বড় বড় বেতের ঝুড়ি বোঝাই হইয়া উঠিয়াছে, এবং চটের থলিতে এক থলি কচি ডাব এবং ঝুনা নারিকেল বাঁধা হইয়াছে। নিরঞ্জন জাহাজের খাবারই খাইবেন। তাঁহার জন্য খাবার গোছাইবার ভাবনা নাই। মায়া কি খাইবে, তাহা লইয়াই গোলমাল বাধিয়াছে। নিরঞ্জনের ইচ্ছা নয় যে তিন-চারি দিন সে একরকম উপবাস করিয়া কাটায়। সঙ্গে চাল, ডাল, তরিতরকারী, ঘি,

প্রভৃতি লইয়া গেলে, জাহাজে রান্না করাইয়া লওয়া যায়। হিন্দু পাচক আছে। কিন্তু মায়া একেবারে বাঁকিয়া বসিয়াছে। মায়ের শ্রাদ্ধ হইয়া যাওয়ার আগে সে যার তার হাতে খাইতে চায় না। জাহাজে আচার বাঁচাইয়া চলিবার কোনোই সম্ভাবনা নাই, সব ছোঁয়াছুঁয়ি হইয়া একাকার হইবে। ইহার পর পিতার মতে চলিতেই হইবে তাহাকে, কিন্তু মায়ের শ্রাদ্ধটা অন্ততঃ হইয়া যাক। না হইলে স্বর্গে গিয়াও সাবিত্রী শান্তি পাইবেন না। মায়াকে এখনই জেদ করিয়া নিজের মতের বিরুদ্ধে চালাইতে নিরঞ্জনের ইচ্ছা হইল না। ইহার পর অনেক বিষয়েই সম্ভবতঃ জোর করিতে হইবে, এ ক'টা দিন থাক না হয়। বেতের একটি টিফিন বাস্কেটে চাল, ডাল, তরকারী, প্রভৃতি কিছু কিছু গুছাইয়া দিতে তিনি বড়বৌকে বলিয়া রাখিলেন; মায়ার যদি ইচ্ছা না হয় সে খাইবে না।

রেঙ্গুনযাত্রী জাহাজগুলির এক-একটি কেবিনে তিনজন করিয়া যাত্রীর স্থান। নিরঞ্জন নিজের জন্য অন্য কেবিনে স্থান জোগাড় করিয়াছিলেন। কারণ তিনি সঙ্গে থাকিলে মায়া এবং ইন্দুর খুবই অসুবিধা হইবে, কিন্তু লজ্জায় তাহারা কিছুই বলিতে পারিবে না। তিনি জুতা পরিয়া বেড়াইবেন, অখাদ্য খাইবেন, ছত্রিশ জাতের সঙ্গে মেলামেশা করিবেন। তিনটি টিকিট কিনিয়া তিনি একটি কেবিন কন্যা ও ভগিনীর জন্য রিজার্ভ করিয়া লইলেন। কারণ মুসলমানী বা খৃষ্টানী সহযাত্রিণী জুটিলে ত আর রক্ষা থাকিবে না।

বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় আরো এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল। মায়া চুল আঁচড়াইবে না, জুতা মোজা কিছুই পরিবে না। রুক্ষ চুল, শুষ্ক মুখ, মলিন বেশে তাহাকে ঠিক পাগলের মতন দেখাইতেছিল। এই অবস্থায় কি করিয়া তাহাকে লইয়া যাওয়া যায়?

ইন্দুকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওকে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে দে। এই রকম ক'রে কি মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায়?"

ইন্দু বিব্রত হইয়া বলিল, "কিছুতেই কথা শুন্‌ছে না. মেজদা। যা বলি তাতেই কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তবে আর কি করা যাবে। ওকে বেশী কাঁদাতে চাই না। একটু বুঝিয়ে বল না? জুতো মোজা নাই পরল, নিতান্ত যখন অমত; কিন্তু চুলগুলো আঁচড়াক, আর পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরুক।"

ইন্দু অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেল। মায়া তখন খাওয়া-দাওয়া সারিয়া, বাকি

জিনিষপত্র নূতন কেনা স্যুটকেসে ভরিতেছিল। ইন্দু বলিল, "মেজদা যে বিরক্ত হচ্ছে রে। বলে, এরকম পাগ্‌লী সেজে গেলে চলবে না।"

জয়ন্তী মায়ার কাছে বসিয়া ছিল। সেও বলিয়া উঠিল, "আমিও ত তাই বলছিলাম পিসীমা। স্টীমারে সব যা সেজেগুজে ওঠে, যদি দেখ। সেদিন বেলীর মামীরা সব রেঙ্গুনে গেল, আমরা গিয়েছিলাম তাদের তুলে দিতে। এক-একজন যা সেজেছে, যেন নূতন কনে! কেউ পরেছে বেণারসী, কেউ ক্রেপের শাড়ী কেউ বা বালুচরী।"

মায়া বলিল, "আমার কি আর এখন সাজবার সময়?"

জয়ন্তী কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না, তা বল্‌ছি না। সাজবে আর কি ক'রে, তবে একটু পরিষ্কার হওয়া ত দরকার? এস তোমার চুলটা বেঁধে দি। শাদা কাপড়ই পর, একটু গুছিয়ে গাছিয়ে। নইলে জাহাজে উঠবার সময় সবাই হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবে।"

মায়া চুপ করিয়া রহিল। নিরঞ্জন বাহির হইতে একবার তাড়া দিয়া গেলেন। "আর বেশী সময় নেই, শীগ্‌গির তৈরি হয়ে নাও।"

জয়ন্তী তাড়াতাড়ি মায়ার চুলটা এলো খোঁপা করিয়া বাঁধিয়া দিল। ইন্দু যে রকম গরদের চাদর গায়ে দিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, মায়াও সেইরূপ চাদর মুড়ি দিয়া বসিল, কেবল মাথাটা তাহার খোলা রহিল।

তাহার পর বিদায়ের পালা। সকলকে প্রণাম করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে মায়া নীচে মোটরে গিয়া বসিল। ইন্দু সকলের কাছে বিদায় লইয়া জিনিষ-পত্রের তত্ত্বাবধান করিতে করিতে নামিতে লাগিল। বড়বৌ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে আসিতে বলিলেন, "এবার তোমরা যাচ্ছ, আমরাও গিয়ে একবার বেড়িয়ে আসব। ঠাকুরপো যেতে বলেছেন অনেকবার, এতদিন আর হয়ে ওঠেনি। ওঁর ছুটি নেই, এ নেই, ও নেই। এখন আর ওঁর ভরসায় থাকব না, কাউকে নিয়ে গিয়ে উঠতে পারলেই হল।"

ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ ভাই, যেও একবার। না হলে একলা একলা দিন কাটান দায় হবে।"

মায়াকে জয়ন্তী বলিল, "আমার তোমার উপর ভয়ানক হিংসা হচ্ছে ভাই। কত নূতন জায়গা দেখবে, নূতন মানুষ, সবই নূতন। আমি ত জন্মে অবধি কলকাতায়, মরবও বোধ হয় এখানেই। এর বাইরে আর আমায় যেতে হবে না।"

মায়ার চোখ মুখ তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, "আমি না যেতে পারলে বেঁচে যেতাম। আমার নূতন দেশ দেখতে একটুও ইচ্ছে করছে না।"

জয়ন্তী বলিল, "এখন বল্‌ছ বটে, একথা। পরে হয়ত ও দেশ ছেড়ে আর আসতেই চাইবে না।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই উট্রাম ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেখানে সর্ব্বদাই দারুণ ভীড়। ভারতবর্ষের সকল জাতির লোকই মোটঘাট বাঁধিয়া চলিয়াছে। ইউরোপীয় এবং ফিরিঙ্গীরও অভাব নাই। মায়া আরো বিচলিত হইয়া উঠিল। সবলে ইন্দুর হাত চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমা, এইসব মুসলমান, সাহেব মেম, এদেরই সঙ্গে আমাদের যেতে হবে নাকি? মাগো, কি ক'রে পারব?"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "না রে পাগলি, ওদের সঙ্গে যাব কেন? আমাদের জন্যে আলাদা ঘর নেওয়া হয়েছে না?"

ডেকের যাত্রীরা তখনও কাঠগড়ায় বন্দী অবস্থায় ঠেলাঠেলি করিতেছে। ডাক্তার তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া, যাইবার অনুমতি দিলে পর তাহারা জাহাজে উঠিতে পাইবে। সম্প্রতি প্রত্যেকেই পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া রেলিং-এর সামনের স্থানটি দখল করিবার জন্য যুঝিতেছে। খোলা পাইলেই দৌড়িয়া ডেকে উঠিয়া ভাল জায়গা দখল করিয়া বসিতে পাইবে।

একজন ফিরিঙ্গী মেম অগ্রসর হইয়া নিরঞ্জনকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিল, "এই মহিলারা কি রেঙ্গুন যাইতেছেন?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "হাঁ।" মেম প্রথমে ইন্দুর হাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিল। এক সেকেণ্ডও লাগিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "তবিয়ৎ আচ্ছা হ্যায়?"

ইন্দু হাসিয়া ইসারায় জানাইল, তাহার তবিয়ৎ আচ্ছাই বটে। হিন্দী বুঝিতে পারিলেও, বলিতে তাহার বাধ বাধ লাগিল।

মেম মায়ার হাত ধরিতে যাইবামাত্র সে একেবারে আঁৎকাইয়া উঠিল। বলিল, "ও পিসীমা, ছুঁয়ে দিচ্ছে যে? আবার ত নাইতে হবে। জাহাজে ভাল জল কোথা পাব?"

নিরঞ্জন একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "জাহাজে গঙ্গার জল যত চাও, তত পাবে, ভাবনা নেই। ছোটখাট জিনিষ নিয়ে অত গোলমাল ক'রো না।"

মায়া ভয়ে চুপ করিয়া গেল। লেডী ডাক্তার তখন অন্য যাত্রিণীদের পরীক্ষা করিতে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে জাহাজে উঠিবার ঘণ্টা পড়িয়া গেল। হুড়াহুড়ি গোলমালের মধ্যে নিরঞ্জন কোনো প্রকারে ভগিনী এবং কন্যাকে লইয়া উপরে উঠিয়া গেলেন, এবং বয়দের সাহায্যে কেবিন খুঁজিয়া লইয়া তাহাদের বসাইয়া আসিলেন। তাহার পর একটু নিশ্চিন্ত হইয়া জিনিষ-পত্রের তত্ত্বাবধান, নিজের জায়গার সন্ধান, প্রভৃতি করিতে গেলেন।

মায়া কেবিনে ঢুকিয়াই বলিল, "ও পিসীমা, কতটুকু ঘর, মা গো! এর ভিতর তিন দিন থাকতে হবে? কই, স্নানটান করবার ত কোনো জায়গা নেই?"

জাহাজের কাণ্ডকারখানা ইন্দুরও জানা ছিল না। সে বলিল, "দাঁড়া, মেজদা আসুক, সব জেনে নেব। আমার জিনিষপত্রগুলো এখনও ত দিয়ে গেল না। ঘড়ার জলটলগুলো না ফে'লে দিলে বাঁচি।"

জিনিষপত্র শীঘ্রই নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিল। নিরঞ্জন বলিলেন, "সব দে'খে শুনে নে রে। সব ঠিক আছে ত? জাহাজ ছাড়তে আর বেশী দেরি নেই।"

ইন্দু এবং মায়া সব জিনিষপত্র মিলাইয়া লইল। তখন নিরঞ্জন বলিলেন, "দাদা, জয়ন্তী ওরা সব এখনো দাঁড়িয়ে আছেন। ডেকে গিয়ে একবার দেখবি নাকি?"

মায়ার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ইন্দু রাজী হওয়াতে সেও অগত্যা সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ডেকের উপর তখন বিষম ভীড়। সকলেই দাঁড়াইয়া নিজের নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে বিদায় লইতেছে। কত ভাষায় কত কথা যে শুনা যাইতেছে তাহার ঠিকানাই নাই।

মনোরঞ্জন তখনও ছেলেমেয়েদের লইয়া ঘাটের উপর-তলায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। কথা বলিবার চেষ্টা করা বৃথা, কিছুই প্রায় শোনা যায় না। তবু ভগিনীর দিকে তাকাইয়া, হাসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জাহাজ ছাড়িতে আর বেশী দেরি ছিল না। ডাঙার লোক সব হুড়াহুড়ি করিয়া নামিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। কুলিরা মজুরী এবং বখশিষ পাইবার জন্য চেঁচামেচি জুড়িয়া দিল। ডেকযাত্রীরা ডাঙার লোকের সহিত কথাবার্ত্তা চুকাইয়া, বিছানা মাদুর পাতিয়া নিজের নিজের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া গুছাইয়া বসিতে আরম্ভ করিল।

আর দেরি নাই, খালাসীরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া সিঁড়ি তুলিয়া ফেলিতে লাগিল। মনোরঞ্জন হাসিয়া ছেলেমেয়েদের লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যাইবার আগে জয়ন্তী খুব ঘটা করিয়া রুমাল উড়াইয়া গেল, যদিও জাহাজ হইতে উত্তরে রুমাল উড়াইবার মত কেহ ছিল না।

নিরঞ্জন বলিলেন, "চল এখন ভিতরে। নিজেদের সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে নিতে হবে ত? কি কি দরকার বল।"

ইন্দু বলিল, "চল, কিন্তু ঘরটায় যা গরম! এখানে বেশ হাওয়া। ঐ ত দেখ কত মেয়েমানুষ যাচ্ছে, বাঙালীও রয়েছে। এরা বেশ যাবে।"

তাহার মেজদা হাসিয়া বলিলেন, "কেবিনে ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান্ আছে, খুলে দিলেই বেশ হাওয়া পাবে। এখানে এত লোকের মাঝে দিনরাত তোমরা থাকতে পারবে না।"

কেবিনের ভিতর ঢুকিয়াই মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, স্নানের ঘর কোথায়?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "চল, দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু দিনে পঁচিশবার স্নান ক'রে যেন অসুখ বাধিয়ে ব'সো না।"

স্নানের ঘরে গিয়াও মায়ার বিস্ময়ের অন্ত থাকিল না। এ কি রকম ব্যাপার? কোথায় কি করিতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাবা তাহাকে রাখিয়া ত দিব্য চলিয়া গেলেন। এখন তাহার ফিরিয়া যাইতেও যে ভয় করিতেছে? বাহির হইয়া সে যদি হারাইয়া যায়? তাহার প্রায় চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম হইল।

সৌভাগ্যক্রমে তখনই আর একটি যাত্রিণী আসিয়া জুটিলেন। বাঙালী বটে, তবে মায়া যে-শ্রেণীর বাঙালী মেয়ে দেখিতে অভ্যস্ত, ঠিক সে রকম নয়। রেশমের মোজা, সোনালী রং-এর জুতা পরা, তাহার গোড়ালিগুলা অসম্ভব উঁচু। পরণে সোনালী রং-এর শাড়ী জামা, নাকে সোনার চশমা, গলায় একটা মুক্তার মালা।

মায়া তাঁহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া, তিনি বলিলেন, "কি খুকি, এখানে এমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

বাংলা ভাষা শুনিয়া মায়ার একটু সাহস হইল। সে বলিল, "কি ক'রে কল খুলব?"

মহিলাটি একটু হাসিয়া, ভিতরে ঢুকিয়া কল খোলা, টব ভর্ত্তি করা, টবের জল ছাড়িয়া দেওয়া, প্রভৃতি সব তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন।

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিও রেঙ্গুনে যাচ্ছেন?"

ভদ্রমহিলা বলিলেন, "হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে যে ভদ্রলোক যাচ্ছেন, তাঁকে আমরা চিনি। উনি তোমার কে হন?"

মায়া বলিল, "আমার বাবা।"

তাহার সঙ্গিনী একটু যেন বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই প্রথম তোমরা যাচ্ছ নাকি? তোমার মা কোথায়?"

মায়ার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, "আমার মা আজ ক'দিন হল মারা গিয়েছেন। তাই বাবা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছেন।"

এমন সময়ে মায়ার সন্ধানে ইন্দুও আসিয়া উপস্থিত হইল। দেরি দেখিয়া নিরঞ্জন তাহাকেও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে আসিয়া কিঞ্চিৎ অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, কাঁদছিস্ কেন?"

মায়া উত্তর দিবার আগেই সেই ভদ্রমহিলা বলিলেন, "আমি ওকে মায়ের কথা জিজ্ঞেস করায় কাঁদছে। নিরঞ্জন বাবুকে আমরা চিনি। কিন্তু এ দুর্ঘটনার কথা ত শুনিনি?"

ইন্দু বলিল, "কোথা থেকে আর শুন্‌বেন বলুন? এই ক'দিন হল সবে। তা মেজদা ত চোখের দেখাও দেখলেন না। মারা যাবার পর এসে পৌঁছেছেন।"

দুজনে শীঘ্রই আলাপ জমিয়া গেল। মায়া ইত্যবসরে কোনোমতে স্নান সারিয়া লইল।

বাহিরে যাইবার সময় ভদ্রমহিলা বলিলেন, "আমি এই যে সামনের ঐ কেবিনে। ভালই হল আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে। আপনার দাদা আমাদের বেশ চেনেন। মধ্যে মধ্যে আসবেন। আমিও যাব। এবারে বাঙালী আর কেউ নেই বিশেষ। ডেকে দেখছিলাম বটে দুটি মেয়ে যাচ্ছে।"

তিনি নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। মায়া এবং ইন্দুও অনেক কষ্টে নিজেদের কুঠরী খুঁজিয়া বাহির করিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

মায়া তোয়ালে দিয়া চুল মুছিতে মুছিতে বলিল, "পিসীমা, ঐ গিন্নীটি কথাবার্ত্তা ত ঠিক আমাদের মতই বলেন।"

ইন্দু বলিল, "ওমা, তা কি ইংরাজী বলবে, না ফরাসী ? বাঙালীর মেয়ে বাংলাই ত বলবে।"

মায়া ব'লিল, "পোষাক-টোষাক কেমন এক রকম যেন। কই, জ্যাঠাইমাও ত কলকাতায় থাকে, এরকম ক'রে কাপড় পরে না ত ?"

ইন্দু বলিল, "তুই জ্যাঠাইমাকেই বুঝি মস্ত বড় মেম ঠাউরেছিস্ ? তাকে মেম হতে দিলে কে রে ? তার আষ্টেপিষ্টে ত গোঁড়া হিন্দু আত্মীয়স্বজন। দেখিস্ এখন জয়ন্তীরা কেমন হয়। মেয়েটিকে মন্দ লাগল না। মেজদা এলে জিজ্ঞেস করতাম কে।"

মায়া হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া ব'লিল, "মাগো! সামনের ঘরেই কত মুসলমান দেখেছ! যদি এ ঘরে ঢুকে আসে! তুমি বাবাকে বল পিসীমা, আমাদের সঙ্গে এসে থাকতে।"

ইন্দুরও একটু ভয় হইয়াছিল, কিন্তু ভাইঝিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল, "যা যা! তোর যত অনাছিষ্টি ভয়! কেন, আমাদের ঘরে ঢুকবে কেন? ওদের বুঝি প্রাণের ভয় নেই ? আচ্ছা, মেজদা আসুক, আমি বলব এখন।" "তবু সাবধানের বিনাশ নাই" ভাবিয়া, দরজাটা সে ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

১৪

প্রথম দিন ষ্টীমারে খাওয়া-দাওয়া লইয়া বিশেষ কিছু গোলমাল হইল না। ফল-মিষ্টি খাইয়া ইন্দু রহিল, সঙ্গে সঙ্গে মায়াও তাহাই করিল। বিকালের দিকে নিরঞ্জন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে ইন্দু, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না ত ?"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "আর কোনো অসুবিধা নেই মেজদা, কেবল এই খুপরীর মধ্যে ব'সে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। সামনের ঘরেই একগাদা মুসলমান, তাদের ভয়ে দরজাও খুলতে পারছি না।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে দরজা খোল্, কোন ভাবনা নেই। ষ্টীমারে কেউ কিছু করতে কখনও ভরসা করে না। তা চল্ না, একটু উপরের ডেকে বেড়াবি, সারাদিন কোনে ব'সে থাকার কি দরকার ?"

ইন্দুর বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু মায়া প্রস্তাব শুনিয়াই আঁৎকাইয়া

উঠিল। বলিল, "না পিসীমা, কাজ নেই গিয়ে, বা লোকের ভিড়! সব হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "চেয়ে থাকলেই বা ক্ষতি কি? তা না যেতে চাও যেয়ো না। আমার চেনা এক ভদ্রলোক যাচ্ছেন সপরিবারে, তাঁদের কেবিনে যাবে?"

ইন্দু বলিল, "ওমা, তাঁরই গিন্নিকে তাহলে স্নানের ঘরে দেখলাম। বেশ ফরসা রং, চোখে চশমা, খুব মেমসাহেবী সাজ। তোমাকে চেনেন ব'লেও বললেন। কি নাম ভদ্রলোকের?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "নগেনবাবুর স্ত্রীই হবেন। জাহাজে বাঙালী মেয়ে আর কেউ নেই। চল্, যাবি ত নিয়ে যাচ্ছি।"

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "ঘর এমনি খোলা থাকবে নাকি? এত জিনিষ-পত্র রয়েছে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তালা দিয়ে যাওয়া যাক। এখানে চোরের অভাব নেই। আমার কাছে তালা আছে, নিয়ে আসছি।"

কেবিনে তালা বন্ধ করিয়া তাঁহারা বাহির হইয়া পড়িলেন। নগেন-বাবুদের কেবিন কিছু দূরে, খুঁজিয়া বাহির করিতে হইল। ভদ্রলোক কেবিনেই ছিলেন, নিরঞ্জনের ডাকে বাহির হইয়া আসিলেন। "ওরা ভিতরেই আছেন সব। চলুন, আমরা ডেকে বেড়াই" বলিয়া তিনি নিরঞ্জনকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

নগেনবাবুর স্ত্রী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মায়াকে এবং ইন্দুকে অভ্যর্থনা করিলেন। এখন আর তাঁহার অত সাজসজ্জা নাই। চুল খোলা, পরণে শান্তিপুরে শাড়ী, পায়ে মখমলের চটি।

মায়া এবং ইন্দু একটু সঙ্কুচিত ভাবেই আসিয়াছিল, কিন্তু ভদ্রমহিলার সাদর সম্ভাষণে একটু যেন নিশ্চিন্ত হইয়া ভিতরে ঢুকিল। একটি বছর দশ বারোর ছেলে এবং একটি পনেরো ষোল বছরের মেয়ে অভ্যাগতাদের দেখিয়া ঝোলান খাট ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বালক বলিল, "মা, আমি চল্লাম বাবার কাছে।" মায়ের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সে হুড়মুড় করিয়া বাহির হইয়া গেল।

নগেনবাবুর স্ত্রী একটু হাসিয়া বলিলেন, "মণ্টু আমার ঐ রকম। এমনিতে ত মুখে খৈ কোটে, দুষ্টুমীর অন্ত নেই। কিন্তু বাইরের লোক যদি দেখলে

তা হলেই হয়েছে। একেবারে দেশ-ছাড়া হয়ে যাবে। ওরে বাণী, একটা মাহুর-টাহুর পেতে দে না, এঁরা বসবেন।"

বাণী তাড়াতাড়ি একটা জাপানী ছবি আঁকা মাদুর আনিয়া কেবিনের মেঝেতে কোনোমতে জায়গা করিয়া পাতিয়া দিল। তাঁহাদের সবে বোধ হয় চা খাওয়া শেষ হইয়াছে, পেয়ালা, পিরীচ, প্লেট, সব চারদিকে ছড়ানো। মায়া ত ছোঁয়াছুঁয়ি হইবার ভয়ে একেবারে কোণ ঘেঁষিয়া যথাসম্ভব নিজেকে বাঁচাইয়া বসিল। গৃহিণী ব্যাপারটা বুঝিয়া কন্যাকে বলিলেন, "পেয়ালা-টেয়ালাগুলো একটু এক জায়গায় ক'রে রাখ, বয়টা এসে নিয়ে যাবে।"

বাণী সব কিছু এক ঠেলায় খাটের নীচে চালান করিয়া দিল এবং বোধ হয় অভ্যাগতাদের খাতিরেই তাহার পর হাতটা ধুইয়া ফেলিল।

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার এই দুটিই বুঝি? আর হয়নি?"

গৃহিণী বলিলেন, "আর একটা ছেলে আছে, সে ঘরে কিছুতেই থাকতে চায় না, চাকরের সঙ্গে ওপরে বেড়াচ্ছে। রাত্রে কেবল ভিতরে এসে শোয়, সারাদিন ডেকেই থাকে।"

ইন্দু বাণীর দিকে তাকাইয়া বলিল, "মেয়ের বুঝি এখনও বিয়ে হয়নি?"

বাণী অকস্মাৎ ভয়ানক গম্ভীরভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার মা বলিলেন, "না, কই আর হয়েছে। ওঁর মেয়েদের ছোটবেলায় বিয়ে দেওয়ার মত নয়। এখনও পড়ছে, গান-টান শিখছে।"

ইন্দু বলিল, "ওমা, তাহলে আমার মেজদারই দলের লোক। এই নিয়ে তাঁতে আর বৌতে ত চিরদিন লাঠালাঠি হল। এখন অবিশ্যি তাঁর মতই চলবে। বৌ ত মেয়ের বিয়ের সব জোগাড় করেছিল, এমন সময় তার ডাক পড়ল।"

মৃতা জননীর প্রসঙ্গে মায়ার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। নগেনবাবুর স্ত্রী কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন, "কি রে বাণী, মুখ হাঁড়ি ক'রে ব'সে রইলি কেন? মায়ার সঙ্গে একটু গল্প-স্বল্প কর্ না? এখন ত একদেশেই থাকবি। যদিও আপনাদের বাড়ি অনেকটাই দূরে, তাহ'লেও মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ ত হবেই।"

বাণী একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "এমনই বা কি দূর? কোকাইনে ত এখন ইচ্ছে করলে আধ ঘণ্টায়ই পৌঁছান যায়। বাবা যে সারাদি

গাড়ী নিয়ে খালি কাজে ঘোরেন, তা না হ'লে আমরা কত জায়গায় যেতে পারি।"

বাণীর মা হাসিয়া বলিলেন, "তোর বাবার না-হয় একখানা মাত্র গাড়ী। মায়ার বাবা ত শুনছি মেয়ের জন্যে আগে থেকেই আলাদা গাড়ী কিনে রেখেছেন, তার বেড়াবার কিছু অসুবিধা হবে না। তখন মনে ক'রে আমাদের বাড়ী মাঝে মাঝে এস মা লক্ষ্মী।"

মায়া চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল। বাণীর সঙ্গে গল্প করিতে তাহার ইচ্ছা করিতেছিল বটে, কিন্তু কি কথা যে সে বলিবে তাহা ভাবিয়াই পাইল না। ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা এর মধ্যে মেয়ের জন্যে গাড়ীও কিনে রেখেছেন নাকি? মেয়ে যে আসবে তার ত কিছু ঠিক ছিল না? হঠাৎ বৌ মারা যাওয়াতেই না নিয়ে আসতে হল?"

নগেনবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "মনে মনে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে বোধ হয় অনেক দিন থেকে। আমরা ত কবে থেকে শুনছি বাড়ী সাজাচ্ছেন, গাড়ী কিনছেন। মেয়েকে পড়াবার মাষ্টার সুদ্ধ ঠিক ক'রে রেখেছেন।"

মায়ার দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তাহার বাবা তাহা হইলে সর্ব্বদাই তাহার কথা মনে করিতেন? সে দেশে বসিয়া মনে করিত, তিনি তাহাকে ভুলিয়াই গিয়াছেন বুঝি।

বাণী এতক্ষণে মায়ার সঙ্গে কথা আরম্ভ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সহরে কখনও থাকনি বুঝি?"

মায়া বলিল, "দু-একবার কলকাতায় এসেছি। কিন্তু কলকাতা আমার ভাল লাগে না, সারাদিনই ঘরে বন্ধ থাকতে হয়। আর এত গোলমাল, কানে তালা লেগে যায়।"

বাণী বলিল, "তাহলে তোমার কোকাইনে ভালই লাগবে। লোকও নেই, জনও নেই; ধূ ধূ করছে মাঠ, আর লেক্। আমার কিন্তু ও-সব জায়গায় মোটেই ভাল লাগে না বেশীক্ষণ। এই পিক্‌নিক্ করতে গেলাম, খানিক সবাই মিলে হৈ চৈ ক'রে বাড়ী চ'লে এলাম, এই রকম হলে ভাল লাগে।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বাড়ী বুঝি একেবারে সহরের মধ্যে?"

বাণী বলিল, "আরে বাপ রে! সহরের মধ্যে ব'লে মধ্যে! একেবারে যত থিয়েটার আর বায়োস্কোপের আড্ডায়, দুপুর থেকে রাত সাড়ে এগারোটা অবধি ব্যাণ্ডের শব্দ সমানে চলে। আমার কিন্তু কিছু খারাপ লাগে না, দিব্যি

সয়ে গেছে। চুপচাপের মধ্যেই বরং টিকৃতে পারি না, সময় আর কাটতেই চায় না। মায়ের অসুখের জন্যে একবার কিছুদিন ইনসিনে গিয়েছিলাম, আমার ত প্রাণ বেরোবার জোগাড়। আচ্ছা, তুমি কখনও বায়োস্কোপ দেখেছ?'

মায়া বলিল, "কলকাতায় গিয়েছিলাম একদিন।"

বাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ছবি ছিল সেদিন?"

মায়া বলিল, "তা ত জানি না। সব ইংরাজীতে লেখা, বুঝতেও পারলাম না কিছু।"

বাণী জিজ্ঞাসা করিল, "ইংরাজী তুমি একেবারেই পড়নি বুঝি?'

মায়া একটু লজ্জিতভাবে বলিল, "না, কার কাছে পড়ব? মা বাংলা আর সংস্কৃত জানতেন, তাই তাঁর কাছে কিছু কিছু পড়েছিলাম।"

বাণী বলিল, "তা তোমার বাবা এইবার তোমাকে নিশ্চয় সব শেখাবেন। তাঁর ত খুব সাহেবী পছন্দ ব'লে শুনি। আমার বাবাও আধাআধি সাহেব, তবে মায়ের জন্যে বেশী কিছু ক'রে উঠতে পারেন না।

মায়ার ইচ্ছা হইল বলে, যে, তোমার মাও দিব্য মেমসাহেব দেখা যাইতেছে, কিন্তু সেটা হয়ত ভদ্রতা-সঙ্গত হইবে না, মনে করিয়া চুপ করিয়া গেল।

ইন্দুতে এবং বাণীর মা-তেও বেশ গল্প জমিয়' উঠিয়াছিল। মেয়েদের গল্প করিবার বিষয়ের কখনও অভাব হয় না, আচার-ব্যবহার শিক্ষা-দীক্ষার যতই প্রভেদ থাকুক না কেন

ইন্দু বলিতেছিল, "ভালই হল জাহাজে আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে। একেবারে অচেনা জায়গায় যাচ্ছি, তবু দু-চারটে মানুষের সঙ্গে চেনাশোনা থাকলে, একটু যাওয়া-আসা হবে, দুটো কথা ব'লে বাঁচব।"

বাণীর মা বলিলেন, "নিশ্চয় যাব. আপনিও আসবেন। আমিও যখন প্রথম আসি, তখন পাঁচ-ছয় মাস কেঁদেই মরতাম। একটা মানুষ নেই যে কথা বলি, বাড়ীতে শুধু আমি আর এক মাদ্রাজী আয়া। না তার কথা আমি বুঝি, না সে আমার কথা বোঝে। ভয়েই কাঁটা হয়ে থাকতাম। উনি সেই দশটায় বেরোতেন, আর রাত সাড়ে ন'টায় ফিরতেন। ভাবতাম, মাদ্রাজী বুড়ী যদি আমার গলা টিপে মেরে সর্ব্বস্ব নিয়ে পালায়, ত না বলবার কেউ নেই। ক্রমে সয়ে গেল। মেয়েটাও হল, তখন আর খালি খালি লাগত না।"

ইন্দু বলিল, "কতদিন আছেন ও দেশে ?"

বাণীর মা বলিলেন, "তা ষোল বৎসর নিশ্চয় হবে। এখন ওই দেশই নিজের দেশের মত হয়ে গেছে। দেশে গেলেই বরং অসুবিধা ঠেকে। ও দেশে নিজেই গিন্নী গোড়া থেকে, শাশুড়ী ননদ নিয়ে কখনও ঘর করতে হয় নি। চালচলন্ সব স্বাধীন হয়ে গেছে, দেশে ঠিক মানিয়ে চলতে পারি না, পদে পদে নিন্দে হয়।"

ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ, মেয়েমানুষের আপদ্ ত লেগেই আছে। প্রাণপাত ক'রে খাটলেও নিন্দের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। নিজেরাই আমরা নিজেদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ঘরের বৌকে কষ্ট ত আর শ্বশুর-ভাসুরে দিতে আসে না, শাশুড়ী ননদেই দেয়।"

বাণীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ছেলেপিলে ক'টি ?"

ইন্দু হাত উল্টাইয়া বলিল, "ও সব ভগবান্ দেননি, ভালই করেছেন। দেখছেন ত কপাল, এমনি একলা আছি, তাই ভাইদের ঘাড়ে চ'ড়ে খাচ্ছি। ছেলেপিলে থাকলে আবার তাদের খোরাকী জোটাতাম কোথা থেকে ?"

নগেনবাবুর স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "ওমা, ভাগ্নে ভাগ্নীকে কি আর আপনার ভাইরা ফে'লে দিত ? আর তাঁদের অভাব কিসের ? তাঁদের টাকায় বলে বাইরের দুশো লোক খাচ্ছে।"

ইন্দু বলিল, "যাক গে ভাই, নেই যখন তার জন্যে ভাবনাও নেই। ভাই-দেরই ছেলেপুলে মানুষ ক'রে আমার দিন কেটে যাবে। এই দেখ না, বৌ ম'রে একটা ত আমার ঘাড়ে দিয়ে গেল। ভাবছিলাম, একটু তীর্থ ঘুরে আসব, না ভাইঝি আগলাতে চললাম বর্ম্মায়। এখন কতদিনে ছাড়া পাব কে জানে ?"

বাণীর মা বলিলেন, "ভাইঝির বর জুটবার আগে কি আর ছাড়া পাবেন, তা ত মনে হয় না। আর আপনার ভাইয়ের যে রকম সাহেবী পছন্দ, মেয়েকে ভাল ক'রে শিখিয়ে পড়িয়ে তবে ত বিয়ে দেবেন ? কাজেই এখন বছর-কতকের মত নিশ্চিন্ত।"

এমন সময় নগেনবাবু এবং নিরঞ্জন বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন। নিরঞ্জন বাহির হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ইন্দু, এখন চল্। আবার কাল আসিস্ এখন।"

ইন্দু এবং মায়া বাহির হইয়া আসিল। নিজেদের কেবিনে আসিয়া ইন্দু বলিল, "কিরে মায়া, এ বেলাও খাবি না কিছু?"

নিরঞ্জন বললেন, "না খেয়ে তিনদিন কাটাতে পারবে না। একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।"

মায়া বলিল, "আজ ফল-মিষ্টি খেয়ে বেশ থাকতে পারব কাল যদি থাকতে না পারি ত অন্য কিছু খাব।"

ইন্দু বলিল, "একটা তোলা উনুন পেলে ঘরেই ওকে চাল-ডাল দুটো ফুটিয়ে দিতাম, কোনো আপদ্ থাকৃত না।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "ষ্টোভ জোগাড় করতে পারি, কিন্তু কেবিনের মধ্যে ত জালাতে পারবি না, ডেকে গিয়ে জালাতে হবে। সেখানে তোর গিয়ে রান্না-বান্না করা পোষাবে না। দেখি, রাঁধবার লোক যদি জোগাড় করতে পারি।"

মায়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "আমি যার তার রান্না কিন্তু খাব না।" নিরঞ্জন মেয়ের কথা বোধ হয় শুনিতে পান নাই, তিনি কেবিন হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ইন্দু শাসনের স্বরে বলিল, "সব কিছু নিয়ে প্যান্ প্যান্ করিস্ নে। মেজদা শেষে চ'টে যাবে। এখন বাপে যেমন চালাবে, তেমনি চল্‌তে হবে।"

রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভয়ে তাহারা শুইতে পারিল না। দরজায় খিল বন্ধ করিয়াও তাহাদের তৃপ্তি হইল না, বড় ট্রাঙ্ক বিছানা সব-কিছু টানিয়া আনিয়া দরজার কাছে জড় করিল। তাহার পর অনেকক্ষণ জাগিয়া পিসী ভাইঝিতে কথা বলিল। অবশেষে জাহাজের শব্দে এবং দোলানিতে কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

ইন্দুর খুব ভোরেই উঠা অভ্যাস। সে যখন জাগিল তখন যাত্রীদের ভিতরে আর কেহই উঠে নাই বোধহয়। মায়াকে তুলিয়া বলিল, "কারো ত সাড়াশব্দ পাই না রে, দরজা খুলব, না এখন থাকবে? লোকজনের ভিড় সুরু হবার আগে স্নানটানগুলো সেরে আসতে পারলে হত।"

মায়া বলিল, "বাক্সগুলো তো সরানো যাক, তারপর উঁকি মেরে দেখব। যদি দু'একটা লোকও উঠে থাকে, তাহলে চট্ ক'রে গিয়ে নেয়ে আসব।"

দুইজনে টানাটানি করিয়া দরজার সামনের বাক্স প্রভৃতি সরাইয়া ফেলিল। তারপর দরজা খুলিয়া একবার উঁকি মারিল। জনমানবের চিহ্ন নাই।

ইন্দু বলিল, "কাজ নেই বাপু বেরিয়ে। শেষে কি হতে কি হবে। মেজদাদা আগে আসুক।"

সৌভাগ্যক্রমে নিরঞ্জন খুব বেশী দেরী করিলেন না। সেদিনকার মত ইন্দু এবং মায়া বেশ নির্ব্বিবাদেই স্নান সারিতে লাগিল।

নিরঞ্জন অনেক চেষ্টা করিয়াও পত্নী সাবিত্রীকে নিজের মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। বাপ-মায়ের ঘরে সে যে-শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছিল, সে-শিক্ষা কোনোক্রমেই তাহাকে ভুলান গেল না। দেখিয়া শুনিয়া নিরঞ্জনের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, বাল্যকালেরই শিক্ষা আসল শিক্ষা। কন্যা জন্মগ্রহণ করার পরেই তিনি তাহাকে নিজের আদর্শানুযায়ী গড়িয়া তুলিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু এবারেও ভাগ্য বিরূপ হওয়ায় এতদিন পর্য্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এখন মায়াকে লইয়া যাইতেছেন বটে, কিন্তু তাহার রকম সকম দেখিয়া তাঁহার মনে একটা সংশয় ক্রমেই বেশী করিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল, সাবিত্রীরই মেয়ে ত? ইহাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালানো যাইবে কিনা সন্দেহ। তবে ভালবাসায় অসাধ্য সাধনও হয়। মেয়ের ভালবাসা লাভ করিতে যদি পারেন, তাহা হইলে তাহাকে বাগ মানান কঠিন হইবে না। সাবিত্রীর নিকট তাঁহার পরাজয়ের কারণই এখানে। স্বামীকে সে ভালবাসিতে পারে নাই। তাই স্বামীকে সুখী করিবার জন্য কোনো ত্যাগ স্বীকার তাহার পক্ষে সহজ হয় নাই।

নিরঞ্জন স্টীমারেই নিজের প্ল্যান ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মায়াকে হঠাৎ একেবারে বদলাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলে কোনোই লাভ হইবে না। এখন তাহার মন মাতৃবিয়োগের দুঃখে অভিভূত, মাতার স্মৃতি সে স্বভাবতঃই বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবে। অল্পে অল্পে তাহাকে নিজের মতে আনিতে হইবে। বাধ্যতাটা মায়ার খুব ভালই অভ্যাস হওয়ার কথা। পিতার বাধ্য তাহার হওয়া উচিত, ইহা কোনো প্রকারে বুঝিয়া লইলে তাহাকে চালান শক্ত হইবে না।

দ্বিতীয় দিনও জাহাজের খাবার খাইতে মায়ার প্রবল আপত্তি দেখা গেল। ইন্দু বলিল, "তবে কি শুকিয়ে মরবি? তোর আমার সঙ্গে পাল্লা দেবার এত সখ কেন রে? আমার মত পোড়া কপাল যেন শত্রুরও না হয়। চিরদিন মাছ-ভাত খেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে তোরা থাকবি, তোদের এ সব করার কি দরকার?"

মায়া নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "তাই ব'লে যার তার হাতে আমি খেতে পারব না। ভাণ্ডারী যে হিন্দু বলছে, তাও তো মুরগীও রাঁধে দেখি, সব ছোঁয়াছুঁয়ি ক'রে দেবে ত ?"

নিরঞ্জন দাঁড়াইয়া ভগিনী এবং কন্যার তর্কাতর্কি শুনিতেছিলেন, মায়া ভাণ্ডারীর হাতে খাইতে কিছুতেই যখন রাজী হইল না, তখন তিনি অন্য উপায় কিছু করিতে পারেন কিনা দেখিতে বাহির হইয়া গেলেন।

সৌভাগ্যক্রমে উপায় একটা শীঘ্রই হইয়া গেল। নগেনবাবুর সঙ্গে তাঁহাদের পুরাতন দারোয়ান রামনরেশ চলিয়াছিল। সে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। ষ্টীমারে সেও ফল খাইয়াই থাকে, রান্না করা জিনিষ খায় না। মাছমাংস জীবনে স্পর্শও করে নাই। বখশিসের লোভ এবং প্রভুর অনুরোধে সে একবার করিয়া মায়ার জন্য খিচুড়ী ও ভাজা প্রস্তুত করিয়া দিতে রাজী হইল।

নিরঞ্জন কেবিনে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "চাল, ডাল, ঘি আর তরকারিগুলো বার ক'রে দে ইন্দু। নগেনবাবুর বুড়ো দারোয়ান রেঁধে দেবে। সে তোদের চেয়েও ঢের ভাল হিন্দু। মাছমাংস তাদের চোদ্দপুরুষে কেউ কোনোদিন ছোঁয়নি। তুইও ত খেতে পারিস্ তার হাতে ?"

ইন্দু ভাঁড়ার বাহির করিতে করিতে হাসিয়া বলিল, "আমার আর কাজ নেই দাদা। এ জন্মটা এমনি কেটে যাবে। আমার কষ্টও কিছু হয় না। ব্রতেট্রতে কতবার লম্বা লম্বা উপোস করেছি, তাতেও কোনো কষ্ট হয়নি।"

নিরঞ্জন চলিয়া গেলেন। মায়া বলিল, "সময় আর কাটতে চায় না পিসীমা। এই এক খাঁচার মধ্যে ব'সে ব'সে প্রাণও হাঁপিয়ে উঠেছে। ক্রমাগত ঘণ্টা গুনছি কতক্ষণে নামব ডাঙ্গায়। মাগো মা, ডেকের লোকগুলো কি ক'রে যে থাচ্ছে জানি না।"

ইন্দু বলিল, "থাক, আর একটা দিন ত ? কেটেই যাবে। বাণীদের ওখানে যাবি ? গিন্নীটি লোক মন্দ নয়, যতই মেমসাহেবী সাজ করুক।"

মায়া বলিল, "মেয়েটা বোধ হয় একটু দেমাকে। আমি ইংরাজী জানি না, তাদের মত ঘাঘরা, জুতা মোজা পরি না ব'লে আমাকে সে একটা কি-না-কি মনে করে। বাবা, রেঙ্গুনে সব মানুষ যদি অমনি হয়, তাহলেই গিয়েছি।"

ইন্দু বলিল, "তা বেশীর ভাগই ঐ রকম হবে বৈকি। আমাদের

পাড়াগাঁয়ের মত ধরণধারণ তুই সহরে কোথায় পাবি? তাও আবার এই সাগর-পারের সহরে। এখানে কে কার ধার ধারে? ক্রমে তোরও সয়ে যাবে।"

এমন সময় দরজার গায়ে বাহির হইতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কে টোকা মারিল। মায়া বলিল, "কে আবার এল? দরজা খুলব?"

ইন্দু বলিল, "তুই বড় ভীতু! দিন দুপুরে কি চোর আসবে, না ডাকাত?" সে নিজেই উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া নগেনবাবুর স্ত্রী এবং বাণী। ইন্দু বলিল, "আসুন, আসুন, অনেকদিন বাঁচবেন, এখনি আপনাদের কথাই হচ্ছিল।"

নগেনবাবুর স্ত্রী ঢুকিয়া বলিলেন, "তাই নাকি? খুব গাল দিচ্ছিলেন বুঝি? সাহেবীয়ানা করি, বয়দের হাতে খাই ব'লে?"

ইন্দু বলিল, "ওমা কোথায় যাব! গাল দিতে গেলাম কেন? যে দেশের যেমন। আর সধবামানুষের কি আর অত বাছ-বিচার করলে চলে? স্বামী যেদিকে চালাবে সেই দিকেই চলবে। এই নিয়ে বৌকে আমি কত বকতাম। তা সে কি আর কারো কথা শোনবার মেয়ে ছিল? স্বামীর কথাই উড়িয়ে দিত, তা আমরা। বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

মা মেয়ে বসিলেন। বাণী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, একবারও যে তুমি ডেকে যাও না? ভাল লাগে না?"

মায়া বলিল, "লোকের ভিড় বড্ড বেশী, আর এত হাওয়া, আমার ভয়ই করে।"

বাণী বলিল, "হাওয়াই তো ভাল, কেবিনের মধ্যে ব'সে ব'সে ত মাথা ধ'রে ওঠে।"

মায়া বলিল, "কেবিনেও ভাল লাগে না। এর চেয়ে ট্রেণে যাওয়া ঢের ভাল। কতবার দাঁড়ায়, কত লোক ওঠে নামে, এক রকম ক'রে সময় কেটে যায়। এ তিনদিন ধ'রে চলেছে তো চলেইছে। জল ছাড়া কিছু দেখাও যায় না।"

বাণী বলিল, "ট্রেণের যেমন সুবিধে তেমনি অসুবিধেও আছে। কেবিনে তবু নিজের মত ব্যবস্থা ক'রে থাকা যায়। যত ছোট জায়গাই হোক, বাইরের লোক এসে ঘাড়ে পড়ে না। ট্রেণে তো রাত্রেও আরাম ক'রে শোবার জো নেই, কখন কোন্ ফিরিঙ্গী এসে গুঁতো মারবে, তার ভয়ে জড়সড় হয়ে থাক। জিনিষপত্রও চুরি যাবার ভয়।"

তাহার মা বলিলেন, "আর জাহাজে বুঝি সবাই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির? সেবার আমার স্যুটকেস-সুদ্ধ চুরি হয়ে গেল না?"

বাণী বলিল, "সে যদি তুমি এখন ঘরদোর খুলে দিয়ে বেড়াতে চ'লে যাও, ত লোকে চুরি করবে না?"

ইন্দু বলিল, "আমার ট্রেণ বা ষ্টীমার কিছুই ভাল লাগে না বাপু। ঘরের মানুষ কতক্ষণে ঘরে ফিরব তাই কেবল ভাবি।"

বাণীর মা বলিলেন, "কাল বিকেল নাগাদ পৌছে যাব যেমন ক'রে হয়। গিয়ে ঘর-দোরের কি ছিরি দেখব, তাই কেবল ভাবছি। আপনাদের সে-সব ভাবনা নেই, বেশ পাতানো ঘরকন্নার মধ্যেই গিয়ে পড়বেন।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "পুরুষমানুষ, তার আবার ঘরকন্না। চাকরবাকরও ত শুনছি সব মান্দ্রাজী, আর মুসলমান। বাঙালী চাকর একটা ঠিক ক'রে রাখতে মেজদা তার ক'চ্ছিল তা পেয়েছে না কি কে জানে। আমাদের ত দেখছেন, একেবারে অজ পাড়াগেঁয়ে, নিজেদের ব্যবস্থা সব নিজেরাই করতে হবে।"

নগেনবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব! চাকর যথেষ্টই পাবেন, তবে কোনো কাজের হবে কি না জানি না। চাটগাঁ আর নোয়াখালীর লোকই বেশী, তাদের কথা বুঝতেই প্রাণ বেরোবে। তার ওপর চোর যা! দু-টাকার বাজার করতে দেন ত একটাকা বারআনা পারলে চুরি ক'রে রাখবে। বাবুগিরি যা এক-একজনের! কে বাবু, কে চাকর, কিছু বোঝবার জো নেই। মাইনে এক-একটির কুড়ি টাকা পঁচিশ টাকা ক'রে।"

ইন্দু গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, চাকরের মাইনে কুড়ি-পঁচিশ টাকা ক'রে! কলকাতায় এল-এ, বি-এ পাশ করা মানুষেই পঁচিশ টাকার কাজের জন্যে হাঁ ক'রে থাকে।"

গল্পস্বল্প করিয়া ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। তারপর নগেনবাবুর পুত্র মণ্টু আসিয়া খবর দিল ভাণ্ডারী রান্না করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সুতরাং বাণী এবং তাহার মা নিজেদের কেবিনে ফিরিয়া গেলেন।

মায়ার খাবারও আসিয়া পৌছিল। রামনরেশের রান্না খাইয়া তাহার জাত বাঁচিল বটে, তবে জিহ্বা একান্তই অতৃপ্ত থাকিয়া গেল। বাসন-কোশন মায়া নিজেই কোনো মতে ধুইয়া রাখিল, কারণ ব্রাহ্মণ মানুষ উচ্ছিষ্ট কিছুতেই

স্পর্শ করিবে না। কেবিনে যেটুকু জল ছিল তাহা বাসন ধুইতেই খরচ হইয়া গেল।

হঠাৎ বাহিরে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল। ইন্দু গলাটা একটুখানি দরজার বাহিরে বাড়াইয়া বলিল, "ওমা, বাণীর মায়ের গলা না? এ রকম ক'রে কাকে বকছে?"

পর মুহূর্ত্তেই একটা ছোকরা মেয়েদের স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। বাণীর মাও বকিতে বকিতে বাহির হইয়া আসিলেন। "অভি ক্যাপ্টেন কো পাস্ বোলে গা, তুম লোককো কুছ আক্কেল নহি, জেনানা গোসলখানামে ক্যা ওয়াস্তে গিয়া?"

একজন বিপুলাকার মাড়োয়ারী সামনের একটা কেবিন হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাণীর মাকে সে কি যেন বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভদ্রমহিলা তখন এতই উত্তেজিত, যে, তাহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, বকিয়াই চলিলেন। ব্যাপার কতদূর গড়াইত বলা যায় না, তবে নগেনবাবু আসিয়া পড়াতে সহজেই চুকিয়া গেল।

"বাবু, ও ছোক্‌রা পড়নে নহি জান্‌তা, আউর কভি নহি যায়েগা", বলিয়া মাড়োয়ারী তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিল। গৃহিণী বকিতে বকিতে নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

ইন্দু বলিল, "নগেনবাবু না থাকলে গিয়ে শুনে আসতাম কি হল। বাবা, এ সহজ স্থান নয় দেখছি। মানে মানে নেমে যেতে পারলে বাঁচি।"

মায়া বলিল, "একলা আর ওদিকে যেয়ো না পিসীমা, এ লোকগুলো ভয়ানক দুষ্টু।"

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া নগেনবাবু সর্ব্বদাই নিরঞ্জনের কেবিনে আড্ডা দিতে প্রস্থান করিতেন। গৃহিণীকে ঠাণ্ডা করিয়া আবার যে তিনি বাহির হইয়া যাইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। সুতরাং অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, ইন্দু আর মায়া কেবিনে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। কয়েকবার যাওয়া-আসার ফলে তাহারা এখন পথ চিনিয়া ফেলিয়াছিল।

দরজায় টোকা দিতেই বাণী দরজা খুলিয়া দিল। নগেনবাবুর স্ত্রী এখন দিব্য নিশ্চিন্তভাবে একখানা বাংলা মাসিকপত্র পড়িতেছিলেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বের রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির চিহ্নও আর তাঁহার মধ্যে ছিল না।

ইন্দু ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল দিদি? ও ছোঁড়াটা কি করেছিল?"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "করবার ওর বাপের সাধ্যি আছে? স্নানের ঘরে গিয়েছি, দেখি হতভাগা দিব্যি মেয়েদের স্নানের ঘরে ঢুকে মুখ ধুচ্ছে। গালাগালি দিতেই ছুটে পালালো।"

মায়া বাণীকে বলিল, "তোমার মায়ের ত খুব সাহস ভাই। আমি হ'লে ত ভয়েই ম'রে যেতাম।"

বাণীর মা বলিলেন, "তোমাদের ত ভয় লাগবেই মা, ছেলেমানুষ তোমরা। আমাদের তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমাদের কি এখন অত ভয় করলে চলে?"

ইন্দু বলিল, "শুধু বয়সেই কি আর সাহস হয়? আমারও ত বয়স কম হয় নি, কিন্তু দশ হাতের মধ্যে অচেনা লোক দেখলে এখনও মুখ শুকিয়ে যায়।"

বাণীর মা বলিলেন, "ওটা কি জানেন ভাই, দায়ে পড়লে সাহস করতেই হয়। আপনারা চিরকাল আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে থেকেছেন, ভয় পাবার কোনো কারণই আপনাদের ঘটে নি। আমাদের অল্প বয়সেই বিদেশে আসতে হয়েছিল, আগলাবার কেউই ছিল না। আর রেঙ্গুনের যা সব বাড়ী! এক এক বাড়ীতে ছত্রিশ জাতের আড্ডা, কাঠের তক্তা দিয়ে শুধু তফাৎ করা। তার ভিতর চোর, জোচ্চোর, গাঁটকাটা, ডাকাত সবই থাকতে পারে। সারাদিন ত পুরুষমানুষেরা বাইরেই ঘোরে টাকার খোঁজে, নিজেদের সাহসের ওপর নির্ভর ক'রে মেয়েদের একলাই থাকতে হয়। কতবার বর্ম্মা ফিরিঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে, কর্ত্তা বাড়ী নেই, নিজেই গলা জাহির করে জিত্‌তে হয়েছে। দেশের মত ঘোমটায় ঢাকা কনে বৌ হয়ে থাকলে কি এসব জায়গায় চলে? কথায় বলে মগের মুল্লুক। এখানে চাকরে সুদ্ধ কথায় কথায় মনিবের গলায় ছুরি দেয়।"

ইন্দু বলিল, "তবেই হয়েছে। খুব ত আপনি ব'লে দিলেন। আমি ত ভয়েই ম'রে থাক্‌ব দেখছি। দেশ ছেড়ে এমন জায়গায় সব মরতে আসে কেন?"

নগেনবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আপনার আবার ভাবনা। মস্ত বাড়ীতে গুণ্ডা চাকর নিয়ে থাকবেন।"

ইন্দু বলিল, "চাকরগুলাও ত ভাল নয় বল্‌ছেন।"

বাণীর মা বলিলেন, "সবাই কি আর একরকম? ওর মধ্যে ভালও আছে। আপনার দাদার ওখানে দারোয়ান, মালী—এগুলো অনেক দিনের পুরণো, তাদের উপর বেশ বিশ্বাস করা যায়।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "বিশ্বাস না ক'রে যখন উপায় নেই, তখন বিশ্বাস করতেই হবে।"

১৫

নিরঞ্জন কন্যা ও ভগিনীকে লইয়া রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিবার পর দশ বারো দিন কাটিয়া গিয়াছে।

তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাজ জমিয়া উঠিয়াছিল বিস্তর। সে-সকলের ব্যবস্থা করিতে নিরঞ্জন এমনি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এ পর্য্যন্ত মায়া এবং ইন্দু বেশী কোথাও যাইতে পায় নাই। তবে বাড়ীর চারিধারেই বেড়াইবার জায়গা এত, যে তাহাদের নিতান্ত ঘরে বন্ধ হইয়া থাকিতে হইত না। বিকাল বেলা কখনও মোটরে, কখনও দারোয়ানের সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া তাহারা লেকের ধারে, রাস্তায় খুব বেড়াইয়া আসিত। মায়ার এ জায়গাটা ভালই লাগিতেছিল, প্রায় পাড়াগাঁয়েরই মত চারিদিক্ খোলা, লোকের ভিড় নাই, গোলমাল নাই।

কিন্তু মনে তাহার একটা অশান্তি সর্ব্বদা লাগিয়াই থাকিত। এখন ক'দিন বাবা ব্যস্ত আছেন বলিয়া মায়ার দিকে বেশী মন দিতে পারেন নাই। তাহারা আপনাদের মতেই চলিয়াছে। কেবল পোষাক-পরিচ্ছদ তাহাকে কিছু বেশী পরিয়া থাকিতে হয়। মখমলের চটিও তাহার জন্য জোড়া দুই-তিন আসিয়াছে, ঘরে পরিবার জন্য। তা সেগুলো মায়ার পায়ে বড় বেশী থাকে না। নিরঞ্জন যখন ঘরে থাকেন তখন সে কোনোমতে চটি পরিয়া থাকে, তিনি বাহির হইলেই আবার খুলিয়া ফেলে। কিন্তু এর পর কেমন চলিবে, ঠিক নাই।

বাঙালী চাকর একটা পাওয়া গিয়াছিল। তাহার কাজের মধ্যে মশলা বাটা, গোটাচারেক থালা বাটি মাজা এবং রান্নাঘরের জল লইয়া আসা। বাকি সময় সে ইন্দু এবং মায়ার কাছে তাহার নানাবিষয়ক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে

বক্তৃতা দিয়াই দিন কাটাইয়া দিত। রান্না ইন্দু নিজে করিত। নিজের তাহার একবেলা হইলেই চলিত। কিন্তু চাকরটার হাতে খাইতে মায়ার অনিচ্ছা দেখিয়া অগত্যা বিকালেও সে রান্না করিত। মেয়ে এবং বোনের জন্য সহর হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি ফল, মিষ্টান্ন নিরঞ্জন প্রায় রোজই লইয়া আসিতেন। কাজেই জলখাবার আর কিছু বানাইতে হইত না।

এখানে আসিয়া ভ্রাতার ঐশ্বর্য্যে ইন্দু খুবই খুসী হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন বলিল, "বৌ হতভাগীর অদৃষ্টে ছিল না, তা না হলে রাণীর হালে দিন কাটিয়ে যেত। তা না, কোথা এক পাড়াগাঁয়ে অ-চিকিৎসায় একলা প'ড়ে মরল! তোর কপাল ভাল, সময় মত এসে পৌঁছেছিস।"

মায়ার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কেন পিসীমা এমন ক'রে বল্‌ছ? মা নিজের ধর্ম্ম রেখে গেছেন সেই ভাল, না, টাকার লোভে যদি চ'লে আসতেন সেই ভাল হত?"

ইন্দু দেখিল, জা'ত সাপের বাচ্চা বটে। এই বয়সেই ইহার গলায় সাবিত্রীর সুর বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাকে লইয়াও মেজদাদাকে ভুগিতে না হয়। বেচারার কি চমৎকার কপাল! স্ত্রীকন্যাই মানুষের জীবনের সান্ত্বনাদায়িনী। তাহার বদলে ইহার স্ত্রীকন্যা চিরদিন বোধ হয় হাড় জ্বালাতন করিয়াই রাখিবে।

মুখে বলিল, "আহা, কি বুদ্ধি গো তোমার। স্বামীর ঘরে এসে তাঁর বুঝি ধর্ম্ম পালন করা চল্‌ত না? হিন্দুর মেয়ের স্বামী-সেবার বড় ধর্ম্ম আবার কি রে? তুইও যেন এইসব বোকামি করে মেজদাকে জ্বালাস্‌নে। বেচারা কোনোদিন ত শান্তি পায়নি। তোকে নিয়ে এসেছে অনেক আশা ক'রে; সে আশায় ছাই দিস্ না।"

মায়া চুপ করিয়া রহিল। গুছাইয়া তর্ক করিবার মত শিক্ষা তাহার হয় নাই, কিন্তু মন তাহার আপত্তিতে মুখর হইয়া উঠিল। মৃতা জননীকে স্মরণ করিয়া তাহার বুকের মধ্যে অশ্রুসাগর ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কেহই সেই হতভাগিনীকে বোঝে নাই, সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়াছে, অবিচার করিয়াছে। মায়া কখনও তাহা করিবে না। সেই সাবিত্রীর একমাত্র সন্তান, সেই মায়ের স্মৃতি রক্ষা করিবে। কখনও তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার উপদেশ ভুলিবে না। কোনো প্রলোভনে সে বিচলিত হইবে না।

এমন সময় বাহিরে নিরঞ্জনের মোটরের হর্ণ সজোরে বাজিয়া উঠিল। ইন্দু

বলিল, "ওমা, বেজয়া এর মধ্যে এসে গেল! যা, যা, চুল আচড়ে, কাপড় ছেড়ে আয়! তোকে এত ক'রে বলি যে এ রকম ভূত সেজে থাকিস্ না, তোর বাপ দেখলে রাগ করে। তা কিছুতে যদি কথা শুন্‌বি। চটি পর্ গিয়ে যা।"

মায়া তাড়াতাড়ি নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরে ছুটিয়া পলাইল। মায়া আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই দুইখানি ঘর তাহার জন্য সাজানো ছিল। একটি তাহার শয়নকক্ষ, একটি তাহার পড়িবার ঘর। শুইবার ঘরটি পালঙ্ক, কৌচ, কাপড়ের আলমারি, আয়নাওয়ালা দেরাজ, আল্‌না, প্রভৃতি দামী দামী আসবাবে সুসজ্জিত। তবে ঘরখানি মায়ার বিশেষ কাজে লাগে না, সে সারাদিন ইন্দুর সঙ্গে সঙ্গে হয় রান্না ঘরে, নয় তাহার শোবার ঘরে কাটাইয়া দেয়। তাহার কাপড়-চোপড় অবশ্য নিজের ঘরে থাকে। কাজেই চুল বাঁধিতে বা কাপড় ছাড়িতে হইলে তাহাকে এঘরে আসিতে হইত। ইহার সংলগ্ন একটি স্নানের ঘরও ছিল।

মায়া তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইয়া, আয়নার সামনে গিয়া চুলটা পরিষ্কার করিয়া আঁচড়াইয়া লইল। আল্‌নার দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহাতে ফরসা কাপড় একখানাও নাই। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় তাহার কিছু কিছু কাপড়-চোপড় তৈয়ারী হইয়াছিল, সেগুলি এখানে আসিয়া ইন্দু আলমারিতে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। প্রকাণ্ড আলমারির এক-তৃতীয়াংশও অবশ্য তাহাতে ভরে নাই। ইন্দু বলিয়াছিল, "যাক, ক্রমে দেখবি এই এক আলমারিতেও কুলোবে না। তোর বাবার ত পয়সার অভাব নেই, আর তুই তাঁর একমাত্র মেয়ে। না চাইতেই কত পাবি তার ঠিকানা নেই।"

মায়া বলিল "মাগো, এত কাপড় নিয়ে আমি করব কি? আমি ত আর কাপড়ের দোকান খুলতে যাচ্ছি না?"

ইন্দু বলিয়াছিল, আচ্ছা, সে দেখাই যাবে। আজকালকার মেয়েদের আমার জান্‌তে বাকি নেই। তুই কালে জয়ন্তীকেও ছাড়িয়ে উঠবি।"

মায়া গিয়া আল্‌মারি খুলিয়া একটা ধোওয়া শাড়ী আর ব্লাউস বাহির করিল। পাড়াগাঁয়ে এত জামাজোড়া তাহাকে কোনোদিনও পরিতে হয় নাই, এখানে সর্ব্বদাই এইসব পরিয়া থাকিতে হয়, তাহার বড় অসুবিধা লাগে। তবে একেবারেই যে ভাল না লাগে, তাহা নয়। হাজার হইলেও সে নারীজাতি এবং বয়স অল্প। সাজসজ্জার প্রলোভন খানিকটা তাহার ছিলই।

সাবিত্রীর কঠিন শাসনে এসব ভাব অবশ্য কোনোদিন প্রশ্রয় পায় নাই। মোটা কাপড়েই তাহার দিন কাটিয়াছে। এখানে এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া, তাহার আনন্দ এবং গর্ব্ব খুবই হইত. ইচ্ছা করিত নিজের পল্লীবাসিনীদের সব ডাকিয়া দেখায়। তবে সদাসর্ব্বদা ধড়া-চূড়া আঁটা আর জুতা পায়ে দেওয়ার উৎপাতে, এ আনন্দটা মাঝে মাঝে ম্লান হইয়া যাইত।

কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া, চটি পায়ে দিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল। নিরঞ্জন তখন কাপড় ছাড়িতে নিজের ঘরে চলিয়া গিয়াছেন।

নিরঞ্জনের 'ছোকরা' টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজাইতেছে, দেখিয়া মায়া ইন্দুর রান্নাঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। ইন্দু তখন বঁটি লইয়া তরকারী কুটিতে বসিয়াছে। মায়া বলিল, "তুমি যে পিঠে করেছিলে তার কিছু বাবাকে দাও না, পিসীমা। রোজ রোজ কি ঐ ছাইপাঁশগুলো খান, ঘরের তৈরী জিনিষ কোনোদিন ত খান না?"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "তবু ভাল যে বাপের কথা একটু মনে হয়েছে। ঐ যে ঐখানে ঢাকা রয়েছে। রেকাবীতে ক'রে খান-চার নিয়ে যা।"

মায়া ছোট 'মিটসেফ'টি খুলিয়া কাঁসার রেকাবীতে পিঠা বাহির করিয়া সাজাইল। তাহার পর বলিল, "মিষ্টিও ত একগাদা জ'মে গেছে, পিসীমা, এত যে কেন বাবা নিয়ে আসেন তার ঠিক নেই আমরা যেন রাক্কোস। এর থেকে কিছু দেবে? কালকের সন্দেশগুলো বেশ ভাল ছিল।"

বাপের যত্নের দিকে মায়ার মন গিয়াছে দেখিয়া ইন্দু অত্যন্ত খুসী হইল। এই বিষয়ে তাহার একটা দুশ্চিন্তা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। মায়ার যে রকম মাতৃভক্তি, সে কি কখনও বাপের দিকে ভিড়িবে? মৃতা সাবিত্রীই এখন পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া আছে যেন।

মায়ার কথার উত্তরে বলিল, "দিগে যা না, যা যা ইচ্ছে। নিজে হাতে ক'রে নিয়ে যা, খেতে বল্, তা না হলে মেজদা সব একপাশে ঠে'লে রেখে দেবে। কাছে ব'সে খাইয়ে আয়।"

মায়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "তাহলে তুমিও এস পিসীমা, একলা আমার বাবার কাছে যেতে কেমন এক রকম লাগে।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "মেয়ে যেন সং। বাপের কাছে যাবি, তার আবার কেমন একরকম কি লাগবে রে? যা, যা, নইলে ওর চা খাওয়া হয়ে যাবে। ঐ শোন্ সিঁড়ি দিয়ে নামছে। আমি এই ঝোলের তরকারিটা কুটে নিয়েই যাচ্ছি।"

অগত্যা মায়াকে একলাই যাইতে হইল। নিরঞ্জন ততক্ষণ টেবিলে বসিয়াছেন। পিছনে পায়ের শব্দ শুনিয়া তিনি চাহিয়া দেখিলেন। মায়াকে দেখিয়া বলিলেন, "কি, মায়া যে! এস, এস, বোসো ঐ চেয়ারটায়।"

মায়া আস্তে আস্তে আসিয়া মিষ্টান্নপূর্ণ রেকাবীখানা টেবিলের উপর রাখিল। নিরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন, "এত সব কার জন্যে নিয়ে এলে?"

মায়া কোনোমতে বলিল, "আপনার জন্যে নিয়ে এলাম। এগুলো পিসীমা নিজে করেছেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা হ'ল ত খেতেই হবে। কিন্তু এত মিষ্টি নিয়ে এলে কেন? নিজেরা কিছুই খাও না নাকি? সব জমা ক'রে রেখেছ আমার জন্যে "

মায়া যে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। পিসীমার কাছে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকিয়া যাইত, কিন্তু বাপের কাছে দুইটার বেশী তিনটা কথা বলিতে হইলেই তাহার হইত মহা বিপদ্। বাবা যে তাহাকে অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে মেয়ে মনে করিবেন, এ ভাবনাতেই তাহার মুখ আরো বন্ধ হইয়া যাইত। তবু উত্তর না দিলেই বা তিনি কি ভাবিবেন? সুতরাং কোনোমতে সে বলিয়া ফেলিল "আরো যে ঢের রয়েছে, আপনি অনেক বেশী নিয়ে এসেছিলেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন "তাই নাকি? আচ্ছা, কাল আর মিষ্টি আন্‌ব না তাহলে। তোমাদের কি দরকার. কিছু ত আমায় বল না, আমি আন্দাজ মত যা তা নিয়ে আসি। কাল যাবার সময়, কি কি আনতে হবে. সব আমায় ব'লে দিও।"

নিরঞ্জন নিজের খাবার ফেলিয়া মায়ার আনীত খাবারেই জলযোগ সারিয়া ফেলিলেন। এমন সময় ইন্দু তরকারি কোটার কাজ সারিয়া আসিয়া বসিল। ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে সেও ইহাদের কথা খানিক খানিক শুনিতে পাইয়াছিল। বলিল, "সত্যি, মেজদা, রোজ এত এত ফল-মিষ্টি আন কেন? নিজে ত একটুকরো কিছু মুখে দাও না, আমরা কি আর এত খেতে পারি?"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন, "তোরা ত কিছু বলিস্ না, তাই এরকম হয়। কাল থেকে ব'লে দিস্। নগেনবাবুর স্ত্রী তোদের একদিন নিয়ে যেতে বলছিলেন, তাঁর ছোট ছেলেটির অসুখ তাই আস্‌তে পারেন না। কাল যাবি ত চল্ না?"

ইন্দু বলিল, "তুমি ত সেই ন'টায় বেরিয়ে যাও, তত সকালে কি আর আমাদের হয়ে উঠবে ?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আমার সঙ্গে যাবার কি দরকার ? বেলা এগারোটা বারোটায়, নাওয়া খাওয়া সেরে যাস্। আমি ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দেব। মায়ার গাড়ী ত শুধু শুধু প'ড়ে রয়েছে, সন্ধ্যাবেলা আধঘণ্টা ঘোরা ছাড়া কোনোই কাজে লাগে না।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "কোথায় আর আমরা একলা একলা ঘুরব বল ? কাউকে ত এখানে চিনিও না। নইলে এর বাড়ী ওর বাড়ী ঘোরা যেত। সহর দে'খে বেড়াতে হলেও সঙ্গে একজন লোক চাই।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা এক কাজ কর্, নগেনবাবুর স্ত্রীকে তোদের গাইড কর্। ভদ্রমহিলার বেড়াবার সখ খুব, অথচ গাড়ী পান না ব'লে ঘুরতে পারেন না। মায়ার গাড়ী নিয়ে একদিন তোরা সারাদিন ঘুরে আয়। আমি ড্রাইভারকে রেখে যাব, সেদিনকার মত নিজেই চালিয়ে নেব। রেঙ্গুনে এলি, সব দেখা ত উচিত। বাড়ীতে ব'সে ব'সে তোদের ভালও লাগে না বোধ হয়।"

ইন্দু বলিল, "তা বেশ। নগেনবাবুর স্ত্রী যান ত ভালই, কাল তাঁর সঙ্গে গিয়ে দিন ঠিক করা যাবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "হ্যাঁ, এইবেলা বেড়িয়ে চেড়িয়ে নাও! সামনের মাস থেকে মায়ার পড়শুনা আরম্ভ করব ভাবছি, তখন রবিবার ছাড়া ত বেড়াবার সুবিধা হবে না ?"

মায়ার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এইবারই তাহার আসল পরীক্ষার সময় ঘনাইয়া আসিতেছে। বাবা নিশ্চয়ই তাহাকে বিলাতি মেয়ের মত শিক্ষা দিতেই চাহিবেন। শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী সব কেমন হইবে ঠিকানা নাই। সাবিত্রীর আত্মা পরলোকে নিশ্চয় কষ্ট পাইবে। কিন্তু বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে দাঁড়াইবে কি করিয়া ? আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় যেন মায়ার মুখ শুকাইয়া উঠিল।

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "ওকে কি স্কুলে দেবে, না বাড়ীতে পড়াবে ?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "প্রথম প্রথম বাড়ীতেই পড়াতে হবে বই কি। অনেক বড় হয়ে গেছে, অথচ বাংলা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই ত শেখেনি ? স্কুলে দিতে হলে নেহাৎ নীচের ক্লাসে দিতে হবে। একেবারে ছোট ছোট মেয়ের

সঙ্গে পড়তে ওর ভাল লাগবে না, লজ্জা করবে। তার চেয়ে কিছুদিন ঘরে প'ড়ে খানিকটা শিখে নিক, তারপর দরকার হয় ত স্কুলে দেব।"

সেদিন আর এবিষয়ে কিছু কথা হইল না। নিরঞ্জন বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন। ইন্দু গেল নিজের রান্নাবান্না সারিয়া ফেলিতে। মায়া রান্নাঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। ইহার পর জীবনের গতি তাহার যাইবে কোন্ মুখে? সে কি একেবারে অন্য মানুষ হইয়া দাঁড়াইবে? মায়ের শিক্ষা, মায়ের আদর্শ কিছুই তাহার মনে থাকিবে না?

আরও একটা কথা থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে বিদ্যুৎচমকের মত খেলিয়া যাইত। তাহার নিজের বিবাহের কথা। দেশে থাকিতে মা যে তাহার বিবাহের সব জোগাড় করিতেছিলেন, তাহা সে জানিত। এবং কাহার সঙ্গে যে সেই বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে, তাহাও জানিতে কাহারও বিশেষ বাকি ছিল না। সাবিত্রী যদিও কথা লুকাইবার খুবই চেষ্টা করিয়াছিল, তবু পীড়িত থাকার জন্য বিশেষ সক্ষম হয় নাই। প্রভাসের মাতার বার বার তাহার কাছে আসা, দুজনের গোপন পরামর্শ, ইহাতেই সকলের সন্দেহ হইয়াছিল। কাজেই সঙ্গিনীরা এই লইয়া মায়াকে মাঝে মাঝে আভাসে ইঙ্গিতে ঠাট্টা করিতেও ছাড়ে নাই।

প্রভাসের সঙ্গে বিবাহ হইলে সে কি খুসী হইত? হইতই বোধ হয়। বেশ ছেলে প্রভাস-দা। কিন্তু হিন্দুর মেয়ের এসব কথা ভাবিতে নাই বলিয়া মায়া তাড়াতাড়ি মন অন্য দিকে ফিরাইয়া লইত।

এখন সে কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িল! প্রভাসের সঙ্গে এজন্মে আর তাহার দেখাও হইবে না বোধ হয়। তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া বাবা কাহার হাতে দিবেন কে জানে? নিজের অজ্ঞাতেই যেন মায়ার বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

১৭

পরদিন নিরঞ্জন যথাসময়েই সহরে চলিয়া গেলেন, মোটর চালকটিকে রাখিয়া গেলেন ইন্দু ও মায়াকে লইয়া যাইবার জন্য। ইন্দু একবার জিজ্ঞাসা করিয়া লইল, "এ লোকটার সঙ্গে একলাই যাব? কোনো ভয় নেই ত?"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন, "কিছু না। ও অনেকদিনের পুরোনো লোক।

আর এর পর নিজেদের সামলাতে একটু একটু ক'রে শেখ্ তোরা। দেখ্ দেখি, বর্ম্মা মেয়েগুলো কেমন স্বাধীন, পুরুষ-মানুষের ধারই ধারে না। যেখানে খুসি একলা যায়, কাজকর্ম্ম, ব্যবসা, চাকুরী কিছু এদের আটকায় না। এদের পুরুষরাই বরং কত জায়গায় এদের মুখ চেয়ে থাকে।"

ইন্দু বলিল, "তা আমাদের যেমন শিখিয়েছ, তেমনি হয়েছি। বাঙালী মেয়ে এক পা এগোতে চাইলে অমনি দশ দিক্ থেকে তার পিঠে দশ-ঝাঁটা পড়ে। কাজে কাজেই এমনি স্বভাব হয়েছে। আজন্ম যার পায়ে শেকল, হঠাৎ শেকল কেটে দিলেই কি সে উড়ে যেতে পারে? উড়তে শিখতেও সময় লাগে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা ঠিক! উড়বার শিক্ষাটা এখান থেকেই সুরু ক'রে যা। এখানে জায়গাও যথেষ্ট, বাধা দেবার কেউ নেই।"

তিনি চলিয়া যাইবার পর, তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না ইন্দু শেষ করিয়া ফেলিল। মায়াকে তাড়া দিয়া শীঘ্র শীঘ্র স্নানাহার সব করাইয়া লইল। তাহার পর বলিল, "একটু ভাল ক'রে চুল বেঁধে কাপড-টাপড় পর্ দেখি! ওদের মেয়েটি কেমন ফিট্‌ফাট্ হয়ে থাকে, তুই যেন ভূত সেজে যাস্‌নে। তোর গলার সে হারটা কি হল রে?"

মায়া বলিল, "বাক্স আছে। আমি ত ওদের মত ক'রে কাপড পরতে জানি না, যদি ওরা দে'খে হাসে "

ইন্দু বলিল, "দেশে যেমন ক'রে পরতিস্, তাই পর্। তারপর ওখানে গিয়ে বাণীকে না-হয় ব'লে ঠিক করে পরিয়ে দেব।"

মায়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না পিসীমা, বাণীকে তুমি কিছু ব'লো না, ওরা তাহলে মনে মনে নিশ্চয় হাসবে। আজ আমি ওদের কাপড় পরা বেশ ভাল ক'রে দেখে আস্‌ব, এর পর নিজেই পরতে পারব।"

ইন্দু বলিল, "আচ্ছা। বেশ ভাল কাপড় একখানা পর্‌গে যা। মেজদা যে জরি-দেওয়া নাগরা জুতো এনে দিয়েছে, সেইটে পায়ে দিস্, আর একটা নেকলেস্ বার ক'রে দেব?"

মায়ার দুই চোখ জলে ভ'রিয়া উঠিল। সে বলিল, না পিসীমা, ও সব গয়না আমি পরব না।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "তবে কে পরবে? তোর জন্যেই রেখে গেছে। তোর বিয়েয় দেবে ব'লে নিজে কোনোদিন একখানা গায়ে দেয়নি।"

বিবাহের নামে মায়ার গালের কাছটা অল্প একটু লাল হইয়া উঠিল। সে আর কিছু না বলিয়া কাপড় পরিবার জন্য নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

একখানা দামী মান্দ্রাজী শাড়ী এবং সেই রংএর রেশমের ব্লাউস্ তাহার পছন্দ হইল। তাহাই যথা-সম্ভব পরিপাটি করিয়া পরিল। চুলটাকেও বাণীর মত করিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করিল, নিতান্ত মন্দ হইল না। কন্যার ব্যবহারের জন্য ক্রীম, স্নো, পাউডার, এসেন্স কিছুই কিনিয়া আনিতে মায়ার বাবা ত্রুটি করেন নাই। সেগুলা এতকাল আয়নার দেরাজের মধ্যে জমা হইয়া ছিল, আজ কিছু কিছু বাহির হইল।

সাজগোজ শেষ করিয়া পিসীর সামনে আসিতেই ইন্দু তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া বলিল, "ওমা, এ যে একেবারে চেনা যাচ্ছে না। ঠিক যেন রাজকন্যা!"

মায়া লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল "যাও পিসীমা, কি যে বল তার ঠিক নেই। তোমার হয়েছে ত চল।"

ইন্দু বলিল, "আমার হতে আর কতক্ষণ, চাদরটা নিয়ে এলেই হয়। আমি আস্‌ছি, তুই ড্রাইভারকে গাড়ী ঠিক করতে বল্।"

ড্রাইভার মুসলমান, তাহার সঙ্গে হিন্দী বা ইংরাজী না বলিলে সে বুঝে না। কোনোটাই মায়ার আসে না। কাজেই সে নিজেদের বাঙালী ভৃত্য নিকুঞ্জকে দিয়া ড্রাইভারকে গাড়ী ঠিক করিতে বলিয়া পাঠাইল। গাড়ী ঠিকই ছিল। হুকুম পাইবামাত্র চালক গাড়ী লইয়া সিঁড়ির সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিল।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই রঙের গরদের চাদর এবং মখমলার কোটা লইয়া ইন্দু আসিয়া হাজির হইল। ড্রাইভারকে স্বরচিত হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুম্ নগেনবাবুর বাড়ী জানতা, ত?"

ড্রাইভার গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল "হাঁ, জান্‌তা, আম্মা।"

মায়া অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিল, "পিসীমা, দোহাই তোমার, তুমি হিন্দী বল্‌তে যেয়ো না যা চমৎকার হয়!"

ইন্দু বলিল "হোক্ গে চমৎকার বুঝতে ত পারে, তা হলেই হল। জানি না ব'লে কি চিরকাল মুখ বুজে থাকব?"

তাহাদের গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সহরে পৌঁছিতে লাগিল প্রায় আধ ঘণ্টা। প্রকাণ্ড এক বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইতেই, ইন্দু বলিল, "ও বাবা, বাড়ী ত কম নয় দেখি! মেজদার বাড়ীর চেয়েও ত ঢের বড়।"

মায়া বলিল, "আহা পিসীমা, তুমি যেন কি! সব বাড়ীটাতেই ওরা থাকে নাকি? শুনলে না, স্টীমারে বাণীর মা বললেন, এক বাড়ীতে ছত্রিশ জাত তাঁদের থাকতে হয়? এরই মধ্যে কোনো একটা দিকে তাঁরা থাকেন।"

ইন্দু বলিল "তাও ত বটে! এখন কোথা দিয়ে ঢুকতে হবে, তাও ত বুঝতে পারছি না।"

সৌভাগ্যক্রমে নগেনবাবুর ছেলে মণ্টুকে ফুটপাথেই পাওয়া গেল; সে তাঁহাদের উপর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

ভিতরে ঢুকিবামাত্র বাণী আসিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া চলিল। তারপরে বলিল, "মা খোকার জন্যে খাবার তৈরি করছেন, তিনি এক্ষুণি এলেন বলে। আপনারা বসুন।" মায়ার সাজসজ্জার উন্নতিটা সে এক দৃষ্টিতেই দেখিয়া লইল। ফ্ল্যাটটি খুব বড় নয়, রান্নাঘর প্রভৃতি বাদ দিলে তিনটি মাত্র ঘর। সামনের ঘরটি বসিবার ঘর রূপে ব্যবহৃত হয়, আবার ছেলেরা পড়াশুনাও এখানেই করে। কোণে একটা বড় টেবিলে তাহাদের বই, খাতা, প্রভৃতি সাজানো। ভিতরের ঘরটিতেই শোওয়া, কাপড় ছাড়া, জিনিষপত্র রাখা, সব-কিছুর ব্যবস্থা। একটি ঘরে বেশ আলো আসে, আর একটি কিছু অন্ধকার। স্থানের তুলনায় আসবাবপত্র কিছু বেশী। বড় শোবার ঘরটিতে এখন রোগীর আড্ডা। গৃহিণী সেইখান হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি এক্ষুণি যাচ্ছি দিদি, আপনারা বসুন।"

ইন্দু বলিল, ভারি ত সব মেম-সাহেব আমরা, তাই বাইরের ঘরে ব'সে থাকব। আমরাও আপনার ওখানে বসি না?"

তাহারাও ভিতরে গিয়া বসিল। বাণী বলিল, চল ভাই, আমরা বাইরেই বসি, মারা এখানে গল্প করুন," বলিয় সে মায়াকে বাহিরের ঘরে আবার টানিয়া লইয়া আসিল।

একটা সোফায় দুজনে পাশাপাশি বসিল। মায়ার হাত ধরিয়া বাণী বলিল, "আজ তোমায় বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রথম প্রথম বড় সাদাসিদে হয়ে থাকতে। অবিশ্যি তখন তোমার সাজবার সময়ও ছিল না।"

মায়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। বাণী জিজ্ঞাসা করিল, "পড়াশুনা আরম্ভ করেছ নাকি?

মায়া বলিল, "না। এই ক'টা দিন গেলে, পরের মাস থেকে আরম্ভ করতে হবে, বাবা বলেছেন।"

বাণী বলিল, "স্কুলে তুমি নিশ্চয় যাবে না, নয়? বাড়ীতেই সব শিখবে। তোমার বাবার তো আর টাকার ভাবনা নেই, একটার বদলে দশটা টিচার তিনি বাড়ীতেই রাখতে পারেন। আচ্ছা, আজ যে গাড়'টাতে তোমরা এলে, ওটাই তোমার গাড়ী বুঝি? এটা ত দেখছি, বেশ নূতন 'গ্রাহাম পেজ্'। তোমার বাব' যেটা নিয়ে বেড়ান সেটা ত ওভারল্যাণ্ড হুইপেট।"

মায়া কিঞ্চিৎ অবাক্ হইয়া বলিল "তা ত জানি না ভাই, গাড়ীগুলোর আবার নাম থাকে নাকি?"

বাণী বিজ্ঞভাবে বলিল, "ওমা, তা থাকে না আবার? কত রকম রকম গাড়ী আছে। একটু লক্ষ্য করলেই, চেহারা দেখলেই কোন্‌টা কি বোঝা যায়।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবার কি গাড়ী?"

বাণী তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্টাইয়া "বলিল, কোন্ কালের পুরনো এক পচা ফোর্ড। বাবার ওসব দিকে খেয়ালই নেই, বলেন, কোনো মতে টেনে নিয়ে বেড়ালেই হ'ল নামে কি এসে যায়?"

বাণীর মা এমন সময় ইন্দুকে লইয়া ঘরে ঢুকিলেন, মেয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আহা মেয়ের যা কথা! খেয়াল থাকলেও বিনা পয়সায় ত আর 'রোল্‌স্ রয়েস্' পাওয়া যাবে না?"

ইন্দু এবং মায়া এই কথা-কাটাকাটির বিশেষ কিছু বুঝিল না। ইন্দু বলিল, "কিন্তু কবে আমাদের নিয়ে বেরোবেন, তা ত কিছু বললেন না।"

বাণীর মা বলিলেন, "এই ক'টা দিন যাক ভাই, ছোট ছেলেটা ভাল ক'রে না সারলে, তাকে রেখে যেতে পারব না। কান্নাকাটি ক'রে অনর্থ করবে।"

ইন্দু বলিল, "তা ঠিক। কিন্তু সামনের মাস থেকে আবার মায়ার পড়া আরম্ভ হবে। তখন ত অত ঘুরবার সুবিধা হবে না?"

বাণীর মা বলিলেন, "তা হোক না, ছুটির দিন ঘোরা যাবে। তাহলে বাণীও যেতে পারবে।"

ইন্দু বলিল, "সেই ভাল। ছেলেপিলে রেখে গিয়ে কোন সুখ নেই। তবে সব কথাই ঠিক রইল। আস্‌চে রবিবারের পরের রবিবারে।"

সকাল বেলা ইন্দু বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল, মায়া অভ্যাস মত কাছে বসিয়া ডালার তরকারিগুলা নাড়াচাড়া করিতেছিল এবং অনর্গল বকিয়া চলিয়াছিল

সে বলিতেছিল, "আচ্ছা, পিসীমা, সত্যি বল ত, আমাদের গাঁয়ের চেয়ে তোমার এ দেশটা ভাল লাগছে?"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "ভাল বলি ব'লেই কি আর ভাল লাগে বেশী? হাজার হোক সে নিজের দেশ, জন্মভূমি। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কত সেখানে? হয়ে অবধি সেখানে আছি। অন্যের ছেলে রাজপুত্তুরের মতন দেখতে হলেও মা নিজের খাঁদা বোঁচা ছেলেকে তার চেয়ে ভালবাসে বেশী, এও এমনি আর কি? এখানে সুখ-সুবিধে কত নূতন দেশ, নূতন মানুষ, দুদিনের জন্যে খুবই ভাল লাগে। কিন্তু চিরজন্ম এখানে থাকতে বললে কি আর তা পারি, না তাই আমার ভাল লাগে?"

মায়া মুখ ম্লান করিয়া বলিল, "কিন্তু আমাকে হয়ত তাই থাকতে হবে। মাগো, কি ক'রে যে আমি পারব?"

ইন্দু বলিল, "মেয়েমানুষে সবই পারে রে। তাদের শেকড়সুদ্ধ উপড়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে রাখবেন ব'লে ভগবান্ তাদের সেইরকম ক'রেই গড়েছেন। তোর বাবা এখানে, তোর সবই এখানে হবে। ক্রমে সবই সয়ে যাবে। আর এর পর পড়াশুনা সুরু করলে, ভাল লাগছে না মন্দ লাগছে তা ভাববার সময়ও পাবি না।"

মায়া বলিল, "ঐ ভেবে ত আমার আরো ভয় করে, পিসীমা। কাকে না কাকে মাষ্টার রাখবেন তার ঠিক নেই, সাহেব না ফিরিঙ্গী না কি। তারা যে আমায় কি অদ্ভুত জানোয়ার ভাববে তার ঠিকানা নেই, ঘেন্নায় ভয়ে অস্থির হব। কেন যে ভগবান্ সব ওলট-পালট ক'রে দিলেন, তার ঠিকানা নেই। বেশ ছিলাম।"

ইন্দু সান্ত্বনার সুরে বলিল, "যা হয়ে গেছে তা ত গেছেই, তা নিয়ে দুঃখ ক'রে আর করবি কি? আর বাপের কথাটাও ত একটু মনে ক'রে দেখতে হয়? সে বেচারা কি চিরকাল একলা একলাই কাটাবে? তুই তার

একমাত্র মেয়ে। স্ত্রী ত ঘরই করল না: তুইও যদি চিরদিন দূরে দূরেই থাকিস্ তাহলে তার মনটা কেমন হয়? মায়ের প্রতি যেমন তোর কর্তব্য, বাপের প্রতিও ত আছে? তাকে দেখবি না? এর পর বুড়ো হয়ে পড়লে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করবে কে?"

মায়া বলিল. "তাও যদি তুমি বরাবর এখানে থাকতে ত একরকম হত। তাও ত না, তুমি ত দুদিন পরে পালাবে, আমি তখন পড়ব একেবারে একলা।"

ইন্দু বলিল, "এখনি তার ভাবনা কেন? এখনও ত কিছুদিন আছিই; এর পরেও মাঝে মাঝে যাব আসব। বড়বৌরাও ত একবার আসবে ব'লে কথা দিয়েছে। তুই যখন রইলি তখন সবাই এক-আধবার ক'রে আসব। আর তোর নিজেরও সয়ে যাবে, দেখিস্ এখন। গোড়ায় নূতন জায়গায় যেমন প্রাণ ছটফট্ করে, শেষ অবধি তাই যদি করত, তাহলে কেউ কি কোথাও টিঁকতে পারত নাকি?"

মায়া বলিল, আমার কিন্তু চিরকালই দেশের বাড়ী এখানকার চেয়ে ভাল লাগবে।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, দেখাই যাবে। তুই এখন ওঠ্ ত, নাই গে যা। ব'সে ব'সে কেবল বেলা করছিস্। আমার ত এই তরকারিটা শুধু বাকি, আর সবই হয়ে গেছে।"

মায়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিয়া পড়িল এবং সিঁড়ি দিয়া যথাসম্ভব আস্তে উপরে উঠিতে লাগিল। সারাটা দিনই তাহার হাতে পড়িয়া থাকে, কি করিয়া যে সময় কাটে তাহার ঠিকানা নাই। বাড়ীতে মানুষের মধ্যে এক পিসীমা। তা একটা মানুষের সঙ্গে আর কতই বা গল্প করা যায়? বাবার কাছে ত সে ভয়ে যাইতেই পারে না। কি কথা বলিবে সে তাঁহার সঙ্গে? নিরঞ্জন ডাকিলেও সে কোনমতে পাঁচ-ছয় মিনিট বসিয়া তাহার পর পলাইয়া আসে।

স্নান করিয়া খানিক পরে সে খাইতে নামিয়া আসিল। ইন্দু তাহাকে ভাত বাড়িয়া দিয়া বলিল, "এখন ত খুব আমার উপর জুলুম চালাচ্ছিস, আমি চ'লে গেলে তখন কি না খেয়ে থাকবি?"

মায়া খাইতে খাইতে বলিল, "আহা, আমি যেন আর নিজের জন্যে দুটো ভাতে ভাত সেদ্ধ ক'রে নিতে পারব না?"

ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ যখন দশটা চারটা ইস্কুল করতে হবে, তখন ভাতে ভাত রাঁধার সময় পাবি কখন্ শুনি?"

মায়া বলিল, "যাও পিসীমা, তুমি শুধু শুধু আমায় ভয় পাইও না। আমার মা কি না সহ্য ক'রে গেছেন, তবুও নিজের ধর্ম্ম ছাড়েন নি, আর আমি তাঁর মেয়ে হয়ে দুটো রেঁধেও খেতে পারব না?"

ইন্দু বলিল, "যাতে মায়ের মত বোকামি না কর, সেই জন্যেই না আমার এত ক'রে বলা? নিজেও চিরজীবন কষ্ট পেল, মেজদাকেও কষ্ট দিল। তুই কোথায় বাপকে সান্ত্বনা দিবি এতদিন পরে একটু জুড়োতে দি'ব তা না খালি সেই মায়ের সুরই ধরেছিস্। মেজদার জন্যে তোর একটু কষ্ট হয় না রে?"

মায়া খানিকক্ষণ খাওয়া ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "কি জানি পিসীমা, ঠিক ক'রে কিছু বুঝতে পারি না। মনে হয় আমি যাই করি, বাবার তাতে বেশী কিছু এসে যাবে না। এতদিন ত আমাকে না নিয়েই ছিলেন। তাঁর বেশ চ'লে গিয়েছে। কিন্তু মায়ের ত আমি ছাড়া কেউ ছিল না? বাবাও তাঁকে ত্যাগই করেছিলেন। তাই মনে হয়, আমি যদি এখন মায়ের মতের বিরুদ্ধে চলি, তাহলে তিনি স্বর্গে থেকেও শান্তি পাবেন না। তাই কি আমার করা উচিত হবে?" কথা বলিতে বলিতে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

ইন্দু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ওমা, ও কি, খেতে ব'সে চোখের জল ফেলিসনে, ওরকম করতে নেই। আচ্ছা এখন ওসব কথা থাক, পরে হবে। তবু তুই যা বল্‌ছিস, তাও ঠিক নয়। মেজদা তোকে কতখানি যে ভালবাসে, তা তুই বুঝতে পারিস না। পুরুষ-মানুষ হাজার কাজে ঘোরে, তাদের ভালবাসা কাজ দিয়ে বুঝতে হয়, কথায় অত বোঝা যায় না। তাদের স্বভাবে আর মেয়েদের স্বভাবে তফাৎ ঢের।"

তখনকার মত কথাটা ঐখানেই চাপা পড়িল। মায়ার খাওয়া শেষ হইলে ইন্দু খাইতে ব'সিল। মায়ার মনটা বড় বেশী ভার হইয়া উঠিয়াছিল। সে আর পিসীমার সঙ্গে গল্প করিবার চেষ্টা করিল না। উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে চুপচাপ শুইয়া পড়িল। ইন্দুও বোধহয় তাহাকে খানিকক্ষণ ভাবিতে সময় দেওয়া দরকার মনে করিতেছিল। সেও নিজের ঘরে বসিয়া 'অমিয় নিমাই-চরিত' পড়িতে আরম্ভ করিল।

নিরঞ্জনের গাড়ী আসিয়া থামার শব্দে মায়া খাট ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। সে ঘুমাইতে পারে নাই, শুইয়া শুইয়া কেবল আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। নিরঞ্জনের চা খাইবার সময় এখন রোজই সে কিছু না কিছু খাবার লইয়া গিয়া উপস্থিত হয়। কথা বলিতে পারুক বা নাই পারুক, বাপের কাছে বসিয়া থাকে।

আজও সে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল। ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার জন্যে আজ কিছু তৈরী করনি, পিসীমা?"

ইন্দু বলিল, "না, আজ আর কিছু করিনি। তবে ক্ষীরের ছাঁচগুলো এখনও বেশ ভাল আছে, তাই দুখানা নিয়ে যা না?"

মায়া রেকাবীতে করিয়া ক্ষীরের ছাঁচ বাহির করিতে করিতে বলিল, "তুমি চল না? খুব ত পড়েছ, এখন থাক।"

ইন্দু বলিল, "যা যা, মেয়ে যেন সং। বাপের কাছে যাবি ত এত ভয় কিসের? তোকে মারে না ধরে? তুই যা এখন, আমি পরে যাব।"

মায়া নাছোড়বান্দা, বলিল, "তুমি না গেলে বাবা নিশ্চয় খোঁজ করবেন। সেই যখন যেতেই হবে, তখন না-হয় আমার সঙ্গেই গেলে? ঐ শোন, ঘরে আবার কার গলা শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয় কেউ বাইরের লোক এসেছে। আমি যাব না পিসীমা।"

ইন্দু বই বন্ধ করিয়া রাখিল। বলিল, "বাবা, তোর মত মেয়ে যদি একটা আমি দেখেছি। একেবারে নবাবের বেগম। বাইরের লোক দেখে ফেললে একেবারে ক্ষয়ে যাবি, না? একরত্তি ত মেয়ে, তার এত বাড়াবাড়ি কেন রে?"

এমন সময় নিরঞ্জনের 'ছোকরা' আসিয়া বলিল, "সাহেব ডাকছেন।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাবার ঘরে আর কে কে আছে?"

'ছোকরা' বলিল, "আর একজন শুধু বাইরের বাবু আছেন।"

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম বাবু রে? তুই আগে তাকে কখনও দেখিস্‌নি?"

'ছোকরা' বলিল, আগে এ বাড়ীতে তাহাকে সে দেখে নাই। একজন বুড়াবাবু।

ইন্দু বলিল, "যা তবে। বুড়ো মানুষ, তার কাছে আবার লজ্জা কি? ক্ষীরের ছাঁচ আর দুখানা নিয়ে যা। সে লোকটিও অবশ্য মেজদার সঙ্গে চা খাবে।"

নিরঞ্জন ডাকিয়া না পাঠাইলে মায়া হয়ত শেষ পর্য্যন্ত যাইতে অস্বীকারই করিত. কিন্তু সাবিত্রীর শিক্ষায় আর যাহা হোক বা নাই হোক, বাধ্যতা জিনিষটা তাহার এমন অস্থিমজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছিল যে, গুরুজনের আদেশ অবহেলা করার চিন্তা মাত্রও কোনোদিন তাহার মাথায় আসিত না। অতএব রেকাবীতে করিয়া গুটিকতক ক্ষীরের ছাঁচ লইয়া সে কম্পিত পদে খাইবার ঘরে যাত্রা করিল। ইন্দুও তাহার পিছনে পিছনে চলিল। সে ঘরে ঢুকিবে না, আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিবে মানুষটা কে।

খাইবার ঘরে ঢুকিয়া মায়া দেখিল, তাহার বাবার চেয়ারের সামনা-সামনি একটা চেয়ারে প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। তাঁহাকে মায়া ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। মাথায় টাক, গোঁফজোড়া বেশ পাকা, পরণে অর্দ্ধমলিন ধুতি ও পাঞ্জাবী, কাঁধে একখানা পুরানো তসরের চাদর। পায়ের জুতাজোড়াও বেশ পুরানো।

মায়া ঘরে ঢুকিতেই নিরঞ্জন বলিলেন, "এই আমার মেয়ে, যোগীনবাবু।" মায়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইনি তোমাকে বাংলা আর সংস্কৃত পড়াবেন, সামনের হপ্তা থেকে।"

মায়া খাবারের রেকাবী টেবিলের উপর রাখিয়া ভদ্রলোককে প্রণাম করিল। তিনি অতিরিক্ত রকম ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "থাক মা, থাক। তুমি বোসো। তোমার নাম কি?"

মায়া মাথা নীচু করিয়া বলিল, "শ্রীমতী মহামায়া দেবী।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "এঃ, একেবারে আমাদের সেকালের নাম রেখেছেন যে। তা মেয়ে বেশ বুদ্ধিমতী, খুব চট্‌পট্ শিখতে পারবে।"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন, "রসুন, আগে পড়া আরম্ভই করুক, তারপর বুদ্ধিমতী কিনা বোঝা যাবে। এতকাল ত একরকম কিছুই করেনি। এখন একটু তাড়াতাড়িই এগোনো দরকার।"

যোগীনবাবু বলিলেন, "তা ত বটেই। আমি যথাসাধ্য যত্ন করব। তবে হাজার হোক মেয়েছেলে, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ত তাকে হতে হবে না. মোটের উপর খানিক শিক্ষা হলেই হবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আমার ছেলে ত নেই, কাজেই মেয়েকে দিয়েই সব সাধ মেটাতে হবে। ছেলে থাকলে তাকে যে রকম শিক্ষা দিতাম, একেও তাই

দেব। যাক, সে কথা পরে হবে। কই, আপনি ত কিছুই খাচ্ছেন না দেখি। মায়া, আজ কি এনেছ?"

মায় বলিল, "ক্ষীরের ছাঁচ। পিসীমা আজ আর কিছু তৈরী করেন নি।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার মাষ্টার মশায়ের প্লেটে বেশী ক'রে দাও। কেক্‌টেক্‌ একেবারেই খাবেন না নাকি?"

ভদ্রলোক একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "ওসব খাওয়া বেশি অভ্যাস নাই কিনা? আর এই ত এত ফলটল দিয়েছেন, কত আর খাব? দাও মা, এই প্লেটেই দাও, আর আলাদা জায়গা দরকার নেই। আমার এক গেলাস জল হলেই চলবে, চা সেই সকালে একবার খাই। নেহাৎ সর্দ্দিটর্দ্দি হলে দুবার খাই।"

মায়া উঠিয়া গিয়া ভদ্রলোকের জন্য জল লইয়া আসিল। নিরঞ্জনই অবশ্য তাহাকে যাইতে বলিলেন। কারণ খ্রীষ্টান 'ছোকরার' হাতে জল খাইতে হয়ত তাঁহার আপত্তি হইতে পারে।

মায়া পাশের ঘরে আসিতেই ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে, কে ও ভদ্রলোক?"

মায়া তাহার ভাবী মাষ্টার দেখিয়া যথেষ্ট আশ্বস্ত হইয়াছিল। ইনি একেবারে ঠিক তাহাদের দলের মানুষ। খাঁটি হিন্দু, কোথাও সাহেবী-আনার নামগন্ধও নাই। ইঁহার কাছে পড়িবে শুনিয়া সে খুবই নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগিল। ইন্দুর প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "বেশ চমৎকার ভদ্রলোক পিসীমা; ঠিক যেন বাড়ীর লোকেরই মত। আমাকে সামনের হপ্তা থেকে বাংলা আর সংস্কৃত পড়াবেন। বাপ রে, আমি ভয়ে মরছিলাম, না জানি বাবা সাহেব না মেম কি যে ধ'রে আনবেন।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "তোর সব তাতেই কেবল ভয় আর ভয়। শুধু বাংলা ত পড়বি এঁর কাছে, আর সব পড়াবার জন্যে তোর বাবা কাকে ধ'রে আনে তাই দেখ্ আগে।"

মায়ার মুখ ম্লান হইয়া আসিল। ইন্দু বলিল, "এই গ্যাও, মেয়ের অমনি কন্যাদায়ের ভাবনা চাপল। যা, যা, জল নিয়ে যা।"

মায়া জল লইয়া বাহির হইয়া গেল। সত্যই ত এত আগে ভাগে খুসী হইবার তাহার কোনো কারণ নাই। আচ্ছা, তাহার এত ভয়ই বা হয় কেন? সব মানুষেই কি বরাবর একভাবে থাকিতে পারে?

বিশেষ বাংলা দেশের মেয়েমানুষ। তাহারা বাপের বাড়ীতে হয়ত একভাবে গড়িয়া ওঠে, শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া একেবারে ভিন্ন রকম হালচাল ধরিতে বাধ্য হয়। তাহা লইয়া কেউ এত ত মাথা-কোটাকুটি করে না? কিন্তু তাহার যেন সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তনের নামে প্রাণ বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম হয়। এ রকম কেন হয়? সবটাই কি মৃতা জননী ও তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা স্মরণ করিয়া? সে নিজে এ সব কতটা বিশ্বাস করে? মায়া বুঝিতে পারে না।

যাই হোক, সম্প্রতি সে জল লইয়া ফিরিয়া গেল। যোগী-বাবুর খাওয়া এক রকম শেষই হইয়া গিয়াছিল। তিনি বসিয়া বসিয়া নিরঞ্জনের সহিত কি কি বই মায়ার জন্য প্রথম প্রয়োজন হইবে, সেই বিষয়ে গল্প করিতে-ছিলেন। চা খাওয়া শেষ হইতেই নিরঞ্জন তাহাকে লইয়া নিজের অফিস ঘরে উঠিয়া গেলেন। মায়া পিসীর কাছে গিয়া জুটিল। ইন্দু বসিয়া বসিয়া একখানা চিঠি পড়িতেছিল। পাশে আর একখানা চিঠি খোলা পড়িয়া আছে।

মায়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠি পিসীমা?"

ইন্দু বলিল, "একটা ন' খুড়ীর মেয়ে সরোজ লিখেছে, আর একটা বড় বৌ।"

মায়া কাছে ঘেঁসয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সরোজ পিসী কি লিখেছে? গাঁয়ের সবাই ভাল আছে?"

তাহার পিসী হাসিয়া বলিল, "গাঁ সুন্দর খবর কি আর দিয়েছে? তাদের বাড়ীতে সব জরজাড়িতে ভুগছে। আমাদের বাড়ীর পশ্চিম দিকের দেওয়ালটা নাকি ঝড়ে প'ড়ে গিয়েছে। ওরা যখন থাকবার জন্যে বাড়ী নিল তখন ত খুব মুখ বড় ক'রে বলেছিল, মেরামত যা যা দরকার হবে সব নিজেরাই করিয়ে নেবে। এখন নাকি কিছু করছে না। বল্‌তে হবে মেজদাকে। বড়দা ত এসব কথা কানেও নেয় না।"

মায়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ওমা, দেওয়াল না সারালে আমাদের ঘরদোর সব নষ্ট হবে যে? ভিতরে যত গরু বাছুর ঢুকে ফুলগাছ-টাছ সব খেয়ে ফেলবে।"

ইন্দু বলিল, "তাই ত ভাবছি। এতকালের বাপ-পিতামর ভিটে, কি দশা সব করেছে কে জানে? নিজের লোক একটাও যে নেই এমন, যাকে ওখানে রাখা যায়।"

মায়া বলিল, "পিসীমা, আমার ইচ্ছা করছে, এখনি তোমায় নিয়ে দেশে চ'লে যাই। আহা, অমন সুন্দর ফুলগাছগুলো আমার! ফুল ফুটলে সারা উঠোনটা যেন আলো হয়ে উঠত।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "তা তোর বাবা ত তোকে ছাড়বে না ফুলগাছ চৌকি দিতে। ব'লে-কয়ে দেখি যদি আমাকে ছাড়ে। আমি থাকলে ঘর-দোরের কিছু অযত্ন হবে না।"

মায়ার চোখে একেবারে জল আসিয়া পড়িল। সে বলিল, "পিসীমা, কি রকম নিষ্ঠুর তুমি! আমাকে একলা রেখে তুমি চ'লে যাবে? এখন কিছুতেই আমি তোমায় ছাড়ব না।"

পিসী তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "আরে, আজই আমি যাচ্ছি নাকি? আগে দেখি মেজদা কি বলে। বাপের কাছে থাকবি, তার আবার একলা কিসের? এরপর পড়াশুনা নিয়েই ত সারাদিন কেটে যাবে। আবার বড়বৌদি কি লিখেছে জানিস?"

মায়া নিরুৎসাহভাবে বলিল, "কি লিখেছেন?"

"লিখেছে, তারা শীগ্‌গির এখানে বেড়াতে আসবে। জয়ন্তীর নাকি কোথা থেকে খুব ভাল বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। যদি বিয়ে হয়ে যায়, তাহলে একবার মেয়ে-জামাই নিয়ে বেড়াতে আস্‌বে। আর যদি বিয়ে নাই হয় তাহলে ত আগেই আস্‌বে। বড়দা না এলেও জয়ন্তীর মামা তাদের নিয়ে আসবে।"

মায়া বলিল, "দিদি কিন্তু একদিন বল্‌ছিল, বি-এ পাশ না ক'রে কখনও বিয়ে করবে না।"

ইন্দু বলিল, "হিন্দুঘরের মেয়ের সব নিজের মতেই হয় কিনা? বাপ-মা যখন যার হাতে দেবে, তাই স্বীকার ক'রে নিতে হবে।"

মায়া হঠাৎ কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, নিজের মতে বিয়ে করলে কি হিন্দুর মেয়ের পাপ হয়, পিসীমা?"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "পাপ হ'তে যাবে কেন? তবে আমাদের সমাজে এখন ওটার চলন নেই, পুরাকালে সবাই ত স্বয়ম্বরাই হত। কেন, তোর কাউকে বিয়ে করতে মন গেল নাকি?"

"যাও পিসীমা, কি যে বল।" বলিয়া মায়া একছুটে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

দন দুই পরে মায়ার জন্য একগোছা বই খাতা আসিয়া পৌঁছিল। যোগীন বাবু কি কি বই দরকার সব তালিকা করিয়া দিয়াছিলেন। রেঙ্গুনে যাহা পাওয়া গেল নিরঞ্জন কিনিয়া আনিলেন, বাকি যাহা রহিল তাহার জন্য কলিকাতায় চিঠি লিখিয়া দিলেন।

মায়া বইগুলা লইয়া খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করিল, তাহার পর বসিবার ঘরের আলমারির মধ্যে সাজাইয়া রাখিয়া দিল। তাহার পড়া আরম্ভ হইতে এখনও তিন-চারদিন দেরী আছে। বাবা ত তাহাকে একেবারে লীলাবতী বানাইয়া তুলিতে চান এখন তাহার বুদ্ধিতে কুলাইলে হয়।

পরদিন নিরঞ্জন অফিসে যাইবার আগে ইন্দু গিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। নিরঞ্জন তখন খাইতে বসিয়াছেন, বাটিতে করিয়া খানিকটা সুক্তা লইয়া ইন্দু তাঁহার প্লেটের পাশে নামাইয়া রাখিল, তাহার পর খাইবার টেবিল হইতে একটা চেয়ার কিছু দূরে টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

নিরঞ্জন বলিলেন, "নিজেদের তরকারি মিষ্টি ত আমায় দুবেলা খুব খাওয়াচ্ছিস, একদিন আমার হেঁসেলের রান্না তোরা খা।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "তোমার মেয়েকেই খাইও, আমার কপালে কি আর তা লেখা আছে যে খাব? তা সে কথা থাক, পরশুর আগের দিন সরোজের এক চিঠি পেলাম।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তাই নাকি? কে মরল, কার ছেলে হল, কার বিয়ে, কার অন্নপ্রাশন, সব খবর আছে ত।"

ইন্দু বলিল, "না, অত খবর দেয়নি। তা আমাদের বাড়ীর খবর কিছু আছে। ঝড়ে নাকি পশ্চিম দিকের দেওয়াল প'ড়ে গেছে। সেখান দিয়ে উঠোনে রাজ্যের গরু, বাছুর, কুকুর, শিয়াল ঢুকছে। এর পর ঘরের দেওয়ালও পড়তে সুরু হবে। নিস্তারপিসী বাড়ী নেওয়ার সময় ত খুব বড় গলা ক'রে বললেন, দেখাশোনা, মেরামত সব তিনি নিজের খরচায় করবেন, এখন নাকি কিছুই করছেন না। বোধহয় গাঁয়ে তার থাকবার মতলব নেই, তাই আর ট্যাঁকের পয়সা খরচ করতে চাইছেন না।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তাই ত আমি ভাবছিলাম, ছোট খোকাকে পাশ টাশ করলে পর গ্রামেই বসিয়ে দেব। তার যে রকম মতিগতি দেখি, সহরে থেকে ৫০ টাকার চাকরী করার চেয়ে চাষবাস, গ্রামের উন্নতি করা এসব তার পোষাবে বেশী। কিন্তু বাড়ীঘর সব নষ্ট হলে চলবে কি ক'রে? দেখি দাদাকে চিঠি লিখে।"

ইন্দু তাচ্ছল্যভরে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "হাঁ, তুমিও যেমন। দাদা আবার ওসব দেখবে। কোনো কালে দেখেছে? যতদিন মা ছিলেন, তিনিই সব সামলেছেন, তারপর আমাতে, বৌয়েতে মিলে যা পেরেছি করেছি। ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে যেমন ক'রে হোক।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "মন্দ নয়। তিনি কলকাতায় ব'সে ব্যবস্থা করতে পারবেন না, আর আমি বর্ম্মায় ব'সে ব্যবস্থা করব?"

ইন্দু বলিল, "আমি বলছিলাম কি, আমাকে কেন দেশে পাঠিয়ে দাও না? নিস্তারপিসী যদি থাকেনও, তাহলেও আমার জায়গার অভাব হবে না। পূবদিকের ছোট ঘরখানা, আর নিরামিষ হেঁসেলের ঘরখানা ছেড়ে দিলেই আমার চল্‌বে। আমি থাকলে বাড়ীঘরও দেখতে পারব, আদায়-টাদায়ও ঠিকমত হবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তুই ছাড়া কি আর আমাদের চৌকিদার জুটবে না? তুই গেলে মায়া থাকবে কি ক'রে? একেই ত সে নূতন জায়গায় এসে ঘাবড়ে রয়েছে।"

ইন্দু বলিল, "ওমা, আমি চিরজন্ম ব'সে তোমার মেয়ে আগ্‌লাব নাকি? ও বয়সে আমরা বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ী গেছি। সে ত আরও একেবারে অজানা, অচেনা। আমাদের ত কেউ আগ্‌লাতে যায়নি? মেয়েমানুষের এত আদুরে হলে চল্‌বে কেন?"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন, "আদুরে ত কত! আদর জিনিষটায় তার এমনি অনভ্যাস, যে কেউ আদর করতে গেলে ভয়ে মেয়ের চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসে। তা ছাড়া নূতন বাপের বাড়ী, আর নূতন শ্বশুরবাড়ী, এ দুটো জিনিষে অনেক তফাৎ। সে যাই হোক, তোর যাওয়া এখন হতেই পারে না। বাড়ী প'ড়ে যায় যাবে, আবার বানাব। বৌদিরা আস্‌বেন শুনছি কিছুদিনের মধ্যে। নিতান্তই না গেলে যদি না চলে, তাহলে ওদের সঙ্গে যাস্ নাহয়।"

ইন্দু বলিল, "তোমায় আসার কথা কিছু লিখেছেন নাকি? আমায় লিখেছিলেন বটে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "দাদা চিঠি লিখেছিলেন মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে ব'লে, শেষে এই খবরটুকুও দিয়েছেন।"

বাড়ীতে বিবাহের নামে মন উৎসাহে ভরপূর না হইয়া উঠে, এমন নারী সংসারে দুর্লভ। ইন্দুও ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে নাকি? সেই চক্রবর্ত্তীদের ঘরেই? ছেলে বেশ ভাল বটে। তবে ঘর আমাদের চেয়ে ঢের নীচু।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "নীচু কি রে? তাদের চারতলা বাড়ী বড় রাস্তার উপরে; আর আমাদের ঘর বল্‌তে ত দেশের খড়ের ঘর। তাহলে তারাই হ'ল উঁচু, আমরাই নীচু। আজকালকার উঁচুনীচুর মাপ আগের কালের মাপকাঠিতে হয় না।"

ইন্দু বলিল, "আহা, বাড়ী বড় হলেই বংশও বড় হয়ে গেল আর কি? এখন ব'লে তাই এ সম্বন্ধ হতে পারছে, মা বাবা বেঁচে থাকলে একথা কানেই নিতেন না। তা কি রকম দিতে থুতে হবে? ছেলে ত এম-এ পাশ, তাতে আবার পরীক্ষায় প্রথম না দ্বিতীয় হয়েছে। দর নিশ্চয় তারা খুব চড়াবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "অবশ্য। যদিও ছেলে পরে চল্লিশ টাকাও রোজগার করবেন কিনা সন্দেহ। নগদেই তারা চার হাজার টাকা চাইছে। সেইজন্যেই দাদা চিঠি লিখেছেন। গহনা-গাঁটি, ইত্যাদি বোধহয় বৌদিদির ঘাড় দিয়েই চালাবেন। আর ত সব কটাই ছেলে। নগদ টাকাটা কোথা থেকে জোটে সেই হয়েছে ভাবনা।"

ইন্দু বলিল "সব টাকাই তোমার কাছে চেয়েছেন নাকি? সব না দাও, কিছুটা দিও, নইলে দাদা পেরে উঠবেন কি ক'রে? তাঁর ত আয় বেশী নয়, ছাপোষা মানুষ, কিছুই বোধ হয় জমাতে পারেননি।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "জয়ন্তীর নামে লিখে দিলে যদি তারা রাজী হয়, তাহলে চার হাজার পাঁচ হাজার যা চায় দিতে রাজী আছি। কিন্তু একটা অকর্ম্মা ছোঁড়াকে কিন্‌বার জন্যে আমি এক পয়সাও দেব না। চার হাজার সে কোনো কালে রোজগার করতে পারবে?"

ইন্দু বলিল, "ওমা, মেয়ের নামে লিখে দিলে তারা রাজী হবে কেন? তাদের হয়ত এই টাকা দিয়ে ঋণ শোধ করতে হবে, না-হয় বিয়ের খরচা

করতে হবে। অনেকে বলে এইজন্তে গয়না সুদ্ধ নেয় না, সেগুলো মেয়ের সম্পত্তি ব'লে সবই নগদ নেয়। তোমাদের মেয়েকে তারা চিরদিন পুষবে, তার জন্তে কিছু দেবে না?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা বেশ। কিন্তু তারা লিখে দিক যে মেয়েকে কোনদিন কষ্ট দেবে না, খোঁটা দেবে না, ভাত-কাপড় দিচ্ছে ব'লে তার উপর সর্দারি করবে না। খোরপোষের টাকা নিয়ে যখন তাকে ঘরে নিচ্ছে চিরদিন অতিথির মত আদর-যত্ন রাখবে। এতে রাজী হয় ত আমি টাকা দেব।"

ইন্দু উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "এ আবার তোমার অনাছিষ্টি আব্দার মেজদা। হিন্দুর ঘরে বরের বাড়ীর লোকেই হুকুমজারি করে, কনের বাড়ীর লোক মাথা পেতে নেয়। তুমি দেখি সব ব্যবস্থা উল্টে দিতে চাও। তাদের কি আর বৌ জুটবে না যে, তারা এই সব লেখাপড়া করতে রাজী হবে? মেয়ের বিয়ে না দিলেই নয়, আর ছেলের বিয়ে না দিলেও তাদের কিছু এসে যাবে না। তবে ঠেকা কাদের, তোমাদের না তাদের?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "ঠেকা যারই হোক, এক মাকাল ফল বর কিনতে টাকা আমি দেব না।"

ইন্দু বলিল, "নিজের মেয়ের বিয়ের বেলায় ও-সব সর্ত্ত কোরো, তাতে লোকে রাজী হবে। জানে ত ঐ এক মেয়ে, পরে সব কিছু সে-ই পাবে। দাদা বেচারার ত সে রকম কোনো কিছু নেই, তাকে টাকা দিয়েই মেয়ে পার করতে হবে। তাকে এখন মানে মানে উদ্ধার ক'রে দাও।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "মেয়ে কি জলে পড়েছে? সবে ত পনেরো না ষোল বয়স, এখনি বিয়ে না হলেই বা কি? পড়ছে পড়ুক না? ভাল ক'রে পাশ-টাশ করলে কত ছেলে তাকে যেচে বিয়ে করতে আসবে।"

ইন্দু বলিল, "তুমি বুঝছ না মেজদা, হিন্দুর মেয়ে যতই লেখাপড়া করুক, তার কোনো দাম নেই। বাপের টাকার জোরেই তার দাম ওঠে নামে। যত বয়স বাড়বে, বিয়ে দেওয়াও তত শক্ত হয়ে উঠবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আচ্ছা, এখন আমায় উঠতে হল, সমাজতত্ত্বের আলোচনা পরে করা যাবে। মোটের উপর আমার কথা এই, পণ দেবার জন্তে টাকা আমি কিছুতেই দেব না।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "তা দিও না। আমাকে দেশে পাঠাবে কি না তাই বল এখন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তাও পাঠাব না, অন্তত মাস কয়েক আরও তোকে এখানে থাকতে হবে। দাদাকে লিখব, তিনি কিছু না করেন ত গ্রামে কারো কাছে লিখে টাকা পাঠিয়ে দেব, এখনকার মত একটা দেওয়াল দিয়ে রাখবে। পরে ভেবেচিন্তে ব্যবস্থা করা যাবে।"

ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ, আমাদের গ্রামের লোকগুলি তেমনি বটে, টাকাটা নিয়ে দিব্যি হজম ক'রে ব'সে থাকবে, দেওয়াল যা উঠবে তা বুঝতেই পারছ।"

নিরঞ্জনের সময় হইয়া গিয়াছিল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ইন্দুও ফিরিয়া নিজের রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

মায়া পিসীকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি বললেন পিসীমা, তোমায় যেতে দিতে রাজী হলেন?"

ইন্দু বলিল, "না গো না, যেমন তুমি তেমনি ত তোমার বাবা?"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি বললেন বল না?

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "গিয়ে শুনতে পারিস্ নি? বললেন, এখন তোমার যাওয়া হবে না। আমার মেয়ের বিয়ে না হওয়া অবধি ব'সে ব'সে তাকে আগলাও।"

মায়া বলিল, "যাও পিসীমা, সব তাতে কেবল তোমার ঠাট্টা। যাক্, তোমায় যেতে ত দেবেন না এখন? তাহলেই হল।"

ইন্দু বলিল, "তা ত বটেই নিজের মতলব সিদ্ধি হলেই হল। এদিকে দেশের বাড়ীঘর সব যে যেতে বসল।"

মায়া বলিল, "তোমাকে আর আমাকে যদি একসঙ্গে যেতে দিতেন ত বেশ হত।"

ইন্দু বলিল, "ব'লে দেখ না তোমার বাবাকে? দেবে এখন দুই গালে চড় কষিয়ে।"

মায়া বলিল, "হ্যা আমি তেমনি বোকা কিনা, তাই বাবাকে এই-সব বলতে যাব। আমার আর দেশে এ জন্মে যাওয়া হবে না, তা আমি খুব ভাল ক'রেই জানি" বলিতে বলিতে তাহার গলা ভার হইয়া আসিল, চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

ইন্দু বলিল, "বালাই, এ জন্মে যাবি না কেন? জয়ন্তীর বিয়েতে যদি আমরা কলকাতায় যাই, তাহলে কি আর দেশে একবার ঘুরে আসব না? আর এখন যদি নাও যাওয়া হয়, দুচার বছর পরে নিশ্চয় যাবি। তুই শুধু

শুধু এত মন খারাপ করিস কেন? যা এখন নাইগে যা।" মায়া উঠিয়া গেল।

বিকালবেলা আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মায়া চুল বাঁধিতেছে, এমন সময় নীচে তাহার বাবার গাড়ী থামার শব্দ শোনা গেল। গাড়ীর শব্দ পাইলেই সে হয় জানলার কাছে, নয় গাড়ীবারান্দায় গিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখে, কিন্তু সম্প্রতি বিনুনী করিতে ব্যস্ত থাকায় আর জায়গা ছাড়িয়া নড়িল না।

কয়েক মিনিট পরে ইন্দু ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ওরে, তোর হল চুল বাঁধা? আবার কে তোর মাষ্টার এসেছে দেখ্‌গে যা। মেজদা তোকে চুল বেঁধে পরিষ্কার হয়ে যেতে বললেন। খালি পায়ে যাস্‌নে যেন, রাগ করবে আবার।"

মাষ্টারের নাম শুনিয়াই মায়ার বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বাবার কথা না শুনিয়াও উপায় নাই। অগত্যা যথাসম্ভব শীঘ্র ফিট্‌ফাট্‌ হইয়া লইল। তাহার পর কম্পিত পদে নীচে নামিয়া চলিল।

নীচের বড় হল্‌ ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল, তাহার বাবা সেইখানেই বসিয়া। তাঁহার নিকটে একটি অল্পবয়স্কা মেম-সাহেব বসিয়া আছে, মায়াকে দেখিয়া সে খুব হাস্যমুখে তাহার দিকে চাহিয়া কি যেন একটা বলিল।

মেম দেখিয়া মায়ার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, তাহার পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

নিরঞ্জন বলিলেন, "মায়া, এদিকে আয়।" মেম-সাহেবের দিকে চাহিয়া ইংরাজীতে বলিলেন "এইটিই আপনার ছাত্রী মিস্ এলিস্।"

মায়া পিতার আহ্বানে একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মিস্ এলিস্ উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া যেই নিজের দিকে আকর্ষণ করিল, তৎক্ষণাৎ মায়ার মাথার ভিতর সব যেন কেমন উলট-পালট হইয়া গেল। আজন্মের সংস্কার শিক্ষা সব তাহার মনে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। ম্লেচ্ছের স্পর্শ! এক ঝটকায় তরুণীর হাত ছাড়াইয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কোনোমতে উপরে উঠিয়া, নিজের খাটের উপর একবারে গিয়া গড়াইয়া পড়িল। তাহার বুকের ভিতর কে যেন তখন হাতুড়ি পিটাইতেছে, কানের ভিতর ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ হইতেছে। বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে মড়ার মত পড়িয়া রহিল।

কতক্ষণ যে কাটিয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই। কয়েক মিনিট, না কয়েক ঘণ্টা? মায়া সময়ের আন্দাজ হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

হঠাৎ পায়ের শব্দে সে মুখ তুলিয়া তাকাইল। তাহার বাবা দাঁড়াইয়া। ভয়ে তাহার বুকের রক্ত হিম হইয়া আসিল। না জানি কি ভীষণ শাস্তি তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

কিন্তু ব্যাপারটা ঘটিল অন্য রকম। নিরঞ্জন আসিয়া তাহার খাটে বসিয়া, তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া ডাকিলেন, "মায়া!"

মায়া ভয়ে ভয়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। নিরঞ্জন বলিলেন, "তুইও আমায় এমনি ক'রে কষ্ট দিবি মায়া? আমার তুই ছাড়া ত কেউ নেই।"

মায়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে কি? তাহার এমন পাষাণের মত কঠোর পিতা, তাঁহার চোখে জল? তাহার বুকের ভিতরটা বেদনায় মোচড় দিয়া উঠিল।

নিরঞ্জন বলিলেন, "আমার কথা শুনবি না মায়া? মিস্ এলিস্‌কে তাহলে চ'লে যেতে বলব?"

মায়া উঠিয়া বসিল। তাহার দুইচোখ দিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "না বাবা, আমি তোমার কথাই শুনব। চল, আমি যাচ্ছি।"

নিরঞ্জন তাহাকে সস্নেহে নিজের বুকের উপর টানিয়া লইলেন। পিতার বুকে মুখ লুকাইয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

খানিক পরে নিরঞ্জন মেয়ের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "যাও মা, মুখটা ধুয়ে এস, তারপর আমরা নীচে যাব।"

মায়া গিয়া মুখ ধুইয়া মুছিয়া আসিল। তাহার পর নিরঞ্জনের পিছন পিছন আবার নীচে নামিয়া আসিল।

মিস্ এলিস্ এবারেও তাহাকে দেখিয়া হাসিল বটে, তবে কাছে আসিবার কোনো চেষ্টা করিল না। নিরঞ্জনের কথা মত মায়া একটা চেয়ারে গিয়া বসিল।

নিরঞ্জন শিক্ষয়িত্রীকে বলিলেন, "আমার মেয়েটি বড় বেশী লাজুক, বাইরে মেলামেশা তার অভ্যাস নাই।"

মিস্ এলিস্ হাসিয়া বলিল, "অল্প দিনেই এ ভাবটা কাটিয়া যাইবে।"

রোজ ভোরে উঠিয়াই ইন্দু স্নান করিয়া পূজার ফুল তুলিতে বাগানে আসিয়া প্রবেশ করে। তাড়াতাড়ি কাজ সারে না ধীরেসুস্থে বেড়াইতে বেড়াইতে ফুল তুলিতে তুলিতে তাহার ঘণ্টাখানিক কাটিয়া যায়। মায়াও আসিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়।

আজ কিন্তু ইন্দুর ফুল তোলা, বেড়ান প্রায় সাঙ্গ হইয়া আসিল, তবু মায়ার দেখা মিলিল না। ইন্দু ভাবিল, 'কাল ঐ মাস্টারণী নিয়ে অত কান্নাকাটি ক'রে আজ হয়ত শরীর খারাপ হয়ে থাকবে, তাই বেলা অবধি ঘুমোচ্ছে। পূজো সেরে নিয়ে দেখব এখন।'

মায়া কিন্তু তখন ঘুমাইতেছিল না। ঘরের মেঝেতে বসিয়া ট্রাঙ্কের তলায় কি যেন খুঁজিতেছিল। চট্ করিয়া না পাওয়াতে কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু হইয়া, সব জিনিষ টান মারিয়া সে বাহির করিয়া ফেলিল। তলা হইতে বাহির হইল, সাবিত্রীর এক ছবি।

মায়া ছবিখানি লইয়া আবার খাটের উপর গিয়া বসিল। ছবিখানি সামনে রাখিয়া সে অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল, "মা, আমি তোমার কথা রাখতে পারলাম না, আমায় ক্ষমা কোরো। বাবার মনে আমি কষ্ট দিতে পারব না, তিনি যা বলবেন করব পরে না হয় প্রায়শ্চিত্ত করব।"

সাবিত্রীর ছবি যেন কঠোর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। মায়া ছবিখানি আবার বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া তাহার উপর জিনিষপত্র চাপাইতে লাগিল। ছবিখানি বাহিরে রাখিলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু কেন জানি না তাহার ধারণা হইয়াছিল, এ বাড়ীতে তাহার মায়ের ছবির আদর হইবে না, তাই সেখানা সে লুকাইয়া রাখিত।

বাক্স গোছান প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এমন সময় ইন্দু আসিয়া বলিল, "কি রে, তোর আজ এত দেরী যে? শরীর ভাল নেই নাকি?"

মায়া তাড়াতাড়ি বাক্সের ডালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, "না, শরীর ত বেশ ভালই আছে। আজ বাগানে যেতে আর ইচ্ছে করল না।"

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "তা সকালেই বাক্স নিয়ে বসেছিস্ কেন? যা, মুখ ধুয়ে দুধটুধ খেগে যা। ঠাণ্ডা হয়ে গেল এতক্ষণ।"

মায়া পিসীর পিছন পিছন নীচে নামিয়া গেল।

ইন্দু রান্না চড়াইতে চড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল মেজদা তোকে বকেছে নাকি রে?"

মায়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল বকেন নাই। ইন্দু বুঝিল, কালকার কথা আলোচনা করিতে মায়ার বিশেষ ইচ্ছা নাই সুতরাং সেও চুপ করিয়া গেল।

খানিক পরে মায়া নিজেই বলিল, "এই দুটো দিন মোটে ছুটি, এরপর ত সারাদিন পড়া নিয়েই থাকতে হবে।"

ইন্দু বলিল, "সারাদিন ব'সে বাজে ভাবনা ভাবার চেয়ে পড়া নিয়ে থাকা ত ভালই। আমার যদি আর পড়বার বয়স থাকত ত আমিও তোর দলে জুটে যেতাম।"

মায়া বলিল, "বেশ ত পিসীমা, তুমিও আমার সঙ্গে বাংলা আর সংস্কৃত পড় না? বয়স একটু বেশী হলে কিই বা এসে যায়? বাবাকে বলব?"

ইন্দু বলিল, "থাক্, থাক্, তোমার আর সাত তাড়াতাড়ি বাবাকে বলতে হবে না। আমার যদি বরাবর এখানে থাকার ঠিক থাকত তাহলে না হয় সুরু করতাম। কখন যাই, কখন থাকি, কিছু ঠিক কি আছে? শুধু শুধু সংএর মত আরম্ভ ক'রে কি হবে?"

মাঝের দুইটা দিন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। তাহার পর মায়ার পড়াশুনা সুরু হইল। সকাল বেলা যোগীনবাবু আসিয়া বাংলা সংস্কৃত পড়াইয়া যাইতেন। আসল চাপ পড়িল, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে। তখন ইংরাজী, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বাজনা সব কিছু এক সঙ্গে আসিয়া জুটিত। বড় পিয়ানো এতদিন পরে খোলা হইল, এতকাল সেটা কেবল গৃহসজ্জার কাজই করিয়া আসিয়াছে।

প্রথম দিন বড় বেশী সময় গেল না। ঘণ্টাখানেক পরেই মেম-সাহেবকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, ইন্দু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, এরই মধ্যে এত পড়া সব হ'য়ে গেল?"

মায়া বলিল, "আজ কেবল কি কি পড়তে হবে, তাই দেখিয়ে দিলে। কি যে মুস্কিল পিসীমা, ও আমার কথা বুঝতে পারে না, আমিও ওর কথা বুঝতে পারি না। হিন্দীও যদি ভাল জানতাম ত চলত এক রকম, তাও যে ছাই ভাল ক'রে জানি না।"

ইন্দু বলিল, "যা জানিস, তাই বলিস। লজ্জা করলে কি কখনো কাজ হয়?"

মায়া বলিল, "হাঁ, তা বই কি? তোমার মত চমৎকার হিন্দী বলি আর সে হেসে খুন হোক।"

ইন্দু বলিল, "হাসলে ত আর গায়ে ফোস্কা পড়বে না?"

যাহা হোক, কোনো রকমে ভাঙা ভাঙা হিন্দীর সাহায্যেই কাজ আরম্ভ হইল। ইন্দু আসিয়া মাঝে মাঝে পড়ার সময় বসিয়া থাকিত। মায়া যখন অঙ্ক কষিত, কি হাতের লেখা লিখিত, তখন সে মহোৎসাহে মিস্ এলিসের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিত। হইলই বা মেমসাহেব, মেয়েমানুষ ত বটে? ভাষার বাধাও তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিত না। পিসীর অপূর্ব্ব হিন্দী শুনিয়া মায়া মাঝে মাঝে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিত।

পড়াশুনা একরকম চলিতে লাগিল। বাজনাটা মায়ার খুবই পছন্দ হইল, অল্প কয়দিনের মধ্যেই সময়ে অসময়ে তাহার পিয়ানো-অভ্যাসের চোটে বাড়ীর লোক অস্থির হইয়া উঠিল। ইংরাজীটা এক রকম আয়ত্ত হইয়া আসিতে লাগিল, কেবল অঙ্ক লইয়া বাধিল ষোল আনা গোলযোগ। অঙ্ক তাহার মোটেই ভাল লাগে না, সে কষিতেও পারে না। একটা অঙ্ক মিস্ এলিস্ দশবার বুঝাইয়া দিলেও সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মহা বিপদ্।

মিস্ এলিস্ একদিন নিরঞ্জনকে বলিল, "মায়া বেশ accomplished মেয়ে হইবে বটে, তবে যদি তাহাকে Universityর পরীক্ষা পাশ করাইতে চান, তবে কতদূর পারিয়া উঠিবে, বলিতে পারি না। অঙ্কটা সে মোটে বুঝিতেই পারে না।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "মনও দেয় না বোধ হয়?"

মিস্ এলিস্ বলিল, "তা ঠিক মনে হয় না। আপনার মেয়ে বেশ মনোযোগী, পড়া সম্বন্ধে কোনো অবহেলা করে না।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তবে ত মুস্কিল। আমার ঐ একমাত্র সন্তান, আমি মনে করিয়াছিলাম, এখানে ম্যাট্রিক পাশ করাইয়া উহাকে বিলাত পাঠাইব। অঙ্ক একেবারে না পারিলে চলিবে কিরূপে?"

মিস এলিস্ বলিল, "কেন এরূপ হয় ঠিক বুঝি না। হয়ত আমার কথা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। দিন কয়েক অঙ্কের জন্য কোনো বাঙ্গালী শিক্ষক রাখিয়া দেখিতে পারেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই না-হয় দিন কয়েকের জন্য রাখিয়া

দেখিব। কিন্তু আপনার কথা আর সব-কিছুর বেলা বুঝিতে পারে, কেবল অঙ্কের বেলাই বা পারে না কেন?”

যোগীনবাবুকে দিন কয়েকের জন্য অঙ্কের মাষ্টারও রাখা হইল। তাহাতেও খুব বিশেষ কোনো প্রভেদ বোঝা গেল না। তবু মন্দের ভাল বলিয়া যোগীনবাবুই মায়াকে অঙ্ক কষাইতে লাগিলেন, মিস্ এ'লস্ অন্য যেমন সব পড়াইতেছিল তেমনি পড়াইতে লাগিল।

ইন্দু একদিন মায়াকে বলিল, “তোর পড়ানোর পেছনেই মেজদা যে টাকা ঢালছে, দেশে তাতে দশটা মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়।”

মায়া বলিল, “আবার ত হপ্তায় দুদিন ক'রে ড্রয়িং পেন্টিং শেখাতে একজন আসবে। কত যে শিখব তার ত ঠিকানা নেই, টাকা ত বাবা জলের মত ঢালছেন।”

ইন্দু বলিল, “যাক্, তোরই ত সব পাওনা, তা এখনই খরচ হোক, কি পরেই খরচ হোক। জয়ন্তীটার বিয়ের কি হ'ল কে জানে, আর ত কোন খবর পেলাম না। হয়ত মেজদা টাকা দিতে না চাওয়ায় রাগ ক'রে ওরা আর চিঠিপত্র লিখছে না।”

মায়া বলিল, “বাবা যে পণ দেবার কথা শুনলেই মহা চ'টে যান, দেশে ত সবাই পণ দেয়।”

ইন্দু বলিল, “বৌও ত পণ দিয়েই তোর বিয়ের জোগাড় করছিল। বাপ রে, মেজদা শুন্‌লে যা চট্‌ত।”

মায়া চুপ করিয়া রহিল। মায়ের কথা আলোচনা করিতে এখনও তাহার গলার কাছে কান্না ঠেলিয়া উঠিত। এমন সময় ছোকরা আসিয়া খবর দিল, সেলাই লইয়া দরজী আসিয়াছে, কাজেই তখনকার মত সে আলোচনা থামিয়া গেল।

সাজপোষাক সম্বন্ধে মায়া ক্রমেই আজকাল সচেতন হইয়া উঠিতেছিল। যেখানেই যাইত, অন্য সকলের পোষাক-পরিচ্ছদ খুব খুঁটাইয়া দেখিত। কোন্ রং-এর সঙ্গে কোন্ রং মানায়, কি রকম মুখে কি ধরণের চুল বাঁধা, কি ফ্যাশানের ফুল মানায়, এসব বিষয়ে বাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই আলোচনা করিতে বসিয়া যাইত। নিরঞ্জন খরচ করিতে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত, বিশেষ করিয়া কন্যার সম্বন্ধে, সুতরাং যখন যাহা ইচ্ছা কিনিতে বা অর্ডার দিতে মায়ার কোনোই বাধা ছিল না। পোষাকের আল্‌মারী ক্রমেই ভরিয়া উঠিতেছিল।

জয়ন্তীর বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল। মনোরঞ্জন কিছুতেই পণের টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। দুই ভাইয়ে ইহা লইয়া খানিকটা মনোমালিন্যও ঘটিয়া গেল। নিরঞ্জন ইচ্ছা করিলেই এ বিবাহ হইতে পারিত। তিনি শুধু একটা বাজে জেদ করিয়া টাকা দিলেন না। এই হইল মনোরঞ্জন এবং তাঁহার স্ত্রীর ধারণা। সুতরাং রেঙ্গুনে বেড়াইতে আসার প্রস্তাবটা একরকম চাপাই পড়িয়া গেল।

মায়ার পড়াশুনা চলিতে লাগিল। এই ভয়াবহ জিনিষটার মধ্যেও যে রস আছে তাহা সে ক্রমে বুঝিতে শিখিল। তাহার গোঁড়ামীও অনেক দিক্ দিয়া কমিয়া আসিতেছে দেখিয়া নিরঞ্জন খুসী হইলেন। ছোঁয়া ছুঁয়ি লইয়া আজকাল সে মোটেই গোলমাল করে না। মিস্ এলিস্‌কে নিজে চা করিয়া দেয়, এবং সে চা পান করিলে পর পেয়ালা নিজের হাতে অনেক সময় তুলিয়া লইয়া যায়। প্রথম প্রথম পড়া শেষ হইবার পরই সে ঘরে ছুটিয়া গিয়া কাপড় ছাড়িয়া ফেলিত এবং ইন্দুর কাছে গঙ্গাজল চাহিয়া লইয়া মাথায় গায়ে ছিটাইত। এখন আর সে সব উৎপাত নাই।

কিন্তু খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে এখনও সে আগেরই মত রক্ষণশীল। পিসীর রান্না ছাড়া কোনো কিছু মুখেও দেয় না। এত জায়গায় ঘোরে, কিন্তু একটুকরা কেকও কখনও ছোঁয় না। নিরঞ্জনের খ্রীষ্টান বা মুসলমান চাকর বাকর এখন পর্যন্তও মায়ার কোনো কাজ করিবার অনুমতি পায় নাই। ছোকরা একদিন ঘর ঝাঁট দিতে আসিয়াছিল, মায়া তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া দিল।

ইন্দু একদিন বলিল, "আর কেন অত পিটপিটেনি বাছা? মেজদা ত তোকে বিলেত পাঠাবে ঠিক ক'রে রেখেছে, সেখানে গিয়ে এসব চালাবে কি ক'রে?"

মায়া বলিল, "দেখো, বিলেত গিয়েও চালাব। বাবার মনে কষ্ট যেমন দিতে পারি না, মায়ের আত্মাকেও দুঃখ দিতে পারব না। তার জন্যে নিজের যত কষ্ট হয় হবে।"

কয়েকটা বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। নিরঞ্জনের বাড়ী বাহির হইতে দেখিতে একই রকম দেখায়, ভিতরে কিন্তু অধিবাসীগুলির জীবনে অনেক রকম পরিব ‍র্তন আসিয়াছে।

ইন্দু বহুদিন হইল দেশে চলিয়া গিয়াছে। সংসারের কর্ত্রী এখন তরুণী মহামায়া। নিরঞ্জন প্রায় আগেরই মত আছেন, তবে মনোরঞ্জনের মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার মনে একটা শোকের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। মনোরঞ্জন সন্তানদের জন্য বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কোনোমতে জয়ন্তীর বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন মাত্র। বিবাহও বিশেষ ভাল ঘরে দিতে পারেন নাই। জয়ন্তী বেচারীও নানা বিপদ্ আপদের ও অশান্তির ভিতর দিয়া দিন কাটাইতেছিল। জয়ন্তীর পরে যে ভাইটি, নিরঞ্জন তাহাকে নিজের নিকটে লইয়া আসিয়াছিলেন, সে এখানে থাকিয়াই পড়ে। অন্যগুলি সব কলিকাতায় মায়ের কাছেই আছে, তিন ভাইয়ে মিলিয়া তাহাদের খরচ দেন, অবশ্য বেশীর ভাগটাই নিরঞ্জনের ঘাড়ে পড়ে।

মহামায়ার পড়াশুনা ভালই চলিতেছে, সেও এখন কলেজেই পড়ে। বাড়ীতে এখন গান-বাজনার শিক্ষক ভিন্ন অন্য শিক্ষক কেহ নাই। তাহাকে এখন দেখিলে আর কয়েক বৎসর পূর্বের সেই বালিকা মায়াকে চেনা যায় না। চেহারা যে একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে তাহা নহে, তবে ধরণ-ধারণ চাল-চলনের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, অন্ততঃ বাহির হইতে তাহাই মনে হয়। চেহারার পরিবর্ত্তনের মধ্যে সে আগের চেয়ে রোগা এবং লম্বা হইয়াছে, রংও কিছু বেশী ফরশা হইয়াছে।

রবিবারের দুপুর বেলা। উপরের ঘরে বসিয়া মায়া চিঠি লিখিতে ব্যস্ত। পিসীমা চলিয়া যাইবার পর কিছুদিন মায়া অত্যন্তই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার প্রাণ যেন সারাক্ষণই ছট্‌ফট্ করিত। কিছুতেই টিঁকিতে পারিত না। সে ভাবটা অবশ্য কয়েক মাসের মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছিল। তাহার পর জ্যেঠামশায়ের ছেলে অজয় আসিয়া জোটাতে, তাহার সঙ্গীর অভাবও যখন দূর হইয়া গেল, তখন ইন্দুর অভাব ভুলিতে তাহার বেশী দেরি হইল না। কিন্তু চিঠি-পত্র লিখিয়া, দেশের সকলের খবরাখবর নেওয়াটা সে বরাবরই

চালাইয়া আসিয়াছে। জয়ন্তীর সঙ্গেই পত্র-ব্যবহারটা বেশী চলে, ইন্দুও প্রায়ই লেখে।

একখানা চিঠি শেষ করিয়া মায়া সবে আর-একখানা আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় অজয় আসিয়া ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইল। বয়সে সে মায়ার চেয়ে মাস-কয়েকের ছোট, সেই কয়মাসের খাতিরেই সে মায়াকে 'মেজদি' বলিয়া ডাকে। অজয়ের রং শ্যামবর্ণ, বেশ লম্বা হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। পড়াশুনায় যত নাম কিনিতে পারুক বা নাই পারুক, ফুটবল, হকি, প্রভৃতিতে তাহার বেশ নাম আছে।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়াই সে বলিয়া উঠিল, "আরে বাপ্ রে বাপ্! মেজদি কি চিঠি লিখতে পার? তোমার মরার পর ছাপালে তিন-চার volume বই হবে। তবু ত এখনও আসল চিঠি লেখার লোক জোটেনি।"

মায়া তাহাকে তাড়া দিয়া বলিল, "যা, যা, জ্যাঠামি করতে হবে না। নিজে ত মাসে বাড়ীতে একটাও চিঠি লিখিস্ না, আমি ভাগ্যে লিখি, তাই বাড়ীর লোকে তোর খবর পায়।"

অজয় বলিল, "অত ন্যাকামী আমার আসে না। যদি মরি বা লাট হই, তাহলে বাড়ীর লোকে খবর পাবেই যেমন ক'রে হোক। দিনগুলো একইভাবে যাচ্ছে, খাচ্ছি, দাচ্ছি, কলেজ যাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, এ আর রোজ কি লিখে পাঠাব? তুমি কাকে চিঠি লিখছ, দিদিকে না পিসীমাকে?"

মায়া বলিল, "দিদিকেও না, পিসীমাকেও না, এটা লিখছি আমি নর্ম্মাকে।"

অজয় বিস্ময়ের ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে? Hollywoodএর Norma Talmadgeকে, না Norma Shearerকে? তোমার সঙ্গে কি ক'রে ভাব হ'ল?"

মায়া একটা বই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিয়া বলিল, "বেরো এখান থেকে। খালি প্যান প্যান ক'রে আমার সময় নষ্ট করছে। কাল ইংলিশ মেলে চিঠি যাবে, আমি আজ না লিখলে আর সময়ই পাব না।"

অজয় বলিল, "আচ্ছা বাবা, আমি যাচ্ছি, তুমি তোমার ট্যাশ ফিরিঙ্গীর ধ্যান কর। দিশী কোনো কলেজের মেয়ে বিদেশে গেলে নিশ্চয় এত religiously তাকে প্রতি মেলে চিঠি লিখতে না। গান্ধী, নেহেরু যতই বক্তৃতা করুন, আমাদের কোনো জন্মে কিছু হবে না। শাদা চামড়ার পুজো করা একেবারে আমাদের অস্থিমজ্জাগত।"

মায়া তাড়া দিয়া বলিল, "তুই যাবি, না আমি দরজা বন্ধ করব ?"

অজয় পিছন হটিতে হটিতে বলিল, "যাচ্ছি, যাচ্ছি। তুমি বিকেলে যদি কোথাও না যাও, ত তোমার গাড়ীটা আমায় দাও না ? কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে লগা লেক্‌স্ ঘুরে আসব।"

মায়া বলিল, "না, না, তুমি আমার গাড়ী নেবে না। টায়ারের শ্রাদ্ধ ক'রে আনবে ত সেবারের মত ? তা ছাড়া বিকেলে আমার এক জায়গায় যেতেও হবে।"

অজয় চলিয়া গেল। মায়া আবার চিঠি লেখায় মন দিল। বেলা ক্রমে গড়াইয়া আসিতেছে, সেদিকে লক্ষ্যই নাই।

একটা ছোকরা চাকর আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইল। মায়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাস্ ?"

ছোকরা জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর জিজ্ঞেস করছে, চায়ের জন্যে কি তৈরি করবে।"

মায়া বলিল, "শুধু ফলের রস ক'রে পাঠাতে বল্। ভয়ানক গরম, চা এখন আমি খাব না। খাই যদি, বাবার সঙ্গে খাব।" ছোকরা চলিয়া গেল। আগেকার মায়ার সঙ্গে এই মায়ার একটু সাদৃশ্য এখনও আছে। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে বিচার এখনও আছে। ইন্দু চলিয়া যাইবার পর কিছুদিন সে জেদ করিয়া নিজে রাঁধিয়া খাইয়াছিল। পড়াশুনার ক্ষতি হয় দেখিয়া, অবশেষে নিরঞ্জন এক বামুনঠাকুর জোগাড় করিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন, সে-ই এখন অবধি আছে। নিরঞ্জনও খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে এখন মেয়ের দলে ভিড়িয়াছেন, তাঁহার আর আলাদা বাবুর্চি নাই। ঠাকুর অবশ্য ইংরাজী বাংলা সব রকম রান্নাই প্রায় শিখিয়া লইয়াছে, এমন কি মুরগী রাঁধিতেও তাহার আপত্তি দেখা যায় না। তবে মায়া ও জিনিষটা এখনও বর্জ্জন করিয়া চলে।

তাহার শয়নকক্ষের একদিকের দেওয়ালে মস্তবড় এক তৈলচিত্র, তাহার মাতা সাবিত্রীর। কলিকাতা হইতে অনেক খরচ করিয়া সে এটি প্রস্তুত করিয়া আনাইয়াছে। মায়ের ছবি দেখিলে বাবা রাগ করিবেন, এ ধারণা আর তাহার নাই।

চিঠিপত্র লেখা শেষ করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। ছোক্‌রা ফলের রস লইয়া আসিলে তাহাকে বলিল, "ছাখ, ড্রাইভারকে বল, আমার গাড়ী ঠিক

করতে, আমি একটু বেরোব। আর দেখে এস, দাদাবাবু ঘরে আছে না বেরিয়ে গেছে।"

সে বাহিরে যাইবার জন্য বেশ পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করিল। যে মায়া এককালে আধুনিক প্রথায় কাপড় পরিতে জানিত না, লুকাইয়া অন্যের পরার ধরণ পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিত, সে-মায়া আর নাই। এখন তাহার পরিচিত মহলে সে-ই ফ্যাশানের নিয়ন্ত্রী হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই দেখাদেখি অন্য লোকে চলে।

ছোক্‌রা আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু ত নেই, বেরিয়ে গেছেন।"

মায়া বলিল, "আচ্ছা, ঠাকুরকে ব'লে এস, বাবার চায়ের জন্যে শিঙ্গাড়া ভাজতে আর সন্দেশ বার ক'রে রাখতে। এই নিয়ে যাও চাবি, আবার এখনি দিয়ে যাবে। রাত্রে রান্নার তেল ঘি, কিছু আর লাগবে কিনা, জিজ্ঞেস ক'রে আসবে অমনি।"

ছোক্‌রা একটু পরে চাবি ফেরত আনিল, এবং খবর দিল, ঠাকুরের তেল, ঘি কিছুর প্রয়োজন নাই। মায়া কাঁধে ব্রোচ্ আঁটিতে আঁটিতে নিজের মনেই বলিল, "আয়া লক্ষ্মীছাড়ী কবে যে আসবে তার ঠিক নেই, একলা একলা আমার প্রাণ শেষ হ'ল।"

বাড়ীতে মায়া ভিন্ন দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নাই, নিরঞ্জনও প্রায় সমস্ত দিন বাহিরে কাটান, এইজন্য বাণীর মায়ের পরামর্শে এক বৃদ্ধা মান্দ্রাজী আয়াকে তিনি মায়ার তত্ত্বাবধান করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কাজ তাহার কিছুই ছিল না, দয়া করিয়া মায়ার বিছানাটা করিত এবং ছাড়া কাপড় কাচিয়া দিত। বাকি অখণ্ড অবসর সে আর সব ক'জন চাকর-বাকরের দোষ ধরিয়া এবং তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াই কাটাইয়া দিত। অনেক দিনের পুরানো লোক, এবং দিদিমণির খাস ঝি বলিয়া তাহার যেন দাবি একটু বেশী ছিল। অন্য চাকর-বাকরে তাহাকে বড় একটা কিছু বলিত না, তবে বেশী বাড়াবাড়ি করিলে তাহারাও দু-চার কথা বেশ শুনাইয়া দিত। মায়া বাহিরে কোথাও গেলে বুড়ী সর্বদা সঙ্গে যাইত। দিন-চার হইল কোনো এক আত্মীয়ার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সে প্রস্থান করিয়াছে, এখন পর্যন্ত তাহার কোন খবর নাই।

ড্রাইভার গাড়ী লইয়া আসিল। মায়া আজ একলাই চলিল। ছোক্‌রাকে লইবে কিনা একটু ভাবিল, কিন্তু তাহা হইলে ঝাঁটপাট, বিছানা করা, প্রভৃতি কিছুই হইবে না বুঝিয়া তাহাকে রাখিয়াই গেল।

দুই তিন জায়গায় তাহার যাইবার ছিল, কোথাও বিশেষ দেরি করিল না, কারণ সন্ধ্যার পর এ দিকের পথ অত্যন্ত নির্জ্জন হইয়া যায়, মোটরেও যাতায়াত করিতে ভয়ে করে। সব শেষে নামিল বাণীদের বাড়ী। বাণীর এখনও বিবাহ হয় নাই, তবে পাত্র স্থির হইয়াছে। ছেলে বিলাতে পড়িতেছে, শীঘ্রই পরীক্ষা দিয়া আসিবে, তখন বিবাহ হইবে। বাণী আজকাল মেম রাখিয়া খুব পিয়ানো বাজাইতেছে এবং ইংরাজী সুরে কথা বলিতে শিখিতেছে, না হইলে বিলাত-ফেরত পাত্রের যদি পছন্দই না হয়?

উপরে উঠিয়াই প্রথম সাক্ষাৎ হইল বাণীর মায়ের সঙ্গে। ভদ্রমহিলা প্রায় আগের মতই আছেন, কেবল কিঞ্চিৎ বেশী মোটা হইয়া পড়িয়াছেন। মায়াকে দেখিয়া বলিলেন, "ওমা, মায়া যে! আজ যে বড় একলা? তোমার বুড়ীর কি হ'ল?"

মায়া বলিল, "কে জানে, কোন মামাতো না পিসতুতো বোন মরেছে ব'লে ঘরে গিয়ে ব'সে আছে আজ ক'দিন হ'ল। বাণী কোথায়?"

বাণীর মা বলিলেন, "এই ত সবে তার মেম গেল। একটু মুখ-হাত ধুতে গেছে। বোস, চা খাও। বুড়ী তাহলে তোমাকে খুব জ্বালাচ্ছে? আমার এখানে যখন ছিল তখনও এই ছিরি। আর সব দিকে ছিল ভাল, লোক না থাকলে চারহাতে কাজ করত, আপদ বিপদে বুক দিয়ে পড়ত। কিন্তু ঐ এক রোগ। আজ বোনের বিয়ে, কাল মাসীর শ্রাদ্ধ, পরশু অমুকের confirmation লেগেই আছে। এর উপর Roman Catholic-এর বারো মাসের তের পার্ব্বণ। আমার তখন ছোট ছেলে কোলে, একেবারে অস্থির হয়ে উঠতে হত।"

মায়া বলিল, "আমার ত তবু কোনো কাজ আটকায় না, এই যা রক্ষে।"

ইতিমধ্যে বাণী আসিয়া জুটিল। বলিল, "ইঃ, আজ একেবারে পশ্চিমে সূর্য্যোদয় যে? তোমাকে যে এই মাসেই আবার দেখতে পাব সে আশাই করিনি।"

বাণীর মা চায়ের ফরমাস করিতে চলিয়া গেলেন। মায়া বলিল, "আহা, আমার আশাপথ চেয়েই তোমার দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল আর কি! এ মেলে কত বড় প্যাকেট্ যাচ্ছে? পোষ্টেজ দিতেই তুই ফতুর না হোস্।"

বাণী তাহাকে জোরে একটা চিমটি কাটিয়া বলিল, "তোমাদের মত অত

আমরা সাহেব নই বাপু, যে বিয়ের আগেই দিস্তা দিস্তা চিঠি লিখব। নেহাৎ কালেভদ্রে কখনও লিখি, তাও সে চারখানা লিখলে একখানা।"

মায়া বলিল, "থাক, তাই মন্দ কি? আমি এত মেম হয়েও ত এখন পর্যন্ত কাউকে চিঠি লিখে উঠতে পারলাম না, একখানাও। তুই তবু কাজের আছিস্।"

বাণী তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "আহা থাক, অত দুঃখ আর কাজ নেই। তোমারও দিন ঘনিয়ে এল ব'লে।"

মায়া বলিল, "তুমি জানলে কি ক'রে? গুনতে টুনতে শিখেছ নাকি?"

বাণী বলিল, "গুনতে না জানলেও অনেক খবর পাওয়া যায় গো।"

মায়া বলিল, "তাই ব'লে আমার দিন ঘনিয়ে আসার খবরটা, আমার আগে তোর জানা নিতান্ত অনুচিত। সংস্কৃত কাব্যই বল আর পাশ্চাত্ত্য রোমান্সই বল, স্বপ্নে দেখা পাওয়া, নয় ত পাখীর মুখে শোনা, এসব আমারই পাওনা। তুই তাতে ভাগ বসাতে যাস্ কেন?"

বাণী বলিল, "আরে বাস্‌রে! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! ভয় নেই গো ভয় নেই, আসল জায়গায় আমি কিছুই ভাগ বসাব না, তুমিই অখণ্ড অধীশ্বরী হয়ে থেকো।"

মায়া তাহার পিঠে একটা কিল মারিয়া বলিল, "বিলাত-ফেরতকে বিয়ে করবি ব'লে কি এখন থেকেই নেশা করতে সুরু করেছিস? কি মাথামুণ্ডু বকছিস?"

বাণী বলিল, "মাথামুণ্ডু নয় গো, এর ভিতর সার আছে। এক জায়গা থেকে খবর পেলাম যে শ্রীমান্ দেবকুমার সাম্‌নের মাসে ফিরছেন। বাকিটা বোঝা কিছু শক্ত নয়। দুই আর দুইয়ে যেমন চার হয়, তেমনি এটাও ঠিক যে দেবকুমার তোমায় দেখবে এবং প্রেমে পড়বে। তুমিই কি আর বাদ যাবে? সিংহাসন ত এখনও খালি—"

ইতিমধ্যে বাণীর মা আসিয়া পড়ায় দুই সখীর গল্প থামিয়া গেল। চা খাওয়া চলিতে লাগিল।

২২

কলেজ হইতে ফিরিতে মহামায়ার সাড়ে চারিটা বাজিয়া যায়। নিরঞ্জনও প্রায়ই আধ ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পৌছান। বাপে মেয়েতে চা পান অধিকাংশ দিন এক সঙ্গেই হয়, তাহার পর মায়া প্রায়ই বেড়াইতে বাহির হয়, নিরঞ্জন নিজের খাতাপত্রের মধ্যে ডুব মারেন। যদি কোনোদিন কাজ বেশী না থাকে, বা শরীর খারাপ বোধ হয়, তাহা হইলে তিনিও মায়ার সঙ্গে খানিকটা বেড়াইয়া আসেন। সোমবার বিকালে মায়া গেটের ভিতর ঢুকিতেই দেখিতে পাইল, তাহার বাবার গাড়ী আগেই আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া ভাবিল, "বাবা যে বড় এত সকাল সকাল বাড়ী এসে পৌছেছেন? ব্যাপারখানা কি?"

বই খাতার বোঝা রাখিতে সে উপরে চলিয়া গেল। তাহার পর কলেজের বেশভূষা, জুতামোজা ছাড়িয়া, হাত-মুখ ধুইয়া নীচে নামিয়া আসিল। নিরঞ্জন তাহার অফিসরুমে বসিয়া। মায়া প্রথমে উঁকি মারিয়া দেখিল, ঘরে আর কেহ আছে কি না। কেহ নাই দেখিয়া ঢুকিয়া বলিল, "বাবা, তুমি যে আজ এত আগে এসেছ?"

নিরঞ্জন কন্যার হাসিমুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বড় ভাল কারণে আসিনি মা। টেলিগ্রাম পেলাম, ইন্দুর ভয়ানক অসুখ, যাবার জন্যে টেলিগ্রাম করেছে। আমি তোমায় একলা রেখে ত যেতে পারব না, তাই সব পরামর্শ করবার জন্যে চ'লে এলাম।"

মায়ার মুখের হাসি এক নিমেষেই মিলাইয়া গেল। পিতামাতার পরেই সে এই পিসীমাটিকে ভালবাসিত। মাতৃ-বিচ্ছেদের দুঃসহ দুঃখের দিনে ইহারই স্নেহের আশ্রয় পাইয়া সে বাঁচিয়া গিয়াছিল। তাহার দারুণ পীড়ার সংবাদে না গিয়া মায়া কখনও পারে না। সে ব্যগ্রভাবে বলিল, "বাবা, কালকের ইংলিশ মেল ধরতে পারলে খুব ভাল হত, কিন্তু আর ত সময় নেই।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "বৃহস্পতিবারের আগে আমার যাওয়া অসম্ভব। মানুষ যা ইচ্ছে করে, সব সময় ত তা ঘ'টে ওঠে না। অজয়টা একেবারে একলা পড়বে, সেই এক ভাবনা। বাড়ী না-হয় চাকরদের হাতেই রইল, কেবল গহনাগাঁটি তোমার ব্যাঙ্কে রেখে যেতে হবে।"

মায়া বলিল, "আচ্ছা, দামী কাপড়চোপড়গুলো না-হয় বাণীদের ওখানে রেখে যাব। এখানকার চোরদের ত কিছুতেই আট্‌কায় না। কাপড় পেলে কাপড়ই নিয়ে পালাবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কালই সব ব্যবস্থা করতে হবে। তুটো দিন ত মাত্র সময় হাতে। তোমার জিনিষপত্র সব কালই প্যাক ক'রে রেখ। ঐ পাড়া-পায় থাকার মহিমায় এক এক ক'রে সবাই যাবে দেখছি।"

মায়ের শোচনীয় মৃত্যুর কথা মায়ার মনে হইল। একরকম বিনা চিকিৎসায়ই সাবিত্রী সংসার ত্যাগ করিয়াছিল। ইন্দুর অবস্থাও কি তাহার চেয়ে ভাল হইবে? সেখানে তাহাকে দেখিবার আছেই বা কে?

মায়া বলিল, "ওখানে পৌছেই পিসীমাকে কলকাতায় remove করতে হবে। কাকারা এখনও যে কিছু কেন করেন নি, বুঝি না। পিসীমার ওসব বিষয়ে কোনো জেদ নেই। মায়ের সঙ্গেই এ সব নিয়ে কত ঝগড়া হত।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "খোকার সাংসারিক জ্ঞান ত কোনকালেই বেশী নয়। তা ছাড়া টাকাকড়ির ভাবনাও ভাবছে বোধ হয়। তার হাতে বেশী টাকা থাকবার কথা নয়।"

মায়া বলিল, "আচ্ছা বাবা, আমরা গিয়ে পৌছতে ত এখনও এক হপ্তা। এর মধ্যে কত কি হয়ে যেতে পারে। তুমি কালই T. M. O.-তে টাকা পাঠাও, আর টেলিগ্রাম কর, পিসীমাকে কলকাতায় নিয়ে আসতে। চিকিৎসার যেন কোনো রকম ত্রুটি না হয়!"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তাই করতে হবে। শিবচরণ বেচারা ছেলেকে receive করবার জন্যে দেশে যেতে চাইছিল, তাকে এখন আটকে পড়তে হবে, আমি না এলে সে আর বেরোতে পারবে না।"

মায়ার মনে পড়িল, আগের দিন বাণীর মুখে দেবকুমারের আসিবার কথা শুনিয়া আসিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কি খুব শীগ্‌গিরই আসছেন বাবা?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "এই মাসের মধ্যেই ত এসে পৌছবার কথা।"

মায়া আর এ বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল। ছোক্‌রাকে ডাকিয়া তাহাকে আয়ার সন্ধানে পাঠাইয়া দিল। বলিয়া দিল, বুড়ীকে যেমন করিয়া হোক ধরিয়া আনা চাই-ই। অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন।

তাহার পর সে জিনিষপত্র গোছাইবার জোগাড় দেখিতে লাগিল। কি লইয়া যাইবে, কি রাখিয়া যাইবে ইহাই এক সমস্যা। যাইতেছে সে পীড়ার সংবাদ শুনিয়া, কাজেই উৎসব-সজ্জার বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। তবু ষ্টীমারে পরিবার জন্য ভাল কাপড়চোপড় কিছু লইতে হইবে। কলিকাতায় পৌঁছিয়া যদি দেখে যে পিসীমাকে সেখানে লইয়া আসা হইয়াছে, এবং তিনি কিছু ভাল আছেন, তাহা হইলে একটু এদিক্-ওদিক্ বেড়াইতেও যাইতে পারে। এইসব ভাবিয়া কয়েকখানা মূল্যবান্ কাপড় আলাদা করিয়া রাখিয়া দিল। গহনা সব একটা ছোট ক্যাশ বাক্সে কোনমতে ঠাসিয়া বন্ধ করিল। কাল বাবার হাতে ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দিবে। বাকী সব কাল করিবে স্থির করিয়া সে কাপড়ের আলমারী বন্ধ করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

ছোক্‌রা ঘণ্টা-দুই পরে ফিরিয়া আসিল। সে বুড়ীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, তবে এখন তাহাকে কিছুতেই সঙ্গে করিয়া আনিতে পারিল না। কাল সকালে সে নিশ্চয় আসিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

সন্ধ্যাটা কাটিয়া গেল। অজয় আসিলে তাহার সহিতও অনেকটা পরামর্শ হইল। কিছুদিন একলা থাকিবার সম্ভাবনায় তাহাকে বিশেষ কিছু কাতর বোধ হইল না। বলিল, "যাও, যাও। দিন-কতক মনের সুখে গাড়ী হাঁকিয়ে নেব এখন! আমাদের ক্লাসের প্রবোধটাকে নিয়ে এসে রাখব এখানে, দু'জনে মিলে খুব adventure করা যাবে।"

মায়া বলিল, "পায়ে হেঁটে যত পার adventure ক'রো বাপু। আমার গাড়ীখানা যেন ভেঙ্গে রেখো না। নিতান্ত যদি কোথাও যাও, ত ড্রাইভারকে গাড়ী চালাতে দিও, নিজেরা সর্দারি ক'রো না।"

পরদিন জিনিষ গোছান,এখানে ওখানে পাঠানোর গোলমালেই কাটিয়া গেল। নিরঞ্জন সারাদিন নিজের অফিসে কাটাইয়া দিলেন, মাঝে তাঁহার ড্রাইভার আসিয়া খবর দিয়া গেল যে, জাহাজের কেবিন রিজার্ভ করা হইয়া গিয়াছে। মায়ার আয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সেও কাজের অনেক সাহায্য করিল। স্থির হইল, মায়া কলিকাতা হইতে না ফেরা পর্য্যন্ত বুড়ী এইখানেই থাকিয়া জিনিষপত্র আগলাইবে।

যাইবার দিন আসিয়া পড়িল। চাকর-বাকরকে অসংখ্য উপদেশ দিয়া তাহাদের তরুণী কর্ত্রী বিদায় লইয়া গেল। অজয় তাহাদের সঙ্গে

জাহাজ-ঘাট পর্য্যন্ত আসিল। বাণীও তাহার বাবার সঙ্গে আসিয়াছিল। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় অনেক জিনিষ আনিতে সে মায়াকে ফরমাস করিয়া দিল। তাহার পর একটু ভাবিয়া বলিল, "অবিশ্যি তোর পিসীমা যদি ভাল থাকেন। তা না হলে আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাস্ না। শুধু ক্যাটালগ্‌টা গিয়েই মনে ক'রে পাঠিয়ে দিস্ ভাই, ওটার জন্যে ত বেশী কষ্ট করতে হবে না?"

ষ্টীমারের পথটা মায়ার নানা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবনার মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল। ইন্দুর পীড়ার ভাবনা সারাক্ষণই প্রায় তাহার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিত বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে ইহারই মধ্যে অকারণেই তাহার মনটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। তরুণের ধর্মই ভাবনাকে ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করা। মায়ার মনে হইত, পিসীমা নিশ্চয়ই কিছু ভাল আছেন, না হইলে প্রথম সেই টেলিগ্রামের পর আরও টেলিগ্রাম আসিত। টাকা পাইয়া কাকারা নিশ্চয় পিসীমাকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়াছে, চিকিৎসা শুশ্রূষা সেখানে ভালমতেই হইতেছে। বহুকাল পরে সে আত্মীয়-স্বজনদের দেখিবে মনে করিতে বেশ খানিকটা আনন্দ পাইল। পিসীমা যদি ভালয় ভালয় সারিয়া উঠেন, তাহা হইলে বাবাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া সে গ্রামেও একবার বেড়াইয়া আসিতে পারে।

প্রথম যখন ব্রহ্মদেশে আসে তখনকার ষ্টীমার-যাত্রা আর এবারকার তফাৎ দেখিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার হাসি পাইত। সেবারে চারিদিকের ম্লেচ্ছ কাণ্ডকারখানা দেখিয়া সে ঘৃণায় সঙ্কোচে একেবারে পাগল হইয়া উঠিবার জোগাড় করিয়াছিল। আর তখন এই-সব সাহেবীয়ানার মধ্যেই কত নোংরামি, কত বেআদবি আবিষ্কার করিয়া সে বিরক্ত হইয়াছে। মানুষের চিন্তার ধারার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর চেহারাই বদলাইয়া যায়। গ্রামে যাইতে পারিলে সেখানটাও না-জানি তাহার কেমন লাগিবে। আগেকার সেই প্রবল টান এখন নাই বটে, তবে তাহার বাল্যের লীলাভূমির প্রতি মমতা একেবারে যায় নাই। তাহার মাতার স্মৃতির সহিত এই গ্রামখানির স্মৃতি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে গ্রামে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান করিবার ইচ্ছা বহুদিন হইতে মায়া মনে মনে পোষণ করিতেছে, কিন্তু কেমনভাবে কি করিবে, তাহা এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। বাপের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা

বলিতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইত। স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, ইন্দু ভাল হইয়া উঠিলে তাহারই সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দেখিবে। টাকার ভাবনাটা আসল ভাবনা নয়, তাহা সংগ্রহ করা মায়ার পক্ষে শক্ত হইবে না। তাহার হাত-খরচের টাকা সে সব খরচ করিয়া উঠিতে পারে না, জমা থাকে বেশ খানিকটাই। গহনাও তাহার প্রচুর জমিয়া উঠিয়াছে, সখ করিয়া গড়ায় বটে, তবে প্রায় সে কিছুই পরে না। তাহারও দু'একখানা বিক্রী করিয়া দেখা যাইতে পারে।

একখানা ডেক চেয়ার টানিয়া বসিয়া মায়া এইসব ভাবনাই ভাবিতেছিল। নিতান্ত ঘুমানোর সময় ভিন্ন অন্য সময় সে কেবিনে থাকিতেই পারিত না। তাহার দুইটি সহযাত্রিণীর ভিতর একটি বাঙ্গালী, একটি গুজরাটি, কাহারও সঙ্গে তাহার বিশেষ ভাব হয় নাই। বাঙ্গালী বধূটিকে দেখিয়া তাহার নিজের কয়েক বৎসর আগেকার কথা মনে হইতেছিল। সেই খাওয়া-ছোঁওয়া লইয়া বিচার, সেই সব বিষয়ে খুঁতখুঁতানি, সেই সব বিষয়ে সন্দেহ। এক রকম না খাইয়াই তাহার দিন কাটিতেছিল। সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে, তাহারও প্রায় সেই অবস্থা। কোনমতে টিনের দুধ একটু করিয়া খাইয়া সে বেচারী প্রাণ-ধারণ করিতেছিল। মায়ার সঙ্গে ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রচুর ছিল, মেয়েটিকে দিতে তাহার ইচ্ছা করিত, কিন্তু পাছে মেয়ের মা বিরক্ত হন, এই ভয়ে সে লোভ সংবরণ করিয়া চলিত। ভদ্রমহিলা মায়াকে মেমসাহেবের কাছাকাছিই একটা কিছু মনে করিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধেও তাঁহার ছোঁয়াছুঁয়ির বিচারের অন্ত ছিল না।

নিরঞ্জন মেয়ের পাশে আসিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত কি ভাবছ?"

মায়া বলিল, "পিসীমাকে নিশ্চয়ই কাকারা কলকাতায় নিয়ে এসেছে, না বাবা?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আনারই ত সম্ভাবনা। যাক, শুধু শুধু ভেবে লাভ কি? আর কয়েক ঘণ্টা পরে সব জানাই যাবে। মাঝে এই রাত্রিটা বই ত নয়?"

মায়া বলিল, "জিনিষগুলো সব গুছিয়ে রাখতে হবে। সব চারিদিকে ছড়িয়ে আছে।"

ষ্টীমারের শেষের রাত্রিটা বড়ই বিরক্তিকর। সময় আর যেন কাটিতেই চায় না। মায়া যে কতবার উঠিল, বসিল, ঘড়ি দেখিল, তাহার ঠিকানা নাই। অবশেষে কোনমতে রাত কাটিয়া ভোরের আলো দেখা দিল।

একলা মানুষ, গুছাইতে তাহার বেশী সময় লাগিল না। চা খাইয়া ডাঙ্গায় নামিবার কাপড়-চোপড় পরিয়া, সে বসিয়া বসিয়া সঙ্গিনীটির কাণ্ডকারখানা দেখিতে লাগিল। তাঁহার কাজ আর ফুরায়ই না, একটা বাক্স দশবার খোলেন আর বন্ধ করেন। মেয়েটিকে একবার এক জামা পরাইলেন, আবার কি কারণে সেটা পছন্দ না হওয়ায় খুলিয়া রাখিলেন। মেয়ে তারস্বরে আপত্তি জানাইতে লাগিল।

দেখিয়া দেখিয়া আর যখন তাহার ভাল লাগিল না, তখন মায়া উঠিয়া ডেকে চলিয়া গেল। নিরঞ্জনও ডেকেই ছিলেন। বলিলেন, "যে কারণেই আসি, অনেককাল পরে বাংলা দেশের মাটি দেখে ভারি আনন্দ হচ্ছে।"

মায়া বলিল, "আমার কেবলি মনে হচ্ছে বাবা, পিসীমা অনেকটা ভাল আছেন। তা না হলে আমার মন এত হাল্কা লাগত না।"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন, "মন কি আর সব সময় সত্যি কথা বলে মা? আমরা যা চাই, মন সেটাতেই সায় দেয় বেশীর ভাগ সময়েই।"

কলিকাতার ঘাটে জাহাজ লাগিতেই মহা কোলাহল সুরু হইয়া গেল। নিরঞ্জন বলিলেন, "খোকার মত একটা কাকে দেখা যাচ্ছে যেন?"

মায়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ছোটকাকাই ত। এদিকের লম্বা ছেলেটাকে বিজয় ব'লে মনে হচ্ছে; বাবাঃ, কম লম্বা হয়নি ত, অজয়কেও ছাড়িয়ে গেছে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "ভাল, লম্বা-চওড়া হলে তবু একটু আশা থাকে যে বাপের মত অকালমৃত্যু হবে না।"

নামার গোলযোগে খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। কাঠগড়া পার হইবার পর খোকা এবং বিজয় তাড়াতাড়ি আসিয়া হাজির হইল। মায়াকে দেখিয়া দুজনে ত একেবারে অবাক্! এই নাকি সেই মায়া!

মায়া কিন্তু আগেকারই মত ছুটিয়া গিয়া তাহাদের কাছে দাঁড়াইল, ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমা এখন কেমন আছেন ছোটকাকা?"

খোকা বলিল, "নাড়ানাড়িতে একটু যেন খারাপই মনে হচ্ছিল, কিন্তু কাল থেকে আবার বেশ খানিকটা ভালই মনে হচ্ছে।"

মায়া খুশী হইয়া বলিল, "দেখলে বাবা, মন মাঝে মাঝে সত্যি কথাও বলে।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহারা বাড়ী আসিয়া পৌছিল। ইন্দুর অবস্থা এখন আর বিশেষ আশঙ্কাজনক নয়। তবে বেশী কথাবার্ত্তা বলিতে বা উত্তেজিত হইতে ডাক্তার তাহাকে বারণ করিয়া রাখিয়াছেন। সে মায়াকে এবং নিরঞ্জনকে দেখিয়া একটু হাসিল মাত্র। মায়ার জ্যাঠাইমা বলিলেন, "নাওয়া-খাওয়া ক'রে তারপর এসে একটু বসিস্। এখন ত তবু কিছু ভাল, যা দশা নিয়ে এল, আমরা ত ভয়েই মরি।"

মায়া জ্যাঠাইমার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। যাইবার সময় ইহাকে দেখিয়া গিয়াছিল, চওড়া লালপেড়ে শাড়ী পরা, হাতে গলায় গহনা, কপালে ও সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দু। আসিয়া দেখিল নিরাভরণ, শুভ্রবসনা বিধবার মূর্ত্তি। তাহার বুকের ভিতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়া উঠিল। জগতে সবই পরিবর্ত্তনশীল, সুখও থাকে না, দুঃখও থাকে না, স্মৃতিও দেখিতে দেখিতে মলিন হইয়া আসে। জননীর বিয়োগদুঃখ সে কবে ভুলিয়া গিয়াছে, জীবনের আনন্দে সে এখন ভরপুর। জ্যাঠাইমাকে দেখিলেও ত মনে হয় না শোকের আগুন তাঁহাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে, অথচ কয়েকটা বৎসর আগে স্বামী-বিহীন জীবন হয়ত তিনি কল্পনাও করিতে পারিতেন না। প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু সত্যই মৃত্যুকে জয় করিবার ক্ষমতা মানুষের ভালবাসার আছে কি? চিরদিনের মত যে চোখের আড়াল হইয়া গেল, জীবনের বিচিত্র লীলার মধ্যে কোথাও যাহার সঙ্গে যোগস্থাপনের সম্ভাবনা রহিল না, তাহাকে মনের মধ্যে কতক্ষণ মানুষ ধরিয়া রাখিতে পারে? তাহার বিয়োগে যে দারুণ শূন্যতার সৃষ্টি হয় নিজের অজ্ঞাতে কখন তাহা আবার পূর্ণ হইয়া উঠে, মানুষ জানিতেও পারে না।

মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার জ্যাঠাইমা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সে কি চিন্তা করিতেছে। একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার দশা দে'খে মুখ কাল করছিস্ মা? ঘরে ঘরেই ত এই। তোরা সব সুখে থাক্, তোদের দে'খে মরতে পারলেই আমাদের ঢের। অজয়টা কেমন আছে? একখানা চিঠিও কি দিতে পারে না?"

মায়া বলিল, "তার কথা আর ব'লো না জ্যাঠাইমা। ব'লে ব'লে হায়রান হয়ে যাই, ছেলের কানেই ওঠে না কথা। বলে, রোজ নাইছি, খাচ্ছি, ঘুমচ্ছি, এ আর কত লিখব?"

অজয়ের মা বলিলেন, "নিজে ছেলের বাপ হলে তবে বুঝতে পারবে, তার আগে আর পারবে না। সন্তান ভাল আছে এই খবরটুকু জানবার জন্যেই যে মা-বাপের প্রাণ কত ছট্‌ফট্ করে, তা আর ব'লে কি বোঝাব? শরীর কেমন তার?"

মায়া চুলের কাঁটা খুলিতে খুলিতে বলিল, "শরীর ত বেশ ভালই দেখি, অসুখ-বিসুখ একদিনও হয়নি। এখানকার চেয়ে মোটা হয়েছে খানিকটা। আচ্ছা জ্যাঠাইমা, জয়ন্তীর শ্বশুরবাড়ী এখান থেকে কত দূর? তোমার কাছে আসে না?"

জ্যাঠাইমা বলিলেন, "বেশী আসতে আর পারে কই? শাশুড়ীটা বড় দজ্জাল, সারাক্ষণ পেছনে লেগে থাকে। তার উপর কোলে কচি মেয়ে। তোর পিসীর অসুখ শুনে একদিন এসেছিল। আজ তুই আস্‌বি ব'লে ত খবর পাঠিয়েছি, দেখি আসে কি না। তোদের দে'খে সত্যি হিংসে হয়, বেশ আছিস্ বাছা। মেয়েগুলোর বিয়ে দিয়ে শুধু শুধু ভোগ বাড়ান। তখন যদি পড়াতে পারতাম, তাহলে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার কোনো দরকার হত না। তা ওঁর মত হল কই?"

স্নানাহার করিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল, তাহার পর মায়া গিয়া ইন্দুর ঘরে বসিল। তাহার তখন একটু তন্দ্রার মতন আসিয়াছে, পাশে বসিয়া একজন ঝি তাহাকে বাতাস করিতেছে। মায়া ঝিটাকে উঠিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া, নিজে পাখা হাতে করিয়া বসিল।

খানিক পরে চোখ খুলিয়া মায়াকে দেখিয়া, ইন্দু একটু হাসিয়া বলিল, "কতক্ষণ ব'সে আছিস্?"

মায়া বলিল, "এই মিনিট-পাঁচ হবে বড়-জোর। আজ তুমি কেমন আছ পিসীমা?"

ইন্দু বলিল, "একই রকম ত লাগে। এখানে এসে প্রথম কয়েকদিন বড় বাড়াবাড়ি হয়েছিল, এ যাত্রা টিঁকব ব'লে কেউ আর ভাবেনি। যাক, না টিঁকলেই বা কি? মেজদা কোথায়?"

মায়া বলিল, "খেয়ে-দেয়ে ছোট কাকার সঙ্গে কথা বল্‌ছেন। এখনি আসবেন তোমার কাছে। ভালর দিকে যখন যাচ্ছে, তখন নিশ্চয় সেরে উঠবে। কিই বা তোমার বয়েস যে এখনি টিঁকবে না?"

ইন্দু বলিল, "বয়েসে কি এসে যায় রে? তোর মায়ের কত বয়েস

হয়েছিল? দাদারই বা কি এমন বয়েস হয়েছিল? যার যখন ডাক পড়ে।"

মায়া বলিল, "ও সব কথা রাখ এখন, তাড়াতাড়ি ক'রে সেরে ওঠ, তোমার সঙ্গে আমার ঢের পরামর্শ আছে। একবার গ্রামে যেতে হ'বে, সেখানে মেলা কাজ।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "গ্রামে আবার তোর কি কাজ? তা কাজ থাক বা নাই থাক, চল্ একবার। সবাই তোকে দেখতে কত ব্যস্ত, দেখলে খুব খুসী হবে।"

মায়া বলিল, "আমি আর এমন একটা কি আজব চিজ যে সবাই আমাকে দেখতে এত ব্যস্ত? দেখেছে ত ঢেরই।"

ইন্দু বলিল, "তুই কি আর সেই আগের মানুষ আছিস? কত বদ্‌লে গিয়েছিস্। যত বা না বদ্‌লেছিস্, মানুষে গুজব তুলেছে তার দশগুণ। তোকে গাউন-পরা মেম ব'লেই তারা এখন মনে করে, শাড়ী পরতে দেখলে অবাক্ হয়ে যাবে। তুই নাকি ঘোড়ায় চড়িস্, মোটর হাঁকাস্, লাটসাহেবের বাড়ী গিয়ে বল্ নাচিস্, আরও কত কি।"

মায়া বলিল, "বেশ বাপু, কিছু না করতেই এত! তবু যদি যা-কিছু করবার সুবিধা আছে সব করতাম, তা হলে কি যে আমার নামে বেরোত, তাই ভাবছি।"

ইন্দু বলিল, "অসুখে পড়বার দিনকয়েক আগে প্রভাসের মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বলে কি, হাঁগা, তোমাদের মেয়ে নাকি বিলাত যাচ্ছে? সে আজকাল নাকি বাংলায় কথা বলতে পারে না, মুরগী ছাড়া খায় না? সাবিত্রীর মেয়ে শেষে এমন হ'ল? বাপের রক্তের গুণ আর কি?"

মায়ার মুখ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। সে বলিল, "যাক্, গুজব না উঠেছে যার সম্বন্ধে, এমন মানুষ আর আছে কোথায়? তবে সাবিত্রীর মেয়ের অনুপযুক্ত এখনও কিছু করিনি। এবার গ্রামের লোককে চোখে আঙুল দিয়ে সেটা বেশ ক'রে বুঝিয়ে আসব।"

নিরঞ্জন আসিয়া ঢোকাতে এই অপ্রিয় আলোচনাটা থামিয়া গেল। তিনি ইন্দুকে সহজ ভাবে কথা বলিতে দেখিয়া খুসী হইয়া বলিলেন, "এই যে, অনেকটাই ভাল আছিস্ দেখছি। তাই ব'লে ভাইঝির সঙ্গে গল্প ক'রে জ্বর বাড়িয়ে বসিস্ না যেন। এইবার সেরে ওঠ, আর ও-গ্রামের মুখো হতে দিচ্ছি

না, সোজা আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। মায়াও বাঁচবে, তোরও অসুখ-বিসুখ এত করবে না।”

ইন্দু হাসিয়া বলিল, “কেন মেজদা, তোমার বর্ম্মা মুলুকে কি মানুষের অসুখ করে না, না মানুষ মরে না?”

নিরঞ্জন বলিলেন, “অসুখও করে, মরেও বটে। তবে গ্রামে ব'সে তোমরা যে রকম ইচ্ছামরণ করতে পার, সেটার সুবিধা ওখানে হয় না।”

ইন্দু বলিল, “আচ্ছা, দেখা যাক, আগে সেরেই ত উঠি। এই বয়সে আর দেশ ছেড়ে থাকতে ইচ্ছা করে না। নেহাৎ তোমরা জেদ কর ত কলকাতায়ই থাকব না-হয়।”

সিঁড়িতে এমন সময় বেশ একটা কলরব শোনা গেল। কচি ছেলের কান্না, নারীর কণ্ঠস্বর, গাড়োয়ানের চীৎকার, প্রভৃতিব এক বিচিত্র সমন্বয়। মায়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, “জয়ন্তীটা আসছে বোধ হয়, একটু গিয়ে দে'খে আসি।”

নিরঞ্জনও উঠিয়া বলিলেন, “একটু কেন আর, বেশ খানিকক্ষণের জন্যেই যাও। এঘরে এখন আর আড্ডা ক'রো না। ইন্দুকে বেশী tired ক'রে তোলা উচিত হবে না। ওর ঝিটাকে ডেকে দাও গিয়ে।”

মায়া ঝিকে ডাকিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি জ্যাঠাইমার শুইবার ঘরে গিয়া ঢুকিল। জয়ন্তী ততক্ষণে ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। তাহার চেহারা অনেক খারাপ হইয়া গিয়াছে, গায়ের রঙের আর সে উজ্জ্বলতা নাই, রোগাও হইয়া গিয়াছে। পোষাক-পরিচ্ছদের সে বাহার, সে সৌষ্ঠব আর নাই, একটা সেমিজের উপর আধময়লা একখানা শাড়ী জড়াইয়া আসিয়াছে। সঙ্গে একটি বছর-আড়াইয়ের ছেলে, কোলে একটি শিশুকন্যা, মাস-আটের হইবে। ছেলেটি দেখিতে মন্দ নয়, মেয়েটি অত্যন্তই রোগা।

মায়া ঢুকিবামাত্র জয়ন্তী বলিল, “কি গো, চিন্‌তে পার?”

মায়া বলিল, “যা মূর্ত্তি বার করেছ, চিন্‌তে না পারলেও কিছু অন্যায় হত না। মেয়েটিও দেখছি তোমারই দলের।”

জয়ন্তী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, “যেমন অদৃষ্ট, তেমনি চেহারা। ওটা ত হয়ে অবধি ভুগছে আর ভোগাচ্ছে। তুই ত দিব্যি দেখতে হয়েছিস্ রে! কে বল্‌বে বাঙালীর মেয়ে। ঠিক যেন কাশ্মীরী রাজকন্যা।”

মায়া বলিল, “তারা কি এত খ্যাদা হয়?”

হাস্য-পরিহাসে সকলের মনের ভারটা একটু কমিয়া গেল।

সপ্তাহ-খানেক কাটিয়া গিয়াছে। ইন্দু অল্পে অল্পে সারিয়া উঠিতেছিল। তবে এখনও নাড়ানাড়ি করিবার মত অবস্থা হয় নাই।

নিরঞ্জনের পক্ষে আর বেশীদিন কাজকর্ম্ম ফেলিয়া বসিয়া থাকা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। মায়াকে রাখিয়া তিনি চলিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু তাহাকে আবার পরে লইয়া যাইবে কে? আবার ইন্দু ভাল করিয়া সারিয়া উঠিবার আগেই যে যার নিজের পথে চলিয়া যাওয়া ভাল দেখায় না। গ্রামে আর তাহাকে রাখিবার ইচ্ছা নিরঞ্জনের নাই। রেঙ্গুনে যদি সে নিতান্তই না যাইতে চায়, তাহা হইলে কলিকাতায় তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে মিলিয়া কথা হইতেছিল। মায়ার জ্যাঠাইমা বলিতেছিলেন, "এরই মধ্যে কি আর যাওয়া হয়? কতদিন পরে বলে এলে। ঠাকুরপো না থাকতে পার, মায়াকে রেখে যাও। ঠাকুরঝি ভাল ক'রে সেরে উঠুক, তারপর ও যাবে এখন। তোমরা আসার পর থেকেই দেখছ না, কেমন তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা যেন রেখে গেলাম, এরপর ও যাবে কার সঙ্গে?"

তাঁহার বৌদি বলিলেন, "ও মা, নিয়ে যাবার লোকের ভাবনা? ছোটঠাকুরপোই নিয়ে যেতে পারে। বিজুও বর্ম্মা দেখবার জন্যে নাচছে কতদিন থেকে।"

মায়া বলিল, "তাই দিনকয়েক থাকি না-হয় বাবা। কেউ না নিয়ে গেলেই বা কি? জাহাজে একলা যেতে কিছু মুস্কিল নেই।" এখনই চলিয়া গেলে তাহার গ্রামে যাওয়া বা আর কিছু করা ঘটিয়া উঠিবে না।

নিরঞ্জন বলিলেন. "তা ঠিক। তবে একলা যাবার দরকার হবে না। আমি গেলেই শিবচরণ আসবে, ছেলেকে receive করতে, তাদের সঙ্গেই যেতে পারবে।"

বাণীর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া মায়ার হাসি পাইল। জোগাড় হইয়া উঠিতেছে সেই রকম বটে। দেবকুমারের সঙ্গে একত্রে রেঙ্গুনে গিয়া নামিলে তাহার সঙ্গিনীরা আর রক্ষা রাখিবে না। তাহার হাড় জ্বালাতন করিয়া খাইবে।

মায়ার জ্যাঠাইমা বলিলেন, "জয়ন্তী ত ক'দিন এসে থাকবার জন্তে অস্থির হয়ে উঠেছে। মায়ার সঙ্গে একটু সেদিন ভাল ক'রে কথাও বলতে পারল না। আমি ত বললে বেয়ান-ঠাকরুণ কথা কানেই নেন না। ঠাকুরপো যদি বেহাইকে একখানা চিঠি লিখে গাড়ী পাঠিয়ে দাও, তা'হলে এখনি মেয়েটা আসতে পায়। তোমায় তারা খুব খাতির করে।"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তা না-হয় দিচ্ছি। আমার কথা ত তখন তোমরা কেউ শুনলে না, এখন দেখছ ত মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কত সুখ?"

জয়ন্তীর মা বলিলেন, "বিয়ে না দিয়েই বা করি কি ভাই? তোমার মেয়ের মতন শিক্ষা দিতে পারতাম ত বিয়ে না দেওয়া চলত। এদিকও না ওদিকও না, শুধু শুধু বসিয়ে রেখে লাভ কি?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "যাক, যা হয়ে গেছে তা হয়েই গেছে। এখন জামাই বাবাজী যদি রোজগার করতে পারেন ভাল ক'রে তবেই। নইলে ছেলেপিলে নিয়ে চিরকাল কষ্ট পাবে।"

২৫

ছোট প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানি ক্রমেই মায়াদের গ্রামের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। মাঠ, বন, গ্রাম, নদী দুইপাশে নাচিতে নাচিতে তীরবেগে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত, বাহিরের দিকে বড় বেশী মনোযোগ কেহ খরচ করিতেছে না।

একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ীর ভিতর ইন্দু, মায়া এবং তাহার ছোটকাকা বসিয়া। ইন্দুর শরীর এখনও সারে নাই, যদিও রোগশয্যা হইতে সে উঠিয়া বসিয়াছে। গ্রামের হাওয়ায় স্বাস্থ্য খানিকটা ভাল হইবে এই আশায়, এবং খানিকটা মায়ার আগ্রহাতিশয্যে তাহারা গ্রামে চলিয়াছে।

নিরঞ্জন কয়েকদিন হইল রেঙ্গুনে ফিরিয়া গিয়াছেন। মায়া মাসখানেক পরে যাইবে বলিয়াছে, সম্ভব হইলে ইন্দুকেও লইয়া যাইবে।

মায়াতে এবং ইন্দুতে কথা হইতেছিল। মায়া বলিতেছিল, "কয়েকটা বছরের মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কেমন যেন উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে পিসীমা, কিছুই যেন আর আগের চোখে দেখতে পারছি না।"

ইন্দু বলিল, "মেয়েমানুষের কপালই এই রকম। একটা জীবনের মধ্যে কত রকম তার অদলবদল। আমাদেরও বিয়ের পর কম ঝাঁকানি খেতে হয় নি। তোর বিয়ের আগেই হল, এই যা। মনে আছে গ্রাম ছেড়ে যেতে কি রকম কেঁদেছিলি? আর এখন বোধহয় সকলের পাড়াগেঁয়ে কাণ্ডকারখানা দে'খে তোর হাসিই পাবে।"

মায়া বলিল, "তুমিও দেখছি আমাকে ভয়ানক রকম মেম ঠিক ক'রে রেখেছ। আমার বরং ভয় হচ্ছে আমার রকম সকম দে'খে সবাই খুব অদ্ভুত কিছু না ভাবে। জুতোটা খুলেই ফেলি, কি বল?"

ইন্দু বলিল, "ঘরে গিয়ে সে যা হয় করিস্, এখন থাক। শেষে ইষ্টিশানের কাঁকর পায়ে ফুটে মরবি। এখন জুতো মোজা দেখা লোকের চোখে সয়ে গেছে। কলকাতা থেকে সদাসর্ব্বদা মানুষ আস্‌ছে যাচ্ছে, মেয়েতে জুতো মোজাও কত পরছে। আসলে তোর বিয়ে হয়নি দে'খেই সব ফুসুর ফুসুর সুরু করবে। তা তাতে রাগ করিস্ না।"

মায়ার মুখ লাল হইয়া উঠিল। বলিল, "পিসীমা, তোমরা যাই মনে কর, গ্রামটাকে, গ্রামের লোকদের আমি এখনও ভালবাসি। কিন্তু এই সারাক্ষণ পরের কথা নিয়ে থাকাটা আমার একটুও ভাল লাগে না। কার বারো বছরে বিয়ে হচ্ছে আর কার চব্বিশ বছরে হচ্ছে, তা নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কি দরকার তাদের? তাদের ত আর বিয়ে দিতে হবে না?"

ইন্দু ভাইঝির কথার ঝাঁঝে একটু হাসিয়া বলিল, "অত চটিস্ কেন? সহরে তোদের কত রকম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। থিয়েটার আছে, বায়োস্কোপ আছে, নাটক নভেল পড়া আছে। কাজেই পরের খবরে তোদের অত দরকার নেই, খবর নেবার সময়ও নেই। গ্রামে ত ঘরের রান্না-খাওয়ার কাজ হয়ে গেলে আর কোন কর্ম্ম নেই, কাজেই পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ক'রে মুখটা একটু বদলায়। তা না হলে কি মানুষ বাঁচে?"

মায়া বলিল, "চরকা কাটতেও ত পারে। নিজেদেরও উপকার হয়, পরেরও অপকার হয় না।"

তাহার ছোটকাকা বলিল, "নিজের মঙ্গল যাতে, তা যদি মানুষ অত সহজে বেছে নিত, তা হলে ত জগৎসংসারে অধিকাংশ problem-ই মিটে যেত। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ তা ত প্রায় সব মানুষেই জানে, কিন্তু কার্য্যত করতে চায় ক'জন?"

মায়া বলিল. "কেন যে করে না তাও ত বুঝি না।"

ইন্দু বলিল, "এরই মধ্যে কি আর সব বুঝবি রে, এখনও জগতের অনেক জিনিষ বুঝতে বাকি আছে। নিজেরই মনের সঙ্গে কত লড়াই ঝগড়া যে করতে হয়, তা বেঁচে থাকলে বুঝতেই হবে।"

স্টেশন নিকটে আসিয়া পড়ায় তাহাদের আলোচনা থামিয়া গেল। এদিক্ ওদিক্ ছড়ানো জিনিষপত্র আবার গুছাইয়া তুলিয়া, তাহারা ট্রেণ থামিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ইন্দু বলিল, "মনে ক'রে গাড়ী যদি পাঠায় তবেই, নইলে সেই গরুর গাড়ী ক'রে যেতে গায়ে-গতরে ব্যথা হয়ে যাবে। একেই ত বিছানায় শুয়ে প'ড়ে থেকে থেকে গাঁটে গাঁটে ব্যাথা ধ'রে গেছে।"

গ্রামে মাত্র দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী। আগে হইতে জোগাড় করিয়া না রাখিলে তাহা পাইবার আশা করা দুরাশা মাত্র।

মিনিট-পাঁচের মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রাম্য স্টেশনে আসিয়া ট্রেণটি দাঁড়াইয়া পড়িল। থামিবে মাত্র দুই মিনিট। কাজেই ধীরে সুস্থে নামিবার সময় পাওয়া যায় না, কোনমতে হুড়াহুড়ি করিয়া, পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি লইয়া সকলে নামিয়া প'ড়ল। যাত্রী বেশী নামিল না, তবু গ্রামের স্টেশনটি যেন সরগরম হইয়া উঠিল। গ্রামের অধিকাংশ বেকার মানুষই ট্রেণ আসিবার সময় স্টেশনে আসিয়া বসিয়া থাকে। কে গেল, কে আসিল, ট্রেণের কামরার জানালার পথে সারি সারি অপরিচিত মুখ, এই সকল দেখিয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের বৈচিত্র্যহীনতার দুঃখ কিছু যেন কাটিয়া যায়।

নিরঞ্জনদের বাড়ীতে যে বিধবা প্রৌঢ়া সপরিবারে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারই পুত্রকে ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করিবার জন্য টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল। ইন্দু নামিয়া পড়িয়াই ব্যগ্রভাবে চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে বলিল, "নিস্তার পিসী যদি আক্কেল ক'রে গাড়ী না পাঠায়, তা হলেই গেছি। মেয়েটার কষ্টের একশেষ হবে।"

মায়া বলিল, "তুমি ত বেশ পিসীমা। নিজের ভাবনা ছেড়ে আমার ভাবনা ভাবতে ব'সে গেলে? দু'পা হাঁটলে আমি গ'লে যাব নাকি? তুমি রোগা মানুষ, তোমার কষ্ট হবে ঢের বেশী। ছোটকাকা, একটু এগিয়ে দেখ না গাড়ী এসেছে কি না। মাগো, স্টেশনটা কি রকম বদ্‌লে গেছে। আগে ত টিনের shed ছাড়া কিছুই ছিল না।"

যাহা হউক গাড়ী খুঁজিতে আর যাইতে হইল না। খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী পরা একটি যুবক হঠাৎ অগ্রসর হইয়া আসিয়া ইন্দুকে বলিল, "এই যে ইন্দু পিসী, আমি আপনার জন্যে গাড়ী নিয়ে এসেছি।"

ইন্দু বলিল, "ওমা, প্রভাস যে! এখনও রয়েছিস? আমি শুনেছিলাম অনেকদিন আগেই কাজের জায়গায় চ'লে গিয়েছিস।"

প্রভাস একবার মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল, "গিয়ে ত ছিলাম, কিন্তু মা আবার অসুখ বাধিয়ে বসলেন, কাজেই কয়েক দিনের জন্যে ছুটি নিয়ে এলাম। আজই আবার যাচ্ছি।"

ইন্দু বলিল, "যাই নাকি? ভাগ্যে ইষ্টিশানে এসেছিলি, তাই ত দেখা হল! ক'টার সময় ট্রেণ?"

প্রভাস বলিল, "এই ঘণ্টাখানেক পরে। আমি আর বাড়ী যাচ্ছি না, স্টেশনেই ঘুরে ফিরে কাটিয়ে দেব। তোমরা আস্‌ছ শুনে গাড়ী নিয়ে একটু আগে আগেই এসেছি।"

ইন্দু একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিল, "নিস্তার পিসী বুঝি এইটুকু আর ক'রে উঠতে পারলেন না?"

প্রভাস বলিল, "না, এ ত্রুটিটা বোধ হয় তাঁর ইচ্ছাকৃত নয়। তাঁর বড় ছেলেটা কয়েক দিন হল জ্বরে ভুগছে, তাকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমিই নিজে ব'লে গাড়ী নিয়ে এলাম, নইলে ছোট ছেলেটা আস্‌ত বোধ হয়।"

মায়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। প্রভাসকে দেখিয়া কেন জানি না, তাহার গলার কাছটা বেদনায় টন টন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সাবিত্রীকে বড় বেশী করিয়া তাহার মনে পড়িতেছিল। এই গ্রামের বাড়ীর সঙ্গে কি গভীরভাবে তাহার মায়ের স্মৃতি জড়ান! সেই বাড়ী, সেই গ্রাম, সেই পথঘাট, কিন্তু ইহাদের মাঝখানে সেই অতিপ্রিয়, অতি পরিচিত মঙ্গলমূর্ত্তিটি কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, এ যেন শুধু বহুমূল্য ফ্রেমখানি পড়িয়া আছে, ভিতরের ছবিখানি নাই। প্রভাসের সঙ্গে তাহার মা মায়ার বিবাহের কত না চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়াই তিনি পরপারে চলিয়া গেলেন। প্রভাসকে দেখিয়া সেই জন্যই কি তাহার মনে এতটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল? তাহাদের দুইজনের এখন দুই পথ, হঠাৎ আজ সাক্ষাৎ হইয়া গেল নিতান্তই ঘটনাচক্রে, না হইলে দেখা হইবার কিছু কথা নয়, আর কখনও হইবে কি না কিছুই ঠিকানা নাই।

হঠাৎ তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া প্রভাস বলিল, "ইন্দুপিসী, গাড়ীতে চলুন, রোগা শরীরে কতক্ষণ আর এই রোদে দাঁড়িয়ে থাকবেন ?"

ইন্দু বলিল, "তোর ট্রেণের ত এখনও দেরি আছে প্রভাস, তুই চল্ না দের সঙ্গে, মিনিট পনেরো কুড়ি ব'সে আবার ফিরে আস্‌বি। সঙ্গে ত ার মাল বেশী নেই ?"

প্রভাস বলিল, "বেশী মাল পাব কোথা থেকে ? তা চলুন।"

জিনিষপত্র লইয়া তাহারা গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। মায়া হঠাৎ লিয়া বসিল, "প্রভাস-দা, আপনি আমাকে চিন্‌তে পারেননি একেবারেই ?"

প্রভাস একটা পোঁটলা হাতে চলিতে চলিতে একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িল। হার পর পূর্ণদৃষ্টিতে মায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "চিন্‌তে পারি নি কি কম ? আমি ত আর অন্ধ নই ? তবে গায়ে প'ড়ে কথা বল্‌লে হয়ত কিছু ন করবে, এই ভয়ে কথা বলিনি।"

মায়া বলিল, "চার-পাঁচটা বছর বাইরে ছিলাম ব'লেই আমি এমন কি একটা হয়ে উঠেছি যে, আমার সঙ্গে কথা বল্‌তেও ভয় করে ? এখানকার বুড়ো-বুড়ীরা না-হয় এ-সব বাজে কথা ভাবতে পারে, তাই ব'লে আপনিও ভাববেন ? সকলের সঙ্গেই আমার নূতন ক'রে পরিচয় করতে হবে নাকি ?"

প্রভাস আবার চলিতে সুরু করিয়া বলিল, "চার-পাঁচ বছরটা কি আর কম ? বিশেষ ক'রে এই বয়সে ? নিজের কতখানি পরিবর্ত্তন হয়েছে তাই য়েই আন্দাজ করতে পারি, অন্যেরও কতখানি হওয়া সম্ভব। বাইরে থেকে দেখলে হয়ত এই খদ্দরের ধুতি-চাদর ছাড়া অন্য কিছু পরিবর্ত্তন দেখতে পাবে না, কিন্তু ভিতরটা আমার একেবারে সবটাই যেন বদ্‌লে গেছে।"

মায়া হঠাৎ একটুখানি গম্ভীর হইয়া গেল, বলিল, "তাই না কি ? আমার বরং বাইরেটাই খানিকটা বদ্‌লে গেছে, মনের ভিতরে খুব বেশী কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে ব'লে মনে হয় না।"

প্রভাস বলিল, "নিজের ভিতরের বদল আবার অনেক সময় নিজেও মানুষ বোঝে না। হঠাৎ আগেকার একটা position-এ ঠিক ফিরে আসার চেষ্টা করলে তখন তফাৎটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই যে গ্রামে এলে, এতেই ভাল ক'রে বুঝতে পারবে কতখানি দূরে তুমি স'রে গেছ।"

ইন্দু মাঝখানে তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "নে, নে, গাড়ীতে উঠে গল্প কর্ না বাপু ? রোদে ত আমার চাঁদি উড়ে যাবার জোগাড় হল।"

বাস্তাবকই রৌদ্রের তেজ অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। আগন্তুকদের মনে হইতেছিল, যেন মাথার উপর অগ্নিশর বর্ষণ হইতেছে। গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া মনে হইল যেন বাঁচিয়া গেল।

পল্লীগ্রামের অল্পপরিসর উঁচু নীচু রাস্তা দিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিতে দিতে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। এ সবই তাহার জন্মাবধি পরিচিত। এই ছোট পুকুর, এই চারিপাশে নারিকেল গাছের সার, এই মাঠের মাঝে বুনো ফুলের ঝোপ, এই বাব্‌লা ফুলের সাজ পরা গাছগুলি অতি পুরাতন, কিন্তু ইহাদের দেখিয়া যে আনন্দ সে আজ পাইতেছে তাহা একেবারে নূতন, একেবারে অভূতপূর্ব্ব। এই মাঝের কয়েকটা বৎসরের সুখৈশ্বর্য্য ভোগ তাহার মনকে এমন করিয়া ত নাড়া দেয় নাই, রূপার কাঠির স্পর্শে তাহার মানসী অন্তরলোক-বাসিনীটি যেন ঘুমাইয়াই পড়িয়াছিল। আজ জাগিয়া উঠিল সে কিসের ছোঁয়ায়? সোনার কাঠি খুঁজিয়া পাইল সে কিসের মধ্যে?

তাহারা বাড়ী আসিয়া পৌছিল। ইন্দু বলিল, "ওমা, এই দুমাসও হয়নি ঘর ছেড়েছি, এরই মধ্যে ছিরি হয়েছে দেখ! প্রাণের দরদ যাদের নেই, তাদের হাতে কি আর ঘর-দোরের যত্ন হয়? ফুলগাছগুলো সুদ্ধু যেন মরতে বসেছে। মায়া দেখ্, তোর পেঁপেগাছ কত বড় হয়েছে। ওগুলো গরুতে নেহাৎ নেড়া মুড়ো করতে পারেনি ব'লে এখনো অবধি টিঁকে আছে।"

সকলে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িতেই একজন বিধবা রমণী তাড়াতাড়ি সদর দরজার কাছে বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহার পিছনে একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে, তাহার আপাদমস্তক র‍্যাপারে ঢাকা। বিধবা বলিলেন, "এস বাছা এস। রঘুটার জর নিয়ে এত ভুগছি যে কোনোদিকে আর চোখ কান দেবার সময় নেই। তবু তোমার পাশের ঘরটা ঝাঁটপাট দিয়ে রেখেছি। তোমার গরুর দুধ ত এতদিন পাড়ার ছেলেপিলেদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছিলাম, আজ রেখে দিয়েছি। এই বুঝি নাতনী? ওমা এ যে একেবারে রাজরাণী। বৌয়ের রূপের নামডাক ছিল, তা নাতনী তাকেও টেক্কা দিয়েছে। এরপর জামাই আন বাছা, মস্ত ডাগরটি হয়েছে, আর ভাল দেখায় না।"

বক্তৃতার প্রথম কিস্তিতেই মায়ার পিত্ত জলিয়া গেল, কাকার পিছন পিছন সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িবার জোগাড় করিতেছে দেখিয়া ইন্দু ফিস্ ফিস্

করিয়া বলিল, "বুড়ীকে একটা প্রণাম ক'রে যা, নইলে হাজার রকম কথা বার করবে।"

বুড়ীকে প্রণাম করিবার ইচ্ছা মায়ার বিন্দুমাত্রও ছিল না, তবু পিসীর কথায় বৃদ্ধার পায়ের কাছে নত হইয়া একটা নমস্কার করিয়া সে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল।

পূর্ব্বকালে যে ঘরখানি তাহার মায়ের শুইবার ঘর ছিল, এ সেই ঘর। সংস্কারের অভাবে একটু যেন জীর্ণ, আসবাবপত্রের মধ্যে তক্তপোশ এবং আল্‌নাটা ছাড়া আর কিছুই নাই। মায়া জুতা খুলিয়া রাখিয়া তক্তপোশটার উপর বসিল। মিনিট-খানেকের মধ্যে ইন্দু এবং প্রভাসও আসিয়া জুটিল। ইন্দু বলিল, "তোর জন্যে ওদিকের ছোট ঘরটায় জল এনে রেখেছে, একেবারে হাত মুখ ধুয়ে বোস্ না?"

মায়া ব'লিল, "যাচ্ছি দাড়াও, রোদের ঝাঁঝে মাথার ভিতরটা এখনও জ্বালা করছে।"

ইন্দু বলিল, "তা ত করবেই, অনেককাল এ রোদের সঙ্গে তোর পরিচয় নেই। এককালে কিন্তু এই রোদের মধ্যেই টো টো ক'রে বেড়িয়েছিস। প্রভাস, বোস না?"

বসিবার জায়গা একমাত্র তক্তপোশখানি। তাহার উপর মায়া বসিয়া আছে বলিয়াই বোধ হয় প্রভাস তাহাতে বসিল না। একটা বিছানার পোটলার উপর বসিয়া বলিল, "ইন্দু পিসী, খুব চট্ ক'রে সেরে উঠুন, নইলে আমাদের গ্রামের বদ্‌নাম হবে।"

মায়া বলিল, "প্রভাস-দা, আপনি এত শীগ গির চ'লে যাচ্ছেন? আমি কিন্তু আশা ক'রে এসেছিলাম, আপনাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেব।"

প্রভাস একটু বিস্মিতভাবে বলিল, "কি ধরণের কাজ?"

মায়া বলিল, "মায়ের নামে আমি একটা কিছু করতে চাই, পুকুর, অতিথি-শালা, যা সবাই গ্রামের জন্যে সব চেয়ে বেশী দরকারী মনে করেন। আমি ত টাকা দেওয়া ছাড়া আর কিছু ক'রে উঠতে পারব না। কাজের দিক্‌টায় ভার আপনার ঘাড়ে চাপাব মনে করেছিলাম।"

প্রভাস বলিল, "থাকবার উপায় থাকলে আমি থেকে যেতাম। গ্রামের জন্যে মেয়েদের পাঠশালা একটি কতখানি যে দরকার, তা তোমায় একমুখে বোঝাতে পারব না। এইটাই সব চেয়ে উপযুক্ত স্মৃতি-মন্দির হবে। মাস

দুই-তিন পরে আমি আবার ফিরে আস্‌ব, কিন্তু ততদিন কি তুমি থাকতে পারবে?"

মায়া বলিল, "তিন মাস ত থাকতে পারব ব'লে মনে হয় না। বাবা এক মাসের বেশী দেরি করতে অনেক ক'রে বারণ ক'রে গেছেন।"

প্রভাস বলিল, "তাই ত। আচ্ছা অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখি, আমিও খুব চেষ্টা করব, মাঝে দুই-চার দিনের ছুটি নিয়ে আস্‌তে।"

তাহার ট্রেণের সময় হইয়া আসিতেছিল বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

২৬

দিন পাঁচ-ছয় কাটিয়া গিয়াছে। মায়াদের গ্রামের বাড়ীতে এখন লোক ধরে না। জয়ন্তী ছেলে মেয়ে লইয়া আসিয়া জুটিয়াছে, তাহার মাও সঙ্গে আসিয়াছেন। মেয়ের শরীর বড় খারাপ, গ্রামের খোলা হাওয়ায় তাহার স্বাস্থ্যের অবশ্যই উন্নতি হইবে, ইত্যাদি, নানা অছিলায় জয়ন্তীকে উদ্ধার করা হইয়াছে। অবশ্য পিছনে নিরঞ্জনের চিঠির জোর না থাকিলে কতদূর কি হইত বলা যায় না। নিস্তারিণী ঠাকুরাণী কিঞ্চিৎ কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাকে আরো একখানা ঘর ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। যাহাদের বাড়ী তাহাদের উপর ত আর জোর করা চলে না, কিন্তু বৃদ্ধা মনে মনে অত্যন্তই চটিয়া গিয়াছেন।

মায়া ক্রমেই বুঝিতেছে, এই সামান্য কয়েকটা বৎসরের অনভ্যাসে সে পল্লীজীবন হইতে কতখানি দূরে সরিয়া গিয়াছে। পদে পদে তাহার কত রকম যে অসুবিধা হইতেছে, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। সকলেই যে তাহাকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত, ইহাতে তাহার লজ্জারও সীমা নাই। ইন্দু রোগের বালাই সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া সারাদিন কোমর বাঁধিয়া ঘুরিতেছে, যদি মায়ার অসুবিধা খানিকটাও দূর করিতে পারে এই চেষ্টায়। দুপুরেই সে খাইয়া দাইয়া বাহির হইয়াছে মজুরের সন্ধানে, উঠানের মধ্যে অস্থায়ী-মত একটা স্নানের ঘর মায়ার জন্য না বাঁধিয়া দিলেই নয়, বেচারীকে এ কয়দিন রাত থাকিতে উঠিয়া পুকুরে গিয়া স্নান সারিয়া আসিতে হইতেছে। বিকালে হাত-মুখ ধুইতে হয় শোবার ঘরের মধ্যেই, তাহার পর সেই ঘর মোছার আরো এক পর্ব্ব চলে। জয়ন্তী বসিয়া বসিয়া দেখে আর হাসে। মাঝে মাঝে বলে,

"যাক, তোর কল্যাণে আমরাও রাজার হালে থাকছি, একলা এলে কেউ কি আর এত যত্ন করত ? এর সিকির সিকিও করত না।"

ভিজা গামছা মাথায় জড়াইয়া ইন্দু যেই ফিরিয়া বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙাইয়াছে, নিস্তারিণী ঠাকুরাণীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধা নিতান্তই অপ্রসন্নমুখে নিজের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ইন্দুকে দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে, এই ভরা দুপুরে কোথায় টৈ টৈ ক'রে বেড়াচ্ছিস্ ? ফের যে জ্বরে পড়বি ? দেখছিস্ না আমার ছেলেটার দশা, একদিন ভাল হয় ত ফের দশ দিন শোয়।"

ইন্দু বলিল, "না, বেশী ঘুরিনি, মধুকে ব'লে এলাম জন-কয়েক মজুর জোগাড় ক'রে নিয়ে আসতে।"

নিস্তারিণী বলিলেন, "আবার মজুর কিসের জন্যে ? ভাইঝির চানের ঘর ? রক্ষে কর, এ-সব মেমসাহেব নিয়ে গাঁয়ে আসা কেন বাছা ? তাদের সহরে থাকাই ভাল !"

ইন্দু বলিল, "তা তাদেরই বাড়ী তাদেরই ঘর, তারাই কি একবার আসবে না ? নিজেদের ব্যবস্থা ত তারা নিজেরাই করছে, অন্য কাউকে ত ক'রে দিতে হচ্ছে না ?"

তাহার কণ্ঠস্বরে বিরক্তির স্পষ্ট আভাস পাইয়া নিস্তারিণী খানিকটা দমিয়া গেলেন। বলিলেন, "তা ত ঠিকই বাছা, তোমাদের বাড়ীঘর, তোমরা আস্‌বে যাবে বৈকি ? তবে কিনা রোগা শরীর নিয়ে তোমাকে দৌড়ে বেড়াতে হচ্ছে, এই জন্যেই আমাদের বলা। নইলে কার গরজ পড়েছে বল ?"

বৃদ্ধা কথা বলিতে বলিতে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন।

ইন্দু ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘরের মেঝেতে মাদুর পাতিয়া মায়া আর জয়ন্তী শুইয়া গল্প করিতেছে। জয়ন্তীর ছেলেমেয়ে তক্তপোশের উপর দিব্য নিদ্রা দিতেছে। ইন্দু বলিল, "একটু বুঝি ঘুমোতেও নেই ? রাত্রে ত মশা আর গরম ব'লে ঘুম হয় না, দিনেই না-হয় একটু ঘুমিয়ে নিতিস্ ?"

মায়া বলিল, "যাদের ঘুমোনো দরকার তারাই যখন পাড়াময় দৌড়ে বেড়াচ্ছে, তা আমাদের কি দরকার ? নিস্তারিণী বুড়ী তোমায় কি বলছিল পিসীমা ?"

ইন্দু বলিল, "ও বুড়ীর কথায় কার কি এসে যায় ? নিজে কোথা থেকে

উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তার ঠিকানা নেই, লম্বা লম্বা কথা আছে খুব। তোমাদের দুই বোনের কি পরামর্শ হচ্ছে শুনি ?"

জয়ন্তী বলিল, "খুড়ীমার নামে সেই ইস্কুল করার কথা। আমি বলছিলাম, পুকুর প্রতিষ্ঠাই কর, ইস্কুল-টিস্কুল ত খুড়ীমা বড়-একটা পছন্দ করতেন না? নয়ত ব্রহ্মোত্তর কিছু জমি দান কর। ঐ সবে তাঁর খুব ভক্তি ছিল।"

মায়া বলিল "কতকগুলো পেটুক বামুনকে খাইয়ে কি হবে? মা যা ভালবাসতেন তাই আমি করতে চাই যদিও, তবু এটাও দেখতে হবে যে, কাজটা নিতান্ত বাজে কিছু না হয়, দেশের লোকের একটু উপকারও তাতে হয় কি না। প্রভাস-দা এখানে থাকলে কত যে সুবিধে হত, তার ঠিকানা নেই। এখানে ত এমন একটা লোক দেখি না, যার কাছে একটু পরামর্শ পাওয়া যায়।"

ইন্দু বলিল, "প্রভাসের মায়ের সঙ্গে আজ পুকুর-ঘাটে একবার দেখা হ'ল। বল্‌লে, তোর সঙ্গে দেখা করতে একদিন আসবে। মেজ ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করতে মহাব্যস্ত, তাই এ ক'দিন আসতে পারেনি।"

জয়ন্তী বলিল, "ওমা, বড় ছেলে রইল প'ড়ে, আগেই মেজ ছেলের বিয়ে ?"

ইন্দু বলিল, "প্রভাস ত এখন আর বিয়ে করতেই চায় না। তার অনুমতি নিয়ে সুভাষের বিয়ে দেবে বল্‌ছে।"

জয়ন্তী বলিল, "কেন, বিয়ে করতে চায় না কেন? এককালে ত খুবই চাইত। এই ত আমাদের বাড়ীর জামাই হবারই একবার জোগাড় হয়েছিল, নিতান্ত খুড়ীমা সেই সময় মারা গেলেন তাই, নইলে ত হয়েই যেত।"

মায়া হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেল। এখনও এসব কথায় তাহার মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় কেন? যাহা হইবে না, যাহা হইবার নয়, অস্ফুট কৈশোরের সেই স্বপ্নকে আবার কেন এই যৌবনের জাগরণ ক্ষেত্রে টানিয়া আনা? প্রভাস তাহার বাল্যের সঙ্গী, এইটুকু মনে রাখাই কি যথেষ্ট নয়?

ইন্দু ভাইঝির গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল. "থাক্‌গে, ও সব কথায় কাজ কি? যাদের ছেলে তারা বুঝবে। তুই যেন মাগী এলে ও-সব কথা আবার পাড়িস্‌ নে।"

জয়ন্তী বলিল, "আমাকে তুমি তেমনি ন্যাকাই পেয়েছ! কথা তারা নিজেরা পাড়তে পেলে বর্ত্তে যায়। এখন তাদের ছেলেতে আর আমাদের মেয়েতে তুলনা হয়? আর মেজ কাকা এখনই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন আর কি?"

মায়া হঠাৎ মাদুর ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "দোহাই তোমাদের, আর কি দুনিয়ায় কথা নেই? কেবল বিয়ে আর বিয়ে। বিয়ে ক'রে কে যে কত লাটসাহেব হয়েছে তা ত দেখাই যাচ্ছে।"

জয়ন্তী হাসিয়া বলিল, "বাপ্ রে, এত রাগ কিসের? কোনোদিকে বেশী বাড়ান ভাল নয়। মেয়ে জন্ম যখন নিয়েছ তখন বিয়ে একদিন না একদিন করবেই। তখন লাট হও বা না হও দেখাই যাবে। আমার না-হয় গরীবের ঘরে পড়তে হয়েছে ব'লে দুঃখে কষ্টে দিন যাচ্ছে, তুমি ত আর তা পড়বে না?"

মায়া বলিল, "আচ্ছা, সে যখন পড়ব তখন দেখা যাবে। এখনই এত ভাবনার দরকার নেই। আমার পড়া শেষ হতেই ত এখনও কত দেরী। সম্প্রতি এখানে থাকতে থাকতে মায়ের নামের কাজটা ক'রে যেতে পারলে খুশী হতাম। বাবা যে কখন ডাক দেবেন তার ঠিক নেই। প্রভাস-দা না থাকাতে সব মাটি হতে বসেছে।"

ইন্দু বলিল, "কেন, প্রভাস ছাড়া কি পরামর্শ দেওয়ার মানুষ নেই? সেদিনকার ছেলে, সে এত কি বোঝে? মেজদাকে লিখে দেখ না, সে কি বলে। সে ত কারুর চেয়ে কম বোঝে না, এ সব বিষয়ে?"

মায়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "বাবাকে মায়ের সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে আমার ভাল লাগে না। তিনি নিজে থেকে কখনও যদি বল্‌তেন তাহলে না-হয় আমি বল্‌তাম।"

ইন্দু বলিল, "তিনি আর কি বল্‌বেন বল? তোর মা ত কোনোদিন কোনো সম্পর্ক রাখল না, মেজদা ত চেষ্টার ত্রুটি করেনি। যেতে সুদ্ধ চাইল না।"

মায়া বলিল, "যাক্ গে পিসীমা, তিনি ত স্বর্গে চ'লে গেছেন, এখন আর তাঁর সমালোচনা ক'রে কি হবে? আমি নিজেই ভেবে দেখি, যদি কিছু ঠিক করতে পারি।"

এমন সময় বাহির হইতে কে যেন নারীকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, "কৈ গো, গেরস্তরা কেউ বাড়ীতে নেই নাকি?"

নিস্তারিণী ঠাকুরাণী তাঁহার ঘর হইতে উত্তর দিলেন, "সব ঐ দক্ষিণদিকের ঘরে আছে গো, দেখ গিয়ে।"

জয়ন্তী বলিল, "ঠাক্‌রুণ অনেককাল বাঁচবেন, নাম করতে না করতে এসে হাজির।"

ইন্দু বলিল, "তা বাঁচুক, স্বামীপুত্র সব ঘর জুড়ে রয়েছে, এখনি ত বেঁচে থাকার সময়। পা-দুটো ব্যথা করছে আর উঠতে পারি না, যা না একটু ডেকে নিয়ে আয়।"

জয়ন্তী উঠিয়া গেল। মায়া বলিল, "আমার ইচ্ছে করছে অন্য ঘরে পালাতে। এখনি ত তোমাদের যত বিয়ের গল্প সুরু হবে?"

ইন্দু বলিল, "তোকে দেখতেই আসছে, আর তুইই চ'লে যাবি? বোস্ না, তোকে ত আর খেয়ে ফেলবে না?"

জয়ন্তীর সঙ্গে সঙ্গে প্রভাসের মা আসিয়া ঢুকিলেন। মায়া তাহাকে যেমন দেখিয়া গিয়াছিল, তাহার তুলনায় অনেকখানি রোগা হইয়া গিয়াছেন, বয়সও যেন দশ-পনেরো বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে।

সে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। প্রভাসের মা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ওমা, মায়া আর সে মায়া নেই! দিব্যি জগদ্ধাত্রীর মত চেহারা হয়েছে। যে ঘরে যাবে, সে ঘর আলো হয়ে উঠবে।"

জয়ন্তী চিরকালই ঠোঁটকাটা, সে চট্ করিয়া বলিল, "আমাদের বোন আর কালো কুৎসিত ছিল কবে জ্যাঠাইমা? চিরকালই ত তার ঘর-আলো করা রূপ।"

ইন্দু বলিল, "তোর এক কথা, একেবারে উকিলের মত কথার খুঁটিনাটি ধরতে ব'সে গিয়েছিস্।"

প্রভাসের মা জয়ন্তীর মন্তব্যে একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন ইন্দুর কথায় একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমরা বুড়ো মানুষ বাছা, তোমাদের সহরের মেয়েদের সঙ্গে কি আর কথায় পারি? মায়াকে দেখতে ভাল চিরকালই তা ত জানিই। ছোটবেলা তোমরাই বরং তাকে কম দেখেছ, আমাদের ত সে ঘরের মেয়ের মতই ছিল।"

মায়া বলিল, "আপনার চেহারা কিন্তু অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

প্রভাসের মা বলিলেন, "আর বুড়ীসুড়ি হয়ে গেলাম মা, চেহারা আর কতদিন ভাল থাকবে? তোমার মা বেঁচে থাকলেও এতদিন বুড়ী হয়ে যেত। মায়ের নামে নাকি পুকুর পিতিষ্টে করবে শুনছি? এই ত মেয়ের মত কাজ।"

ইন্দু বলিল, "তোমার ছেলে ত আবার পরামর্শ দিয়ে গেছে, মেয়ে-ইস্কুল করতে।"

প্রভাসের মা বলিলেন, "ওটা এক পাগল, ওর কথা শুনো না। যত-সব আজগুবি খেয়াল ওর মাথায়। বয়স হল ত বুদ্ধি হল না। রাতদিন আছে কেবল দেশোদ্ধার আর পরোপকার নিয়ে। নিজের কথা একবার ভুলেও ভাবে না। এত যে বিয়ে করবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছি, তা কে বা শোনে কার কথা।"

জয়ন্তী বলিল, "সুভাষের বিয়েই আগে দেবেন নাকি ?

প্রৌঢ়া বলিলেন, "অগত্যা তাই করতে হবে। একটা সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে, তা ব'লে ত সব ক'টাকে সন্ন্যাসী ক'রে দিতে পারি না ? দুটো একটা সম্বন্ধও আস্‌ছে, কাল একটি মেয়েকে দেখতে যাবার কথা আছে। তা এ ছেলেও আবার জেদী কম নয়।"

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি নিয়ে জেদ করছে ?"

সুভাষের মা বলিলেন, "আজকালকার ছেলেদের যা রোগ। লেখাপড়া জানা চাই, বয়েস বেশী হওয়া চাই, এই সব আর কি !"

জয়ন্তী বলিল, "তা ছেলের যেমন পছন্দ তেমনি মেয়ে দেখুন, নইলে পরে আবার ঝগড়াঝাঁটি বেধে যাবে।"

সুভাষের মা বলিলেন, "তা ত বটে, তবে কিনা শুধু ছেলের দিক্ দেখলেই ত হবে না ? পাড়াগাঁয়ের গেরস্তঘরে দিন কাটাতে হবে, পাঁচজনের সঙ্গে, সেটাও ভাবতে হবে। একেবারে সহরের শিক্ষাদীক্ষা হলে ত চলবে না ?"

জয়ন্তী বলিল, "আমার যেমন দশা হয়েছে। শাশুড়ী চান একরকম, তাঁর ছেলে চান এক রকম। মাঝ থেকে দোটানায় প'ড়ে আমার প্রাণ যেতে বসেছে।"

ইন্দু বলিল, "এখন ঘরে ঘরেই এই। দিশি শিক্ষা, বিলিতি শিক্ষা দুইয়ের খিচুড়ী হয়ে, কোনটাই রক্ষা হচ্ছে না। মা-বাপ ভাবে ছেলে আমাদের মানে না, ছেলে ভাবে মা-বাবা একটু আমার দিক্ দেখে না। মাঝ থেকে বৌগুলো মরে ভুগে।"

প্রভাসের মায়ের বোধ হয় কথাগুলি বিশেষ পছন্দ হইতেছিল না, তিনি বলিলেন, "তা যতদিন এক সঙ্গে ঘর করতে হচ্ছে ততদিন মা-বাপকে না মান্‌লে চলবে কি ক'রে ? যখন নিজেরা স্বাধীন হবে, তখন নিজের মতে চলতে পারবে।"

মায়া খালি শুনিয়াই যাইতেছিল, কোনো কথা বলে নাই। তাহাকে কেমন একটু অন্যমনস্ক দেখাইতেছিল।

প্রভাসের মা যাইবার সময় ইন্দুকে বলিয়া গেলেন, "একদিন যেয়ো আমাদের বাড়ী মেয়েদের নিয়ে।"

ইন্দু বলিল, "তা যাব, তবে বিয়ের কথা বেশী ব'লো না যেন আমাদের মেয়ের কানের কাছে। শুন্‌লে সে একেবারে ক্ষেপে যায়।"

মায়া তাড়া দিয়া বলিল, "আর তুমি যেন কি পিসীমা! কি যে বল—"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "কেন, আমি কি মিথ্যে কথা বল্‌লাম? নিস্তার পিসী কবে বিয়ের কথা বলেছিল ব'লে এখনও বুড়ীর উপর ক্ষেপে আছিস্‌।"

প্রভাসের মা বলিলেন, "আজ তবে আসি এখন। তুমি যেয়ো আমাদের বাড়ী মা-লক্ষী, কেউ কিছু বলবে না।"

তিনি চলিয়া যাইতেই মায়া উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

২৭

দারুণ গ্রীষ্মের দিন। দুপুরবেলা কাহারও সাধ্য থাকে না যে বাহিরে গিয়া কোনো কাজ করে। ঘরের ভিতরেও কোনো কাজ করা কষ্টসাধ্য। নিতান্ত নিরুপায় নয় যাহারা, তাহারা এ সময়টা আলস্যচর্চ্চায়ই কাটাইয়া দেয়।

মায়াদের বাড়ীর সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গিয়াছে। এক ঘরে জয়ন্তী তাহার পুত্রকন্যাদের লইয়া ঘুম পাড়াইতেছে। ছেলেটি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মেয়েটি মাদুরে গড়াগড়ি দিয়া নাকে কাঁদিয়া বিরক্ত করিতেছে। মায়ের নিজের চোখ ঘুমে ঢুলিয়া আসিতেছে, সে চোখ বুজিয়া মেয়ের পিঠ চাপড়াইতেছে, এবং মাঝে মাঝে একেবারে ঘুমাইয়া পড়িতেছে। হাতের তলা হইতে মেয়ের পিঠটা সরিয়া গেলেই আবার চমকিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। পাশের ঘরে মায়া এবং ইন্দু শুইয়া। মায়ার এত গরমে মোটেই ঘুম আসিতেছে না। রেঙ্গুনে গরমের সময় চব্বিশ ঘণ্টাই সে ইলেক্‌ট্রিক পাখার নীচে বসিয়া থাকে। এখানে রেঙ্গুন হইতে গরমও ঢের বেশী এবং পাখার সঙ্গে সম্পর্কও নাই, কাজেই তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দু অনেকক্ষণ হইল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

দরজার উপর হঠাৎ কে গুম্ গুম্ করিয়া কিল মারাতে মায়া উঠিয়া বসিল। ইন্দুরও ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, সে চোখ না খুলিয়াই বলিল, 'মায়া দেখ্ ত রে, এই দুপুর রোদে কে আবার এল।"

মায়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বাইরের এক ঝলক উত্তপ্ত হাওয়া তাহার মুখের উপর তীব্র স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া গেল। নিস্তারিণী-ঠাকুরাণীর ছোট ছেলেটি বাহিরে দাঁড়াইয়া, তাহার হাতে গোটা-কতক চিঠি। বলিল, "পিওনটা এইমাত্র দিয়ে গেল।"

মায়া চিঠিগুলি লইয়া দরজা আবার বন্ধ করিয়া দিল। ইন্দু মাদুরের উপর পাশ ফিরিয়া বলিল, "কার চিঠি রে?"

মায়া বলিল, "আমার তিনখানা, জয়ন্তীর একখানা, তোমার একখানা।"

পাশের ঘরে জয়ন্তীর ঘুম একেবারে ছুটিয়া গেল। সে হুড়মুড় করিয়া ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা লিখেছেন নাকি?"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "আহা, মায়ের চিঠির জন্যেই তুমি এমন পড়ি-কি-মরি দৌড়ে এসেছ কিনা? মায়ের জামায়ের চিঠি, না রে মায়া?"

জয়ন্তী বলিল, "পিসীমা যেন কি! আমার সঙ্গে তোমার ঠাট্টারই সম্পর্ক নাকি?"

ইন্দু বলিল, "কি আর করি বাছা? ঠাট্টার সম্পর্কের মানুষ একটাও নেই এখানে। সারাদিন হাঁড়িমুখ ক'রে কি মানুষের প্রাণ বাঁচে? তাই ভাইঝি ভাইপো যাকে পাই, তারই সঙ্গে একটু ঠাট্টা-তামাসা করি।"

জয়ন্তী আর দাঁড়াইল না। মায়ার হাত হইতে চিঠিখানা ছোঁ মারিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলিয়া গেল। ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কে চিঠি লিখল রে?"

মায়া বলিল, "বাবাই ত লিখেছেন দেখছি।"

ইন্দু বলিল, "মেজদা এক চিরকালের উড়ুন্দুড়ে। তোর চিঠির মধ্যেই আমাকে ত দু লাইন লিখতে পারে। তা না, প্রতিবারে একখানা ক'রে আলাদা চিঠি আসে।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "আমার নামে কিছু লিখেছেন হয়ত, তাই আর আমার চিঠির মধ্যে দেননি।"

ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ, তোমার বাবা আবার তোমার নামে কিছু লিখবেন!

সাত রাজার ধন এক মাণিক বলে তুমি। আমাদের গুষ্টিতে কোনো ছেলেরও তোর অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক আদর হয়নি। ছোটবেলায় যেমন মায়ের কাছে মার খেয়ে দিন কাটিয়েছিস্, এখন ভগবান্ তার সুদসুদ্ধ পূরিয়ে দিচ্ছেন।"

মায়া একটু মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "হয়ত মার খেলেই ছিল ভাল। বেশী শাসন ভাল, না বেশী আদর ভাল, তা এখনও ঠিক ক'রে বুঝতে পারছি না।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "তা জানি না বাছা, তবে পিঠটা জুড়িয়ে থাকলেই মানুষের ভাল লাগে। যাক গে, দেখ্ না তোকে কে চিঠি লিখল।"

মায়া চিঠি তিনখানা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া বলিল, "একখানা বাবার, একখানা বাণীর, আর একখানা প্রভাসদার।"

ইন্দু একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "তাই নাকি? প্রভাস আবার তোকে চিঠি লিখতে গেল কেন? কি লিখেছে?"

মায়া একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিল, "দেখ না কি লিখেছেন। একখানা পোষ্টকার্ড ত? কেউ কাউকে চিঠি লিখছে শুনলে তোমরা এমন আঁৎকে ওঠ কেন? চিঠি ত যে-কোন মানুষ যে-কোন মানুষকে লিখতে পারে। কথা যদি বলা যায়, ত চিঠি লিখলে কি হয়?"

ইন্দু তাহার কথার উত্তর না দিয়া পোষ্টকার্ডখানা মন দিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বিশেষ কিছু তাহাতে নাই। প্রভাস দিন-কুড়ি পরে আবার গ্রামে আসিবে। মায়া যদি ততদিন থাকে, তাহা হইলে গ্রামে স্কুল করার পরামর্শ ভাল করিয়াই হইবে। আর মায়া যদি আগেই চলিয়া যায়, তাহা হইলে প্রভাস সব ব্যবস্থা একলাই করিতে চেষ্টা করিবে, এবং চিঠিতে মায়াকে সব জানাইবে।

ইন্দু চিঠি পড়া শেষ করিয়া বলিল, "মায়া দেখ্, তুই হয়ত শুন্‌লে বিরক্ত হবি, কিন্তু আমি ভালর জন্যেই বল্‌ছি। তুই এ চিঠি ছিঁড়ে ফেল্, উত্তর দিস্ না। অন্ততঃ এখানে ব'সে দিস্ না। তাহলে এই নিয়ে আর ঘোঁটের শেষ থাকবে না। নিস্তারিণী বুড়ীর ছেলে চিঠি নিয়ে এসেছে, সে কি আর পোষ্টকার্ডখানা উল্টেপাল্টে দেখেনি? আমরাও চিঠিপত্র ত ওদের দিয়েই ডাকে দেওয়াই? তুইও লিখছিস্ দেখলে এখন ঘরে ঘরে কত রকম ক'রে ব'লে বেড়াবে।"

মায়া বলিল, "তাদের ভয়েই তাহলে হাত পা গুটিয়ে ব'সে থাকি? এখানে এলাম কি করতে শুনি? স্কুলটার ত এখন পর্য্যন্ত একটা কিছুই

ঠিক হল না। একেবারে রেঙ্গুনে গিয়ে উঠলে তখন কি ক'রে সব ব্যবস্থা করব ?"

ইন্দু বলিল, "আরে, চটিস্ কেন বাপু? তুই না-হয় রেঙ্গুনে গিয়ে প্রভাসকে ডেকে নিয়ে যাস্ পরামর্শ করবার জন্যে। সেখানে কেউ একটা কথাও বল্‌বে না। কিন্তু গাঁয়ে একটা ছুতো পেলেই সবাই এমন টি টি লাগাবে যে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে আমার প্রাণ যাবে।"

মায়া আর কথা বলিল না, অন্য চিঠি দুইখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বাণী তাহার ফরমাশী জিনিষের জন্য অনেক তাগিদ দিয়াছে। তাহার নাকি এখনই দরকার, জিনিষপত্র সব তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর বেশী সময় হাতে নাই। নিরঞ্জন মেয়েকে শীঘ্র ফিরিবার জন্য তাগিদ দিয়াছেন। শিবচরণবাবু কলিকাতায় আসিয়া পুত্রের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন; সে আসিয়া পৌছিলেই তাহাকে লইয়া বর্মায় চলিয়া যাইবেন। মায়াকে টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহাদের যাত্রার দিন জানান হইবে। সে যেন প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং আর দেরি না করে। বর্ষা আরম্ভ হইলে সমুদ্র বড় অশান্ত হইয়া উঠে, যাওয়া-আসা করাই কঠিন। তাহা ভিন্ন এমন ভাল সঙ্গীও আর জুটিবে না। অন্য যাত্রিণীদের সঙ্গে আসিতে যদি মায়ার বেশী অসুবিধা হয়, সে যেন কেবিন রিজার্ভ করিয়া আসে। ইন্দু তাহার সঙ্গে আসিলেই ভাল হয়, গ্রামে থাকিলে সে আবার অসুখ বাধাইবে। নিরঞ্জন তাহাকেও পৃথক্ চিঠি লিখিতেছেন।

মায়া চিঠি পড়া শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা তোমাকে কি লিখেছেন, পিসীমা ?"

ইন্দু একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "সে অনেক কথা। বাপ-জ্যাঠায় মেয়ে ছেলে সম্বন্ধে কত রকম পরামর্শ করে, সবই কি আর তাদের কাছে বলা যায় ?"

মায়া বলিল, "তা না বল, নাই বললে। এখন, আমার সঙ্গে যাচ্ছ কিনা তাই বল ?"

ইন্দু বলিল, "মেজদা ত খুব জেদ ক'রে লিখেছে, আমি কিন্তু বাপু এখন যেতে পারব না।"

মায়া বলিল, "কেন পারবে না শুনি ? তোমার দেশে এমন ত কিছু কাজ নেই ?"

ইন্দু বলিল, "না, যত কাজ কেবল তোমার। আমি এই মাসটা গেলে একটু তীর্থে বেরোব, কবে থেকে ঠিক ক'রে রেখেছি। রেঙ্গুন যাই ত সেই শীতকালে। নিয়ে যাবার লোক ঢের জুটবে। কলকাতা থেকে ত বার মাসই বর্মায় লোক যাচ্ছে। আর কেউ না যাক, বিজয়টাকে ধ'রে নিয়ে গেলেই হবে।"

মায়া রাগ করিয়া বলিল, "যা খুশি করগে। শীতকালের আগে তো চারপালা অসুখ বাধাবে ?"

সে নিজের চিঠিপত্র লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

জয়ন্তী ততক্ষণে চিঠি পড়া শেষ করিয়া, গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। মায়া বলিল, "কি গো, তুমি যে একেবারে দশ হাত জলের তলায় প'ড়ে গিয়েছ মনে হচ্ছে।"

জয়ন্তী বলিল, "তা না প'ড়ে আর করি কি ? সংসারে ঢুকলে কত রকম ভাবনা যে আছে, তা তোমরা ধারণাও করতে পার না। তোমাদের ভাবনা কেবল নিজেকে নিয়ে, আমাদের পরের ভাবনার চোটে নিজের কথা মনে করবারই অবসর হয় না।"

মায়া বলিল, "কথা ত বুড়ী দিদিমার মত চিরকালই তুমি বল। সম্প্রতি কি ভাবনা হল তোমার শুনি ?"

জয়ন্তী বলিল, "উনি যেতে লিখেছেন। শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়েছে, দেখবার শুনবার কেউ তেমন নেই ত ?"

মায়া বলিল, "সব বাজে কথা। তুমি যেও না ত ! মা বাবা সবাই সেখানে রয়েছেন, তবু তাঁকে দেখবার লোক নেই ! বিয়ের আগে কে দেখত শুনি ?"

জয়ন্তী হাসিয়া উঠিয়া পড়িল। বলিল, "আরে বাপু, যা বুঝিস্ না তা নিয়ে তর্ক করিস্ কেন ? বুদ্ধি দিয়ে কি আর সব জিনিষই বোঝা যায় ? আগে বিয়ে হোক তারপর বুঝবি, কেন বাবা-মা থাকলেও কেউ নেই মনে হয়।

মায়া বলিল, "তার মানে তুমি এখনই স্বামীর পায়ে তেল মালিশ করতে ছুটছ ত ? বাপ রে বাপ, আমি কোনো জন্মে বিয়ে করব না। মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের সব চেয়ে বড় শত্রু।"

জয়ন্তী বলিল, "অমন বলে সবাই, শেষ অবধি ত কাউকে বাদ যেতে দেখি না। আমাদের স্কুলের সৌদামিনীদি বিয়ের নামে নাক যা সিঁটকোতেন ! কেউ বিয়ে করছে শুন্‌লে, লেক্‌চার দিয়ে তাকে অস্থির ক'রে তুলতেন।

তিনিও ত বুড়ো বয়সে বিয়ে ক'রে বসলেন। কিন্তু এখন যে ভাবছিস্, যে, নিজের কথা ভুলে থাকতে বড় কষ্ট হয়, তখন দেখবি, তা মোটেই নয়। নিজের থেকেই ওদের কথাটা বড় হয়ে উঠবে, তাদের অসুখ-অসুবিধার ভাবনা সবার আগে মনে হবে।"

মায়া বলিল, "আহা, সবাই তোমার মত কি না?"

জয়ন্তী বলিল, "দেখাই যাবে। যারা মুখে আগে বেশী বড়াই করে, পরে তারাই তত ঘাড়মুড় ভেঙে পড়ে।"

মায়া আর কথা না বলিয়া, হাতবাক্স খুলিয়া চিঠিগুলি গুছাইয়া রাখিল। প্রভাসের চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলার বদলে সযত্নে রাখিয়া দিল।

জয়ন্তী সত্যই তারপর দিন যাইবার জন্য জেদ ধরিল। ইন্দু বলিল, "যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড। এ কি কলকাতা পেয়েছ, যে, হট্ ক'রে যাব বল্‌লেই চ'লে যাওয়া যায়? তা হলে জামাইকে বল, এসে নিয়ে যেতে।"

জয়ন্তী নাছোড়বান্দা মেয়ে। অনেক বলিয়া কহিয়া, বায়োস্কোপের লোভ দেখাইয়া সে নিস্তারিণী-ঠাকরাণীর মেজ ছেলেকে রাজী করাইল। পরের দিন আর গুছাইয়া-গাছাইয়া যাইবার সময় নাই, কাজেই আর একটা দিন বাধ্য হইয়া দেরি করিতে হইল। বাক্স-প্যাটরা টানিয়া বাহির করিয়া সে গুছাইতে আরম্ভ করিল।

হঠাৎ মায়া বলিয়া বসিল, "আমিও এই সঙ্গে চ'লে যাই না পিসীমা? আমাকেও ত যেতেই হবে, দু'দিন পরে?"

ইন্দু গালে হাত দিয়া বলিল, "বাপ রে বাপ, মেয়ে না ত সব ধিঙ্গী! ওর না-হয় বর তলব করেছে, তোমাকে আবার কে ডাক দিল?"

মায়া বলিল, "বর ছাড়া আর কেউ ডাকতে জানে না নাকি? বাবা ত আমায় শিবচরণবাবুদের সঙ্গে যেতে লিখেই দিয়েছেন। তাঁরা কবে চট্ ক'রে বেরিয়ে পড়বেন, তখন আমায় হুড়োহুড়ি ক'রে মরতে হবে। তার চেয়ে কলকাতায়ই গিয়ে থাকি না? এখানেই বা ব'সে থেকে করব কি? যে কাজের জন্যে এলাম, তার ত কিছুই হল না।"

ইন্দু বলিল, "তবে যাও, আর কি বল্‌ব? আজকাল সবাই স্বাধীন, নিজের ইচ্ছামতই ত চলবে?"

জয়ন্তী বলিল, "স্বাধীন আর কই? অত্যন্ত পরাধীন ব'লেই না যেতে হচ্ছে?"

তাহার পিসী বলিল, "আহা, যেতে তোমার বড়ই অনিচ্ছে, মা ? পারলে ত এখন ধেই ধেই ক'রে দুহাতে তুলে নাচ।"

রোদ ক্রমে পড়িয়া আসিল। ঝিরঝির করিয়া একটুখানি হাওয়াও দিতে আরম্ভ করিল। মায়া বলিল, "চা-টা খেয়ে চল একবার প্রভাসদাদের বাড়ী ঘুরে আসা যাক। আর ত সময় হবে না, সেদিন অত ক'রে ব'লে গেলেন।"

ইন্দু বলিল "তা চল্। কিন্তু প্রভাসের চিঠির কথা কিছু বলিস্‌নে। দেখি বামুনদিদিকে তাড়া দিয়ে, নইলে উন্থন ধরাতেই তার চার ঘণ্টা কেটে যাবে।"

ইন্দুর শরীর ভাল নয় বলিয়া রান্নার কাজ একজন দরিদ্রা ব্রাহ্মণ-কন্যার দ্বারা চলিত।

চায়ের জল যথাসময়েই গরম হইয়া আসিল। সঙ্গে আসিল এক রাশ বাড়ীর বাগানের ফল, আর ঘরে প্রস্তুত মিষ্টান্ন। এখানে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ময়রার দোকান নাই। তাই পাছে মায়ার খাওয়ার কষ্ট হয় বলিয়া ইন্দু রোজ ঘরে কিছু-না-কিছু মিষ্টি তৈয়ারী করিয়া রাখে। আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশীর ঘর হইতেও মায়ার নামে প্রায়ই মিষ্টান্ন উপহার আসে। কাজেই খাওয়ার অসুবিধার বদলে একটু বেশী রকম সুবিধাই হইয়া গিয়াছে।

কাঁসার রেকাবীতে ইন্দুকে খাবার সাজাইতে দেখিয়া মায়া বলিল, "কাল চ'লে যাব ব'লে কি আজই একমাসের খাওয়া খাইয়ে দিচ্ছ ?"

ইন্দু বলিল, "তা এগুলো সব নষ্ট হবে নাকি ? না গরু-বাছুরে খাবে ?"

মায়া বলিল, "নিস্তারিণীদিদির ছেলেদের দাও না ? তারা ত ভাল জিনিষ চোখেও দেখে না, কেবল ভাত আর মুড়ি গিলে মরে।"

ইন্দু বলিল, "দেখে না যে তা কার দোষ ? বুড়ী এদিকে ত টাকার কুমীর, অথচ একটা পয়সা বার করতে হলে তার যেন বুক ফেটে যায়। ছেলেগুলোরও এমন লক্ষ্মীছাড়া স্বভাব যে তাদের কিছু দিতে ইচ্ছে করে না।"

যাহা হোক, জিনিষগুলা নষ্ট হইবার ভয়ে হোক বা মায়ার অনুরোধেই হোক, নিস্তারিণীর ঘরে শীঘ্রই বড় একথালা সন্দেশ, পান্তুয়া এবং ক্ষীরের ছাঁচ গিয়া পৌছিল। খাওয়ার পর মায়া, ইন্দু, জয়ন্তী, তার ছেলেমেয়ে, সকলে মিলিয়া পাড়া বেড়াইতে চলিল।

প্রভাসের মা তখন বসিয়া একখানা গহনার ক্যাটালগ মন দিয়া দেখিতেছিলেন। অভ্যাগতদের দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন। বারান্দায় নানা রকম নক্সাকাটা বড় একখানা মাদুর পাতিয়া সকলকে বসাইলেন।

গহনার ক্যাটালগটা সর্বপ্রথম চোখে পড়িয়াছিল জয়ন্তীর। সে বলিয়া উঠিল, "ছেলের বিয়ে কি ঠিক হয়ে গেল? বৌয়ের জন্যে গহনার ফরমাশ দিচ্ছেন?"

প্রভাসের মা বলিলেন, "তা একরকম ঠিকই বাছা। আর শুধু শুধু দেরি ক'রে কি হবে?"

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কবে বিয়ে? দিনও ঠিক হয়ে গেছে নাকি?"

প্রভাসের মা বলিলেন, "এই প্রভাস এলেই ঠিক হবে। সে কুড়িদিন পরে আস্‌ছে কিনা? এলে একবার মাথা কোটাকুটি ক'রে দেখব। নিতান্তই যদি রাজী না হয়, তাহলে সুভাষের বিয়েই আগে হবে।"

মায়া এতক্ষণ পরে কথা বলিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম মেয়ে ঠিক করলেন? আপনি নিজে দেখেছেন?"

প্রভাসের মা বলিলেন, "এই হয়েছে মাঝামাঝি একরকম। দেখতে ভালই, তবে লেখাপড়া খুব বেশী শেখেনি। দেবে থোবে মন্দ না।"

জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ছেলের পছন্দ হয়েছে?"

প্রভাসের মা বলিলেন, "বল্‌ছে না ত কিছু। খুব বেশী অপছন্দ বোধ হয় হয়নি।"

তাহার পর অন্য কথা আসিয়া পড়িল। প্রভাসের মা কিছু খাইয়া যাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। বাড়ীর খাওয়ার চোটেই তখন সকলের আকণ্ঠ ভরিয়া উঠিয়াছে, আর খাইবার জায়গা কোথায়? ভদ্রমহিলা কিছুতেই ছাড়েন না দেখিয়া অবশেষে এক গেলাস আমপোড়ার সরবৎ খাইয়া সকলে তাঁহার মানরক্ষা করিল।

আরও দুই-চারটা কথার পর সকলে উঠিয়া পড়িল। রাস্তায় বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় নিস্তারিণীর ছোট ছেলেটি হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সারা পথটাই ছুটিয়া আসিয়াছে।

ইন্দু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অমন ক'রে আস্‌ছিস্ কেন রে? কি হয়েছে?"

ছেলেটি ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "টেলিগেরাপ এসেছে। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।"

মায়া বলিল, "শিবচরণবাবুর টেলিগ্রাম বোধ হয়। দেখ, আমি কেমন ভবিষ্যৎ দেখতে পাই। আগের থেকেই যাবার ব্যবস্থা ক'রে রাখলাম।"

ইন্দু বলিল, "আগে দেখই ত কোথাকার তার। টেলিগ্রাম শুনলেই কেমন একটা ভয় ভয় করে যেন।"

বাড়ী পৌঁছিয়া মায়া দেখিল, সত্যই শিবচরণবাবুর টেলিগ্রাম। দেবকুমার আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এই সপ্তাহেই তাঁহারা বর্মা রওনা হইবেন।

২৮

ঘরময় কাপড়-চোপড়, বই, বাসন, নানা জিনিষ ছড়াইয়া মায়া বাক্স গুছাইতে বসিয়াছে। জিনিষগুলির মধ্যে কতক তাহার নিজের, কতক বাণীর ফরমাশী। বাণীর মায়ের ফরমাশও কিছু কিছু আছে। বাসন-কোসন মোটেই রেঙ্গুনে ভাল পাওয়া যায় না, সুতরাং মেয়ের বিবাহের বাসন সবই তিনি কলিকাতা হইতে কিনাইয়া লইয়া যাইতেছেন।

মায়া অনেক বকাবকি রাগারাগি করিয়াও ইন্দুকে সঙ্গে যাইতে রাজী করাইতে পারে নাই। তাহার সেই এক কথা, তীর্থভ্রমণ না সারিয়া সে বর্মায় যাইবে না। মায়ার জন্য কেবিন একটা রিজার্ভ করিয়াই লওয়া হইয়াছে, আসিবার সময় সহযাত্রিণীদের উৎপাতে তাহার বড় কষ্ট হইয়াছিল।

বাক্স গুছাইতে গুছাইতে, কাগজপত্রের মধ্যে প্রভাসের চিঠিখানা বাহির হইয়া পড়িল। ইহার এখনও উত্তর দেওয়া হয় নাই। কলিকাতায় আসিয়া উত্তর দিবে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু কি উত্তর দিবে, মায়া ভাবিয়াই পায় না। রেঙ্গুনে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যাওয়া কি ঠিক হইবে? অন্তত নিরঞ্জনকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত। কিন্তু মায়ের সম্পর্কিত কোনো কথা, পিতার নিকট বলিতে মায়ার এখনও সঙ্কোচ লাগে। কিছু যদি তিনি মনে করেন? কিন্তু প্রভাসদার চিঠির কোনো একটা উত্তর ত দিতে হয়, সে তাহা না হইলে কি ভাবিবে? ভাবিবে হয়ত, মায়ার আসলে কিছু করিবার মতলব নাই, কেবল কথা বলার খাতিরে কতকগুলা বাজে কথা বলিয়াছিল। এখনই যাহা হয় কিছু একটা উত্তর লিখিয়া দেওয়া যাক, যত দেরি করিবে তত আলস্য বাড়িতে থাকিবে।

উঠিয়া গিয়া মায়া একখানা চিঠির কাগজ, খাম এবং তাহার ফাউণ্টেন পেন লইয়া আসিল। পোষ্টকার্ডে চিঠি লিখিতে তাহার কোনকালেই ভাল লাগে না। দু'লাইন হইলেও সে খামেই চিঠি লেখে। অনেক ভাবিয়া সে লিখিল, যে, সম্প্রতি সে রেঙ্গুন ফিরিয়া যাইতেছে। সেখানে গিয়া পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া, সে প্রভাসকে আবার চিঠি লিখিবে। রেঙ্গুনের ঠিকানা সে দিয়া দিল, যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজন ঘটে, প্রভাস যেন তাহাকে লিখিয়া জানায়।

মায়ার জ্যাঠাইমা আসিয়া বলিলেন, "কি রে, আজ আর নাওয়া-খাওয়া নেই নাকি? যাবি ত সেই পরশু, আজই সব কাজ শেষ না করলে চলবে না?"

মায়া বলিল, "অন্ততঃ এই বড় বাক্স দুটো শেষ ক'রে নি জ্যাঠাইমা। সব কাজ কালকের আশায় ফে'লে রাখলে শেষ অবধি হয়েই উঠবে না। বেশী দেরি না, আধঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে।"

জ্যাঠাইমা বলিলেন, "জয়ন্তী তোর জন্যে আমসত্ত পাঠিয়েছে, টিফিনবাক্সের মধ্যে ক'রে নিয়ে যাস্।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "তোমার মেয়ে খুব পাকা গিন্নি হয়েছে এরই মধ্যে।"

জয়ন্তীর মা বলিলেন, "আর না হয়ে কি করবে বাছা? ঘাড়ে পড়লে সবই করতে হয়। নইলে তোর চেয়ে কতই বা বড়? অল্প বয়সে দায়ে প'ড়ে বিয়ে দিয়ে দিতে হল, নইলে তোরই মত হেসে খে'লে বেড়াতে পারত।"

এমন সময় চাকর আসিয়া একখানা চিঠি অগ্রসর করিয়া ধরিল, "একটা ছোক্‌রা দিয়ে গেল, দিদিমণিকে দিতে বললে।"

মায়া চিঠি খুলিয়া দেখিল, শিবচরণবাবু লিখিয়াছেন, পরশু যাওয়ার সব ঠিক। আজ বেলা তিনটার সময় পুত্রকে লইয়া তিনি মায়ার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন।

মায়া একটু হাসিয়া চিঠিখানা রাখিয়া দিল। চাকরটাকে বলিল, "ছোকরাকে যেতে বল, কোনো জবাব নেই।" শিবচরণবাবুর ছেলেকে লইয়া রেঙ্গুনে তাহার সঙ্গিনীরা কি রকম ঠাট্টা করিত, তাহাই মনে করিয়া মায়ার হাসি পাইতেছিল। দেবকুমার কি রকম মানুষ কে জানে? কাহার মুখে যেন মায়া শুনিয়াছিল, সে দেখিতে অতিশয় সুপুরুষ। যাক্, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। মায়ার এখন ও সব ভাবনা না ভাবিলেও চলিবে। তবু

বাক্স গোছানোতে আর তাহার মন লাগিল না। তাড়াতাড়ি করিয়া জিনিষপত্রগুলা উঠাইয়া ফেলিয়া, সে স্নান করিতে চলিয়া গেল। স্নান খাওয়া সারিয়া আসিয়া আর একবার জিনিষ গোছানোতে মন দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই মন বসিল না। জ্যাঠাইমার সঙ্গে গল্পও বেশীক্ষণ জমে না, ছেলেরা কেহ বাড়ীতে নাই, সুতরাং মায়া অকারণে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া সময় কাটাইতে লাগিল।

আচ্ছা, শিবচরণবাবু এবং দেবকুমার আসিয়া পড়িতে আর বেশী দেরি নাই। বড়জোর ঘণ্টাদেড়েক হইবে। সে তাঁহাদের বসাইবে কোথায়? এ বাড়ীটা নিতান্তই সাবেকী ধরণের। আলাদা বসিবার ঘর বলিয়া কোনো ঘর নাই। মেয়েরা বেড়াইতে আসিলে গৃহিণীর শুইবার ঘরে আড্ডা করে, ছেলেরা আসিলে হয় বিজয়ের পড়িবার ঘরে, না-হয় সদর দরজার সামনে বা সিঁড়িতে দাঁড়াইয়াই কাজ চালাইয়া দেয়। মায়া স্থির করিল বিজয়ের পড়ার ঘরটাই কাজে লাগাইতে হইবে। সে ঘরে অন্ততঃ খাট পাতা নাই। একটুখানি গুছাইয়া লওয়া দরকার; কোনো রকমে তাড়াতাড়ি সারিয়া লইতে হইবে।

মায়ার জ্যাঠাইমা খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ঘরের মেঝেতে মাদুর পাতিয়া একটুখানি গড়াইয়া লইবার আয়োজন করিতেছিলেন। দেবরঝিকে ঢুকিতে দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে, দুপুরেও কি তোদের একটু ঘুম আসে না? খালি টো টো ক'রে ঘুরছিস। আমাদের ত পেটে দুটো পড়লেই চোখ ঢুলে আসে।"

মায়া বলিল, "সারা দুপুর ত স্কুল আর কলেজ ক'রে মরি, ঘুমোব কখন? আজ ত এখনি আবার তাঁরা সব দেখা করতে আসবেন। তাঁদের কোথায় বসাব তাই ভাবছি।"

জ্যাঠাইমা বলিলেন, "বিজয়ের ঘরেই বসা। আর সব ঘরই ত জোড়া হয়ে আছে।"

মায়া বলিল, "ও ঘরে মোটে দুটো চেয়ার রয়েছে। আরও খানদুই অন্ততঃ দরকার হবে। আর তাঁদের একটু চা টা দিতে হবে ত? ঠিক চা খাবার সময়েই আসছেন।"

এতগুলা কাজের কথা শুনিয়া মায়ার জ্যাঠাইমা অগত্যা উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'আমার ঘরের ইজিচেয়ারটা পাঠিয়ে দিই, আর একটা বেতের

চেয়ার তোর ঘরেই আছে, সেটাও নিয়ে যা। মহেশটাকে ডাক্ না? ঘরটা একটু ঝেড়ে মুছে দিক। চায়ের সরঞ্জাম সব আছে। উনি থাকতে ছু বেলা চায়ের পাট বসত। আমি এখনই না ও-সব তুলে দিয়েছি? চা সামনের দোকানেই পাবে। ঘরে খাবার কিছু আছে, আর কিছু আনিয়ে নিলেই হবে।"

মায়া অনিচ্ছুক মহেশকে লইয়া বিজয়ের ঘর সংস্কার করিতে চলিল। ঘরখানির চেহারা দেখিয়া তাহার বুক দমিয়া গেল। অল্প সময়ের মধ্যে ইহার রূপান্তর ঘটানো একটু কঠিন ব্যাপার বটে। টেবিল এবং চেয়ারের উপর বই, খাতা, ছেঁড়া কাগজ নির্বিচারে ছড়ানো; দেয়ালের গায়ে কালির দাগ, এবং ছেঁড়া ধূলিলিপ্ত ক্যালেণ্ডারের প্রাচুর্য। ছাদের দিকে কোণে কোণে ঝুল এবং মাকড়শার জালের আলপনা, আলনার উপর ময়লা ধুতি, গেঞ্জি, পাঞ্জাবীর ভীড়। এক ঘণ্টায় এ ঘরকে কি করিয়া সংস্কার করা যায়?

মায়া দেখিল, এক্ষেত্রে সব গুছাইবার চেষ্টা করা বৃথা। আবর্জনাগুলি কোনো মতে আড়াল করিয়াই এখন কাজ সারিতে হইবে। আল্‌নার সমস্ত কাপড় সে একটানে নামাইয়া পুঁটলি বাঁধিয়া ফেলিল। চাকরকে বলিল, "এটা জ্যাঠাইমার ঘরে রেখে আয়, আর আলনাটা নিয়ে যা আমার ঘরে।" চাকর যাইবামাত্র টেবিলের উপর হইতে সব বই, খাতা, কাগজও সে নামাইয়া ফেলিল। টেবিলটার বার্ণিশ ইত্যাদির বালাই নাই, কালি ও তেলের প্রাচুর্যে সেটি মসৃণ। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ছুটিয়া গিয়া জিনিসপত্রের মধ্য হইতে মায়া লক্ষ্ণৌএর ছিটের একটি চাদর টানিয়া বাহির করিল। এটা সে রেঙ্গুনে লইয়া যাইতেছিল, বিছানা ঢাকা হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য। সম্প্রতি আর কিছু হাতের কাছে না পাইয়া ইহার দ্বারাই সে কাজ চালাইয়া দিল। টেবিল ঢাকা দিয়া, বিজয়ের বই এবং আস্ত খাতাপত্র যাহা কিছু ছিল, তাহা উহার উপর ভাল করিয়া সাজাইয়া রাখিল। ছেঁড়া খাতা এবং কাগজ যতটা পারিল, দেরাজগুলির মধ্যে ঠাসিয়া রাখিল। যাহা কুলাইল না, তাহা ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিল।

মহেশ ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আরও কিছু কাজ আছে দিদিমণি?"

মায়া বলিল, "আরও কিছু মানে? কোন্ কাজটা হয়েছে শুনি? সবই ত এখনও বাকি। এ ক্যালেণ্ডারগুলো সব নামিয়ে ফেল্, আর বড় ঝাঁটাটা এনে ঝুলটুলগুলো সব ঝেড়ে ফেল্।"

মহেশ অপ্রসন্নমুখে ঝাঁটা খুঁজিয়া আনিয়া ঘর ঝাড়িতে আরম্ভ করিল। ক্যালেণ্ডারগুলি মায়া নিজেই নামাইয়া ফেলিল। তাহার পর ঘর ঝাঁট শেষ হইবামাত্র চেয়ারগুলি ঠিক করিয়া রাখিয়া জ্যাঠাইমার সন্ধানে ছুটিল। তিনি তখন উঠিয়া বসিয়া বিকালে কি কি রান্না হইবে সেই বিষয়ে বামুন-ঠাকরুণের সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন। এ বাড়ীতে ঝি-চাকর বেশী নাই, ঐ রাঁধুনীটি এবং মহেশ। টাকার টানাটানি বলিয়া ইহাদের দিয়াই কাজ চালাইয়া লইতে হয়।

মায়া বলিল, "জ্যাঠাইমা, ঘর ত একরকম ঠিক করলাম, চায়ের জোগাড় কিছু হয়েছে?"

জ্যাঠাইমা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "মাগো, ঘেমে, ধুলো মেখে, একেবারে ভূত হয়ে গেছিস। এত করবার কি দরকার ছিল? এ ত আর কেউ কনে দেখতে আস্‌ছে না? যা যা, গা ধুয়ে কাপড় ছাড়গে যা, আমি ফল, মিষ্টি সব আনিয়ে রাখছি।"

মায়া গা ধুইতে চলিল। নিজেরও তাহার একবার মনে হইল, সত্যই ত, এত করিবার প্রয়োজন ছিল কি? শিবচরণবাবু বৃদ্ধ, সেকেলে মানুষ, দেবকুমারকে সে চেনেওনা। তাহাদের জন্য এত করিয়া ঘরদোর ঠিক না করিলেই বা কি হইত? কিন্তু মন বুঝিতে চায় না। তাহাকে কেউ হীন, মলিন, কদর্য্য আবেষ্টনের মধ্যে দেখিবে কেন? তরুণী নারীর চিত্ত নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন সারাক্ষণ পুরুষজাতির বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার অর্ঘ্যের অপেক্ষা করিয়া থাকে। তাহার জন্য আয়োজন না করিলে চলিবে কেন?

গা ধুইয়া যখন সে কাপড় পরিতে আসিল, তখনও যা-তা করিয়া কাজ শেষ করিতে পারিল না। খোঁপা বাঁধিতে বেশ সময় গেল। বাদামী রঙের পাতলা রেশমের ব্লাউস, তাহার হাতে এবং গলায় জরির পাড়, এবং জরির পাড় দেওয়া একটি ঢাকাই কাপড় সে বাছিয়া বাহির করিল। এ সজ্জায় ভার নাই, আড়ম্বর নাই। কিন্তু তাহার উজ্জ্বল রূপ ইহাতেই আরও দীপ্ত হইয়া উঠিল, আয়নায় নিজের চেহারা দেখিয়া সে ক্ষুদ্র একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া গেল।

ঘড়িতে দেখিল, তিনটা বাজিতে মাত্র আর কয়েক মিনিট আছে। জ্যাঠাইমা যখন চায়ের ভার নিজেই লইয়াছেন, তখন তাঁহাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া আর উত্ত্যক্ত করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

এমন সময় মহেশ ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, "দিদিমণি, তুজন বাবু এসেছেন, নীচে গাড়ীতে ব'সে আছেন, আপনাকে খবর দিতে বল্লেন।"

মায়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তাঁদের উপরে নিয়ে এসে দাদাবাবুর ঘরে বসা আর জ্যাঠাইমাকে বল্, যেন চায়ের জল চড়িয়ে দিতে বলেন।"

সে চুলটা একটু আর-একবার ঠিক করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বিজয়ের ঘরের দিকে চলিল। অতিথিরা ততক্ষণে ঘরে আসিয়া বসিয়াছে।

ভিতরে ঢুকিতেই শিবচরণবাবু বলিলেন, "এস মা, এস। এইটি আমার ছেলে দেবকুমার, এর আসবার কথা ছিল, আগেই শুনেছ। এই তোমাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে নিয়ে এলাম।"

দেবকুমার উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। মায়া প্রতিনমস্কার করিয়া নিজে বসিয়া তাহাকে বসিতে বলিল। কিছু একটা তাহার বলা উচিত, ইহা যতই বেশী করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, ততই যেন বলিবার কথা কিছুই সে খুঁজিয়া পাইল না।

বৃদ্ধ শিবচরণ কথা বলিয়া চলিলেন। মায়া এবং দেবকুমার তুজনেই চুপ করিয়া রহিল। মায়া একবার মাত্র চাহিয়া দেখিল, দেবকুমার দেখিতে সত্যই খুব সুপুরুষ। এতটা ভাল চেহারা বাঙালীর ঘরে বিরল।

২৯

সন্ধ্যার সময় বিজয় বাড়ী ফিরিয়া ঘরে ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া বলিল, "এ কি মায়া-দি, কোন্ আলাদিনের দৈত্য এসে দিন তুপুরে আমার ঘরটা একরম বদ্‌লে দিয়ে গেল?"

মায়া গম্ভীর মুখে বসিয়াছিল। বিজয়ের কথায় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "দৈত্যের মধ্যে ত আমি আর মহেশ। যা ছিরি ক'রে রেখেছিলে ঘরের, ঢুকলেই মাথা ঘুরে ওঠে।"

বিজয় বলিল, "তা না ঢুকলেই ত হয়। কি কারণে হঠাৎ আমার ঘরে তোমার শুভাগমন হ'ল? আমার কাপড়-চোপড় বই-খাতা সব ফে'লে দিয়ে ঘর পরিষ্কার করেছ নাকি?"

মায়া বলিল, "সব আছে তোমার মায়ের ঘরে, ভাবনা নেই। এখন হাত-মুখ ধুয়ে চা-টা খাও, ক্রমে সব আবর্জনাগুলিই ফিরে পাবে, কিছুর জন্যে আফসোস করতে হবে না।"

বিজয় বলিল, "চা? চা পাব কোথায় শুনি? বাবা গিয়ে অবধি ত ও জিনিষটার মুখও দেখিনি। গেলাস গেলাস জলই গিলি দুবেলা, কেবল কলেজের টিফিনের সময় ট্যাঁকে পয়সা থাকলে, বেরিয়ে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসি।"

মায়া বলিল, "আজ বাইরের দুজন ভদ্রলোক এসেছিলেন কি না, তাঁদের জন্যে চা জলখাবার সব ঘরে করা হয়েছে, তোমার জন্যেও তুলে রেখেছি।"

বিজয় বেতের চেয়ারটায় বসিয়া বলিল, "কে আবার ভদ্রলোক এল এখানে? তাই বুঝি আমার ঘর চড়াও করেছিলে?"

মায়া বলিল, "এসেছিলেন বাবার ম্যানেজার শিবচরণবাবু আর তাঁর ছেলে। ওঁদের সঙ্গেই পরশু আমি যাচ্ছি কি না, তাই আজ দেখা করতে এসেছিলেন।"

বিজয় বলিল, "ও, এমন জিনিষটা মিস্ করলাম। নানা কারণেই দেবকুমার চিজটিকে দেখবার আমার বড্ড ইচ্ছে ছিল।"

মায়ার গালের কাছটা একটু লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কি কারণগুলি শুনি?"

বিজয় বলিল, "তা নাই বা শুনলে? সব কথাই কি আর মেয়েদের সামনে বলা যায়?"

বিজয় একপালা বাঁদরামির জোগাড় করিতেছে দেখিয়া মায়া তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। জ্যাঠাইমার ঘরে আর তখনই যাইতে ইচ্ছা করিল না, সোজাসুজি ছাদের উপরে উঠিয়া গেল।

দেবকুমার এবং মায়াকে লইয়া একটা গুজব কেবলমাত্র যে রেঙ্গুনেই ছড়াইয়াছিল, তাহা নহে। কলিকাতায়ও যে একটা-কিছু কানাঘুষা পরিচিত মহলে কিছুদিন হইতে চলিতেছে তাহা মায়া ক্রমেই টের পাইতেছিল। অথচ এতদিন পর্য্যন্ত তাহারা দুজন দুজনকে চাক্ষুষ দেখে নাই পর্য্যন্ত। কিন্তু বাঙালী সমাজে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। গুজব রটানো স্বচ্ছন্দেই চলে।

আজ তাহার সহিত দেবকুমারের দেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু এমনভাবে দেখা না হইলেই যেন ছিল ভাল। দেবকুমারের কথা সে আগে অনেক শুনিয়াছে, নিজের পিতার কাছে, শিবচরণ বাবুর কাছে, বাণী ও তাহার মায়ের কাছে। সে যে কত সুশ্রী, কত বুদ্ধিমান্, এবং কতখানি উগ্র রকম নবীনপন্থী তাহা শুনিতে শুনিতে মায়ার দুই কান বোঝাই হইয়া গিয়াছে।

দেবকুমারকে দেখিবার এবং তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার কৌতূহল চিরদিনই তাহার ছিল ; দেবকুমারের চিত্তের উপর নিজের কিছু একটু প্রভাব বিস্তার করিবার ইচ্ছাও যে আপনার অজ্ঞাতসারে তাহার মনে ছিল না, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? মনে মনে এই প্রথম সাক্ষাৎ ব্যাপারটিকে কতবার কত রকম করিয়া সে ভাবিয়া দেখিয়াছে, কল্পনায় কত রকম রং তাহার উপর মাখাইয়াছে ; কিন্তু বাস্তবিক যাহা ঘটিল, তাহা মায়ার মনকে একেবারে বিরক্ত করিয়া তুলিল, দেবকুমারের উপরে নয়, নিজের উপরেই। দেবকুমার বিলাত যাইবার আগে নাকি তাহার আত্মীয়স্বজন রক্ষাকবচ-স্বরূপ তাহার গলায় একটি পত্নী ঝুলাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে সে বলিয়াছিল, "আমার আয়ার কাজ করা অভ্যাস নেই, খুকীটুকি মানুষ করতে পারব না।" জনৈক আত্মীয় বলিয়াছিলেন, "তবে তোমার মতলবখানা কি বল দেখি ? বিলাত থেকে মেম বৌ নিয়ে আস্‌বে বুঝি ?"

দেবকুমার বলিয়াছিল, "মেমের শাদা চামড়ার লোভে ত করব না, শিক্ষা দীক্ষার লোভে করতে পারি।"

মায়া এই গল্পটি বাণীর কাছে অনেকবার শুনিয়াছে। শুনিলেই তাহার মনে কেমন একটা উত্তেজনা আসিত। দেবকুমার নিজে এমন একটা কি যে, দেশের মেয়েদের প্রতি তাহার এমন অবজ্ঞা ? এমন মেয়ে কি দেশে কেহ নাই, যে, রূপে গুণে শিক্ষায় এই অবিনীতকে পায়ের তলায় টানিয়া আনিতে পারে ? সে নিজেই কি পারে না ? বাণী একদিন ঠাট্টা করিয়াছিল, "বাছাধন ফিরে এলে আশা করি তোর কাছে একটু জব্দ হবেন। সহজে ছাড়িস না।"

মনে মনে মায়া তখন হইতে আপত্তি অনুভব করে নাই, যদিও প্রকাশ্যে বাণীর পিঠে চড় মারিয়া বলিয়াছিল, "আমি ত আর সার্কাসের ট্রেণার নয় যে, যত দুরন্ত জানোয়ার বশ ক'রে বেড়াব ? তোমাদের দেবকুমার যা খুসি ভাবুক আর বলুক না, আমার তাতে কি এল গেল ?" কিন্তু ঝাপসা রকম একটা সঙ্কল্প তখন হইতে তাহার মনে ছিল, দেবকুমারের সহিত কখনও যদি তাহার পরিচয় ঘটে, তাহা হইলে মায়া তাহাকে বুঝাইয়া ছাড়িবে, বাঙালীর মেয়েও এমন আছে, যে, মেমের চেয়ে কোনো অংশে হীন নয়।

কিন্তু আজ দেবকুমার তাহাকে দেখিয়া কি ভাবিল কে জানে ? নিতান্ত মায়ার চেহারা দেখিয়া যদি কিছু মুগ্ধ হইয়া থাকে, তাহাও বিশেষ হইবার

কথা নয়। কারণ মায়া সুন্দরী হইলেও, সদ্য বিলাত-ফেরতের তাহাকে এমন কিছু অপরূপ রূপসী মনে নাও হইতে পারে। অন্য কোনো দিকে সে মূর্খ পাড়াগেঁয়ে মেয়ে অপেক্ষা বিন্দুমাত্রও ভাল ব্যবহার করিতে পারে নাই। শিবচরণবাবু যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাঁহাকে হাঁ কিংবা না উত্তর দিয়াছে মাত্র। দেবকুমারের সহিত একটাও কথা বলে নাই। দেবকুমার তাহাকে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতেছে, তাহা সে লক্ষ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু সপ্রতিভ ভাবে একবারও তাকাইয়া তাহাকে দেখিতে পারে নাই। ছি, ছি, এ কি কাণ্ড! বিলাত-ফেরত ছেলেটি বাড়ী ফিরিয়া মনে মনে হয়ত প্রচুর হাসিয়া লইয়াছে। মায়ার কথা সেও আগে কিছু শুনিয়া থাকিবে। তাহাকে কিরূপ কল্পনা করিয়াছিল, কে জানে? বাস্তবে এবং সেই কাল্পনিক মূর্ত্তিতে কতখানি প্রভেদ দেখিল, তাহা বলা যায় না।

যাইবার সময় দেবকুমার নমস্কার করিয়া বলিয়াছিল, "আচ্ছা, আসি তবে, ষ্টীমারে আবার দেখা হবে।"

মায়া তাহার উত্তরেও সামান্য একটা 'হাঁ' ছাড়া আর কিছুই বলিয়া উঠিতে পারে নাই।

মোটের উপর সমস্ত ব্যাপারটাই হাস্যকর হইয়াছিল। উহারা না আসিলেই ছিল ভাল। নিঃসম্পর্কীয় যুবকের সহিত আলাপ-পরিচয় করা মায়ার কাছে কিছু নূতন নয়, সর্ব্বদাই সে সপ্রতিভ ভাবে আলাপ করিতে পারিয়াছে, আজই তাহাকে কি ভূতে পাইল কে জানে?

নীচ হইতে তাহার জ্যাঠাইমা ডাকিয়া বলিলেন, "মায়া, নীচে আয়, খাবার দেওয়া হয়েছে যে। আজ কি আর ছাদ থেকে নামবিই না?"

হাজার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে সন্ধ্যার ধূসর ম্লান আলো রজনীর গাঢ় কালিমায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, মায়া তাহা লক্ষ্যও করে নাই। যাক্, আর ভাবিয়া কি হইবে? যদিও আজ বিকালের ব্যাপারটা না ঘটিলেই সে খুসী হইত, তাহা হইলেও ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে মনে করিবার কোনো কারণ নাই। না-হয় দেবকুমার তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ না-ই হইয়াছে। কেবল তাহাকে মুগ্ধ করিবার জন্যই ত মায়ার জন্ম হয় নাই? জগতে কত কাজ হয়ত তাহার জন্য পড়িয়া আছে।

এই কথা মনে হইতেই তাহার প্রভাসের কথা মনে পড়িল। স্কুল-করা বিষয়ে মায়া এখন পর্য্যন্ত ত কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

সাবিত্রীর এ-সকল বিষয়ে খুব যে সহানুভূতি ছিল, তাহা মনে হয় না। অথচ জনহিতের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, স্কুলটাই গ্রামের পক্ষে সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। প্রভাসকে বিস্তৃত ভাবে চিঠি লিখিয়া সব বিষয় আলোচনা করা মায়ার উচিত ছিল রেঙ্গুন যাইবার আগেই, কিন্তু কিছুই সে করে নাই। স্কুলের জন্য কত টাকা লাগিবে, সেটা এক সঙ্গে লাগিবে, না বারে বারে দিলেও চলিবে, এ সব কথাও ভাল করিয়া জানিয়া গেলে হইত। নিরঞ্জনকে না জানাইয়া শেষ অবধি চলিবে কি না, তাহাই বা কে জানে? নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে মায়া নীচে নামিয়া গেল।

মাঝের দিনটা যাত্রার আয়োজনেই কাটিয়া গেল। মায়া একটি মাত্র মানুষ, কিন্তু নিজের এবং বাণীর জন্য জিনিষ যাহা জুটাইয়াছিল, তাহা গুছাইতেই তাহার প্রাণ বাহির হইবার জোগাড় হইল। বিজয় বলিল, "একটা কেবিনে ধরবে ব'লে ত মনে হচ্ছে না, আর একটার জন্যে লেখ।"

বাড়ীতে বড়ছেলে একমাত্র বিজয়, সে-ই মায়াকে জাহাজে তুলিয়া দিতে চলিল। জয়ন্তী আসিবে বলিয়াছিল, সেও আসিতে পারিল না, তাহার কোলের মেয়েটির সর্দ্দিজ্বর হইয়াছে। বিজয় হাজার হইলেও ছেলেমানুষ, এ কর্ম্মে বিশেষ অভ্যস্ত নয়; মায়ার ভাবনা হইতেছিল, জাহাজঘাটের হাজার হাঙ্গামা বাঁচাইয়া সে মায়াকে ঠিক উঠাইয়া দিতে পারিবে কি না। অন্যান্য বারে নিরঞ্জন সঙ্গে থাকেন, তাহাকে কিছুই ভাবিতে হয় না।

ঘাটে পৌছিতেই দেখা গেল, শিবচরণবাবু এবং দেবকুমারও সেইমাত্র আসিয়া পৌছিয়াছেন, জিনিষপত্র নামানো হইতেছে। দেবকুমারের জিনিষই বেশীর ভাগ, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের ছাপ মারিয়া তাহারা বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে। শিবচরণবাবুর জিনিষের মধ্যে ছোট একটি ট্রাঙ্ক, এবং সতরঞ্চিতে জড়ানো বিছানা। জলের কুঁজা এবং বেতের প্যাটরাও আছে বোধ হইল। অর্থব্যয় সম্বন্ধে বৃদ্ধ সর্ব্বদাই অত্যন্ত সর্তক, কখনও ডেক্ ভিন্ন কেবিনে যাতায়াত করেন না। এবারে ছেলে সঙ্গে থাকায় কিছু বিপদে পড়িয়াছেন। দেবকুমার যে রকম সাহেব হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে ডেকে যাইবার কথা বলাও যায় না, অথচ পুত্র কেবিনে গেলে, পিতা ডেকে যাইবেন, ইহাও হয় না। সুতরাং দুজনের জন্যই সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট করিতে হইয়াছে।

জাহাজ-ঘাট তখন লোকে লোকারণ্য। যাত্রী, যাত্রীর বন্ধু, কুলি এবং

জাহাজ-ঘাটের অন্যান্য লোক মিলিয়া এমন একটা বিরাট্ জনতার সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহার ভিতর দিয়া যাওয়ার কথা ভাবিতেও ভয় হয়। থার্ড ক্লাসের যাত্রীগুলি নিজেদের পোঁটলা-পুঁটলি সব নিজেরাই বহন করিয়া আনিয়াছে, এবং আগেভাগে কাঠগড়া পার হইয়া স্টীমারে উঠিবার জন্য এমন ভীষণ ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়াছে যে, সেদিকে, স্ত্রীলোক কেন, কোনো ভদ্র পুরুষমানুষেরও যাওয়া প্রায় অসম্ভব। মায়া ট্যাক্সি হইতে নামিয়া বলিল, "কি রে বিজয়, আজ শেষ অবধি উঠতে পারব ব'লে মনে হচ্ছে?"

বিজয়ের নিজেরও সে বিষয়ে একটু যে সন্দেহ না হইতেছিল এমন নয়, তবু মুখে খুব সাহস দেখাইয়া বলিল, "না, পারবে কি আর, এইখানেই থেকে যাবে! আপাততঃ কুলি ডাকিয়ে, জিনিষপত্রগুলো ত নামানো যাক।"

কুলি ডাকিবার কোনোই প্রয়োজন ছিল না, গাড়ী আসিবামাত্র যে পরিমাণ কুলি আসিয়া তাহার উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল, তাহারা এক হাজার যাত্রীর মাল স্বচ্ছন্দে বহন করিতে পারিত। মায়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বিদায় কর, বিদায় কর, একটা কি দুটোকে রাখ, এখনি টানাটানি ক'রে অর্দ্ধেক জিনিষ নষ্ট ক'রে ফেলবে।"

এমন সময় পিছন হইতে কে যেন বলিল, "আপনি ভীড় থেকে বেরিয়ে আসুন, জিনিষপত্রের ব্যবস্থা আমি করছি। বাবা ঐদিকে ব'সে আছেন, তাঁর কাছে বস্‌বেন চলুন।"

মায়া ফিরিয়া দেখিল, দেবকুমার। দ্বিতীয় সাক্ষাতে আর বোকামি চলিবে না বলিয়া সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছিল। তাড়াতাড়ি বিজয়কে দেখাইয়া বলিল, "এই আমার জ্যাঠামশায়ের মেজ ছেলে বিজয়। আপনি তাহলে ওকে নিয়ে জিনিষগুলোর গতি করুন, আমি যাই।"

ভীড়ের একপাশে একগাদা জিনিষের মধ্যে বৃদ্ধ শিবচরণবাবু বসিয়া ছিলেন, দেবকুমার মায়াকে সেইখানে লইয়া আসিয়া বলিল, "এইখানে বসুন. ওঠবার পথ একটু মুক্ত দেখলে আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব।" জিনিষপত্রের গাদা হইতে সে একটা ডেক চেয়ার টানিয়া বাহির করিয়া মায়ার জন্য পাতিয়া দিল। কয়েকটা ইংরাজী ম্যাগাজিন এবং খবরের কাগজ বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, "ততক্ষণ এইগুলো উল্টে সময় কাটান। আশা করি খুব বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।"

দেবকুমার চলিয়া গেল। মায়া বসিয়া বসিয়া ছবি দেখিতে দেখিতে

ভাবিতে লাগিল। ছেলেটির ভদ্রতার কোনো ত্রুটি অন্ততঃ নাই। দেশী ভদ্রতা হইতে একটু পার্থক্যও আছে। বিজয়, অজয় অথবা তাহার বাবা সঙ্গে থাকিলে তাহাকে ভীড় হইতে সরাইয়া আনা পর্য্যন্ত করিতেন বটে, তবে চেয়ার পাতিয়া বসানো বা ম্যাগাজিন পড়িতে দেওয়া পর্য্যন্ত হইত কিনা সন্দেহ। বিলাত হইতে ছেলেটি সবে ফিরিয়াছে, তাই এ-সব অতি-সৌজন্য এখনও ছাড়িতে পারে নাই। কিন্তু ইহাতে মায়াকে বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট বোধ হইল না, যদিও অতি-সাহেবীআনাকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করা অভ্যাসটা তাহার এখন পর্য্যন্ত একেবারে যায় নাই।

মিনিট-কয়েক পরে দেবকুমার আসিয়া বলিল, "চলুন, এইবার একটুখানি লাইন্ ক্লিয়ার পাওয়া গেছে।"

মায়া এবং শিবচরণবাবু উঠিয়া পড়িলেন। সঙ্গের জিনিষপত্র দুইজন কুলি ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইল। ডাক্তারের পরীক্ষা প্রভৃতি অতি সংক্ষেপে সারিয়া, তাহারা সিঁড়ির কাছে আসিয়া পৌঁছিল। দেবকুমার বলিল, "এই বড় ট্রাঙ্কটা নিয়ে কুলিটা উঠুক, আপনি ঠিক তার পিছনে যান, আমি থাকব তার পরেই। এরকম ক'রে উঠলে আপনাকে আর গুঁতো খেতে হবে না।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "জিনিষপত্রগুলো সব ঠিক এসেছে ত? ক'টা ছিল তাও আপনাকে বল্‌তে ভুলে গেছি।"

দেবকুমার বলিল, "সে আমি গাড়ী থেকে নামাবার সময়েই গুণে নিয়েছি। সব লাইন ক'রে পিছনে আসছে, বিজয়বাবু তাদের রিয়ার গার্ড হয়ে আসছেন, আপনার কোনো ভাবনা নেই, উঠে পড়ুন।"

মায়া উপরে উঠিয়া গেল। 'বয়' সাম্‌নেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার সাহায্যে সহজেই নিজের কেবিন খুঁজিয়া পাইল। জিনিষপত্রও শীঘ্রই আসিয়া পড়িল। দেবকুমার এবং বিজয় মিলিয়া সেগুলির সুব্যবস্থা করিতে লাগিল। বিজয় বলিল, "মায়া-দি, অকারণ কতকগুলো টাকা বাজে খরচ করলে, অনেক ত জায়গা প'ড়ে রইল, আর একজন লোক অন্ততঃ বেশ যেতে পারত।"

দেবকুমার বলিল, "একটুখানি খালি জায়গা যে কি রকম মূল্যবান্ জিনিষ, তা জাহাজে চ'ড়ে কিছু দূরে যদি যান, তাহ'লেই বুঝতে পারবেন। স্বজাতি-প্রীতি কমাবার এতবড় ওষুধ আর নেই। বিশেষ ক'রে আমাদের স্বজাতি যাঁরা, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, ঘরের বাইরের লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে তাঁরা মোটেই জানেন না।"

জিনিষ গোছানো হইয়া যাইতেই দেবকুমার বলিল, "আচ্ছা, একটু আমাদের কেবিনটার গতি ক'রে আসি। বাবা বোধ হয় জিনিষপত্র নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

সে বাহির হইয়া যাইতেই বিজয় বলিল, "আমার আসবার কিছু দরকারই ছিল না, মায়া-দি, যা গ্যাল্যাণ্ট্ সঙ্গী তুমি জুটিয়েছ।"

মায়া বলিল, "আমি আর কোথায় জুটালাম, বাবাই জুটিয়ে রেখেছেন। তা ভালই ত হ'ল। তোমাকে বেশী খাটতে হ'ল না। পূজোর ছুটিতে আসছ ত ঠিক?"

বিজয় বলিল, "সে অনেক পরের কথা। ততদিনে কত কি ঘ'টে যেতে পারে।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "অনেক কিছু ঘটলে ত আরও আসা উচিত।"

৩০

রেঙ্গুন-যাত্রী জাহাজটি সমুদ্রের নীল জলরাশি ভেদ করিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়াছিল। বাহির হইতে শোনা যায় কেবল এঞ্জিনের শব্দ, কেবল সফেন তরঙ্গরাজির জাহাজের অঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়ার শব্দ। দুপুরে জাহাজের ভিতরটা একটু যেন নিস্তব্ধ থাকে। খাওয়া-নাওয়ার হাঙ্গাম নাই, ডেকের যাত্রীর দল অধিকাংশই চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। দুই-চারিজন উঠিয়া বসিয়া সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেছে, এবং আশেপাশে সহযাত্রিণী কেহ দর্শনযোগ্যা আছে কিনা, তাহারই সন্ধান লইতেছে। বাঙ্গালীবাবু ডেকযাত্রীও কিছু কিছু আছেন, তাঁহারা হয় মাসিকপত্র বা খবরের কাগজ পড়িতেছেন, নয় তাস খেলিতেছেন। বর্ম্মা চুরুটের উৎকট গন্ধে স্থানটি ভরপুর। ছেলে-পিলেরা এদিক্ ওদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, মেয়েরা স্থানে স্থানে জটলা পাকাইয়া গল্প করিতেছে। জাহাজে কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, সময় যেন আর কাটিতেই চায় না।

মায়া কেবিনের মধ্যে শুইয়া, বসিয়া, বৃথা কাগজ পড়িবার চেষ্টা করিয়া, একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। আজ ত সবেমাত্র প্রথম দিন, এখনও পুরা দুইটা দিন বাকি। আরামের জন্য একলা একটা কেবিনে আসিয়া তাহার যেন আরও বিপদ্ হইয়াছিল। সঙ্গিনী থাকিলে যেমন নানাদিক্

য়া আলাতন হইতে হয়, তেমনি দুইটা কথাও তাহার সঙ্গে বলা চলে।
এই ত মাত্র কয়েক ঘণ্টা জাহাজ ছাড়িয়াছে, ইহারই ভিতর তাহার প্রাণ
অস্থির হইয়া উঠিল, বাকি সময়টা কাটিবে কি করিয়া? খোঁজ লইলে হয়,
জাহাজে বাঙালী সহযাত্রিণী কেহ আর আছে কিনা, তাহা হইলে যাইয়া
খানিক গল্প করিয়া আসিতে পারে। তাহার প্রথমবারের সমুদ্র-যাত্রার
কথা মনে পড়িল। সেবার বাণী এবং বাণীর মা সঙ্গে থাকায়, তাহাদের
কোনো ভাবনা ছিল না সময় দিব্যই কাটিয়া গিয়াছিল।

কেবিনের দরজার গায়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইল। হয়ত জাহাজের
ভাণ্ডারী রান্নার জোগাড় লইতে আসিয়াছে মনে করিয়া মায়া বলিল, "ভিতরে
এস।"

দরজাটা অল্প খুলিয়া গেল, কিন্তু ভিতরে কেহ প্রবেশ করিল না দেখিয়া
কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "আমি দেবকুমার। একলা কেবিনে
ব'সে আছেন, তাই জানতে এলাম যে, ডেকে একটু বেড়াতে যাবেন
কি না।"

মায়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া, চটি পায়ে দিয়া দরজার কাছে অগ্রসর হইয়া
গেল। দেবকুমার সাহেবী পোষাক ছাড়িয়া, বাঙালী সাজিয়া আসিয়াছে।
মায়াকে দেখিয়া বলিল, "চলুন না ডেকে? বেশ হাওয়া আছে, এই 'স্টাফী'
খাপটার মধ্যে একলা ব'সে ব'সে করবেন কি? জাহাজ না জাহাজ। ঠিক
যেন মোচার খোলা, একটু ন'ড়ে বসতে গেলেই অন্য কারো ঘাড়ে গিয়ে
পড়তে হয়।"

মায়া ত তখন যাইতে পারিলেই বাঁচিয়া যায়। কিন্তু ডেকে যাইতে
হইলে ঠিক এই ভাবে যাওয়া যায় না। কাজেই বলিল, "আচ্ছা, আপনি
এগোন, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।"

দেবকুমার তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। পাঁচ মিনিটের বেশী সময় অবশ্য
মায়ার লাগিল। চুল বাঁধিতে হইল, স্যুটকেস্ খুলিয়া শাড়ী ব্লাউস সব
বদলাইতে হইল। শাদা কাপড় পরিয়া যাইতে কিছুতেই তাহার মন উঠিল
না। হাল্কা গোলাপী রংএর ক্রেপের পোষাক পরিয়া, গলায় একছড়া
প্রবালের মালা দুলাইয়া সে উপরে চলিল। চটি ছাড়িয়া একজোড়া নাগরা
জুতা পরিয়া গেল।

দেবকুমার তাহার জন্য সিঁড়ির মুখেই অপেক্ষা করিতেছিল। মায়ার
দেখিয়া বলিল, "চলুন, এখন লোকে বেশী নেই, আরাম ক'রে বসতে
পারবেন।"

দুইজনে উপরের ডেকে উঠিয়া গেল। নিজের ডেক-চেয়ারখানির পাশে
দেবকুমার আরও একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া রাখিয়াছে ; বই, ম্যাগাজিন,
খবরের কাগজ, প্রভৃতিতে তাহার একখানা সম্পূর্ণ বোঝাই।

মায়া একটা চেয়ারে আসিয়া বসিতেই দেবকুমার তাহার পাশেরটিতে
আসিয়া বসিয়া দিব্য অসঙ্কোচে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল। মায়ার সামান্য
একটু সঙ্কোচ যাহা ছিল, দেবকুমারের ব্যবহারে সেটাও কাটিয়া গেল।

দেবকুমার বলিল, "আচ্ছা, 'সি-ভয়েজ' আপনার কেমন লাগে
বেশ কয়েকবারই এই লাইনে গিয়েছেন এসেছেন না ?"

মায়া বলিল, 'না, খুব বেশীবার কি আর ? এই নিয়ে বার-চারেক হ'ল
আমার মোটেই ভাল লাগে না, সময় কিছুতেই কাটতে চায় না। ঘড়ি দে'খে
দে'খে আমার ত চোখ ব্যথা করতে থাকে।"

দেবকুমার বলিল, "প্রতিবারেই কি একলা এক কেবিনে থাকেন ?"

মায়া বলিল, "না, প্রথমে ত আমার এক পিসীমা সঙ্গে ছিলেন। তারপ
অন্য লোকের সঙ্গেও এসেছি, কিন্তু এত বেশী অসুবিধা হয় যে বাব
লিখেছিলেন এবারে একটা কেবিন রিজার্ভ ক'রে যেতে। এতেও এক বিপদ
সারাক্ষণ হাঁ ক'রে একলা ব'সে থাকতে থাকতে প্রাণ যেন বেরিয়ে আসে

দেবকুমার বলিল, "কিই বা দরকার ও খুপরীটার মধ্যে সারাক্ষণ ব'সে
থাকবার। খাওয়া, নাওয়া, ঘুমোনো ছাড়া সব সময়টাই ডেকে থাকতে
পারেন। ওদিক্কার বড় বড় জাহাজগুলোতে ডেক্ ত কোনো সময় খালি
দেখবার জো নেই। হয় খেলা চলছে, নয় গান-বাজনা, নয় গল্প। নিদে
পক্ষে চুপচাপ ব'সে সমুদ্রও ত দেখা যায়। কেবিনের মধ্যে সে সুবিধেও
নেই !"

মায়া বলিল, "তা এলে হয়, তবে সব সময় একলা হট্ হট্ ক'রে আসা
যেতে ভাল লাগে না। ডেকের এই পাশের লোকগুলো এমন অসভ্যের ম
তাকিয়ে থাকে, যে, তাদের সাম্‌নে দিয়ে যাওয়া-আসা করাই এক 'ট্রায়াল্'

দেবকুমার বলিল, "যতবার বলবেন ততবার গিয়ে আমি নিয়ে আসব
বয়টাকে বললেই সে আমায় ডেকে দেবে।"

মায়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "আপনি আবার কষ্ট ক'রে বার বার আসবেন—"

দেবকুমার বলিল, "কষ্ট আবার কি? আমি ত বেঁচে যাই, সারাদিন একলা হাঁ ক'রে ব'সে থাকতে আমার বুঝি বড় ভাল লাগে? এক এক সময় ইচ্ছে করে, ঐ মেড়োগুলোর সঙ্গেই গিয়ে ভাব করি।"

মায়া অন্য কথা পাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, এতকাল বিলেতে থেকে এসে দেশটা আপনার কেমন লাগছে?"

দেবকুমার বলিল, "তা ত বলা শক্ত। এক-একদিক্ দিয়ে বেশ খারাপই লাগে, যেমন রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর সবই বেশী নোংরা লাগে, মানুষগুলিকেও একদিকে অসভ্য এবং অভব্য মনে হয়। অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে কি নিয়ে যে আলোচনা করব ভেবে পাই না, নিতান্ত নিজের বয়সী ছেলেছোক্‌রার দলের সঙ্গে ছাড়া। আবার এতকাল পরে আত্মীয়স্বজন সবাইকে দেখছি, সেটা ভাল লাগছে। লণ্ডনের ধোঁয়া আর কুয়াসার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নীল আকাশ, চাঁদ-তারাগুলো দেখতে পাচ্ছি, এটাও ভাল লাগছে। হাজার কাঠখোট্টা হলেও দেশের মাঠ, ঘাট, বন, নদী দেখে খুসী না হয় এমন লোক আর ক'টা আছে?"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি রেঙ্গুনেই প্র্যাকটিস্ করবেন, না কলকাতায় ফিরে আসবেন?"

দেবকুমার তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "রেঙ্গুনে করাই এক রকম স্থির ক'রে ফেলেছি।"

হয়ত তাহার তাকানো এবং কথার মধ্যে বিশেষ কোনোই অর্থ ছিল না, তবু মায়ার কানের কাছটা লাল হইয়া উঠিল এবং কিছুক্ষণের জন্য সে থামিয়া গেল।

দেবকুমার বলিল, "গিয়ে দিন-কতক সারা বর্মা ঘুরব ঠিক করেছি। তারপর বাবাকে নিয়ে পড়তে হবে, তাঁর মেসে বাস ঘোচাবার জন্যে। এক ঘরে দশজন মানুষ বাস ক'রে ক'রে এমনি অভ্যাস করেছেন, যে একটা ঘরে একলা থাকতেই তাঁর অসুবিধা বোধ হয়। বাড়ীতে একটার বেশী দুটো চাকর বা দুটোর বেশী তিনটে তরকারি দেখলেই তিনি অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে ওঠেন।"

মায়া বলিল, "তবে ত আপনার বড় অসুবিধা হবে।"

দেবকুমার বলিল, "তিনি ষাট বছরের বুড়ো হয়ে যা সহ্য করতে পারেন,

আমি ইয়ংম্যান্ হয়ে যদি তা না পারি, তাহ'লে ত আমার ডুবে মরা উচিত। নিজের জন্যে ততটা নয়, তাঁরই জন্যে আমি একটু ব্যবস্থা বদল করতে চাইছি। আচ্ছা, বর্মাটা আপনার কেমন লাগে ?"

মায়া বলিল, "মন্দ নয়। ওখানে যাবার আগে ত একেবারেই পাড়াগাঁয়ে থাকতাম ? ওখানে সবই নূতন রকম, কাজেই প্রথম প্রথম যদিও কয়েকদিন অসোয়াস্তি লেগেছিল, তারপর থেকেই মন্দ লাগে না। সারাক্ষণই একটা কিছু নিয়ে থাকতে হয়, কাজেই খারাপ লাগবার অবসরও থাকে না।"

দেবকুমার বলিল, "আপনার বাবা ত বহুকাল এখানে, আপনারা এর আগে একবারও আসেন নি যে ?"

অন্য মানুষ হইলে এ প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয় ভাল করিয়া পাইত না। মায়া যেমন করিয়া হোক কথাটা ফিরাইয়া দিত। কিন্তু কেন জানি না, দেবকুমারের কথার উত্তর না দিয়া সে থাকিতে পারিল না। বলিল, "মা সাহেবীআনা বড় বেশী অপছন্দ করতেন, তাই তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন আমাদের আর আসা হয়নি। মা মারা যাবার পর বাবা আমাকে আর পিসীমাকে নিয়ে যান।"

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার পিসীমা এখনো ওখানে আছেন নাকি ?"

মায়া বলিল, "না, তিনি বছরখানেক ওখানে থেকেই দেশে ফিরে যান। এবারে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে বাবা খুবই জেদ করেছিলেন, তিনি কিছুতেই এলেন না।"

দেবকুমার বলিল, "তাহলে রেঙ্গুনের ঘরসংসার সব আপনাকেই তদারক করতে হয় ?"

মায়া হাসিয়া বলিল, "তদারক ত ভারি ! একপাল চাকর-ঝি আছে তারাই সব করে।"

দেবকুমার বলিল, "সেই ত আরও মুস্কিল। নিজে কাজ করা বরং সহজ কিন্তু একপাল 'ইন্‌এফিশিয়েন্ট' লোককে দিয়ে মনের মত ক'রে কাজ করানো খুবই শক্ত ব্যাপার। বিলেতে একটা ঝি যা কাজ করে, এখানে তিন-চারটে চাকর দিয়ে সে কাজ পাওয়া যায় না।"

মায়া বলিল, "এপর্য্যন্ত যত বিলেত-ফেরত দেখলাম, ওদেশের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। ওখানের সব কিছু কি সত্যিই এত ভাল ?"

দেবকুমার হাসিয়া বলিল, "সবই ভাল মোটেই নয়। তবে কোনো কোনো বিষয়ে ভাল বই কি? আবার আমাদের দেশেও এমন জিনিষ আছে, যা ওখানে একেবারে দুর্লভ।"

এমন সময় খাওয়ার ঘণ্টা বাজিয়া ওঠাতে দেবকুমার উঠিয়া পড়িল। বলিল, "যাই, এ ব্যাপারটা সেরে আসি। এ লাইনে সেকেণ্ড ক্লাসে এমন বাজে খাওয়া দেওয়া হয় জানলে আমি 'উইথ্ ডায়েট্' টিকিট করতাম না। বাবার মত চাল ডাল পুঁটলি বেঁধে আনতাম। বাবা আবার এমন হিসেবী মানুষ যে, একমুঠো কিছু বেশী আনেন নি। কাজেই এখন ব্যবস্থা বদলানো চলে না।"

খাওয়া-দাওয়ায় কাহারও অসুবিধা হইতেছে শুনিলে স্ত্রীজাতির মন কখনও অবিচলিত থাকিতে পারে না। মায়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "ও মা, আপনি এত কষ্ট করছেন কেন? আমার সঙ্গে যা দিয়ে দিয়েছেন জেঠাইমা, তাতে চারজন লোক দশদিন ব'সে খেতে পারে। আমি কাল থেকে আপনাকে খাবার পাঠিয়ে দেব, আপনি জাহাজের খাবার খাবেন না। আজ রাত্রেও, বলেন ত, পাঠিয়ে দিই!"

দেবকুমার বিন্দুমাত্র আপত্তি করিল না। হয়ত মায়াকে এই কথা বলাইবার জন্যই সে খাওয়ার দুঃখ বর্ণনা করিতে বসিয়াছিল। মায়া ঠিক ততটা বুঝিল কিনা সন্দেহ; তবে একটা কিছু বুঝিল বটে। দেবকুমার শুধু বলিল, "আপনার যদি অসুবিধা না হয়, তাহ'লে আমি ত বেঁচে যাই। চলুন, আপনাকে কেবিনে রেখে আসি, আবার বিকেল বেলা আসছেন ত?"

মায়া বলিল, "আচ্ছা, একেবারে ভাঁড়ার টাঁড়ার লোকটাকে বের ক'রে দিয়ে, চা খেয়ে আসব।"

দেবকুমার মায়াকে কেবিন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। মায়া ঘণ্টা বাজাইয়া ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া পাঠাইয়া, রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করিতে বলিল। ও বেলা ডাল ভাত নিরামিষ তরকারিতেই কাজ চালাইয়াছিল। এ বেলা তাহাতে মন উঠিল না। দেবকুমারকে সে এক রকম নিমন্ত্রণ করিয়াই আসিয়াছে, জাহাজের খাওয়ার চেয়ে ভাল না খাওয়াইতে পারিলে সে কি মনে করিবে? ভাণ্ডারীর কাছে খোঁজ লইয়া জানিল, ডিম, মাংস, এমন কি কই-মাগুর মাছ পর্য্যন্ত পয়সা দিলে জাহাজেই পাওয়া যায়।

মাছ কি রকম দর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কইমাছ এক আনা করিয়া

একটা, শিঙি মাগুর ছুই আনা করিয়া, কারণ সেগুলিকে আরও বেশীদিন বাঁচাইয়া রাখা যায়। মায়া ছয় আনা পয়সা দিয়া ছয়টা কই মাছ কিনিয়া রাঁধিতে বলিয়া দিল। তরকারিও প্রচুর পরিমাণে ঢালিয়া দিল।

নিজের চা খাওয়া হইয়া যাইবার পর হাতমুখ ধুইয়া, চুল বাঁধিয়া, আবার বেশ পরিবর্তন করিল। তাহার কাপড় ছাড়া শেষ হইতে-না-হইতে কেবিনের দরজায় আবার টোকা পড়িল।

মায়ার মুখে একটু হাসি দেখা দিল। প্রথম সাক্ষাতের দিন তাহার যে ভয় হইয়াছিল, তাহা ত একান্তই অমূলক দেখা যাইতেছে। দেবকুমার যে নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরেই এতটা করিতেছে, তাহা কিন্তু মায়ার মনে হইল না। ইহা অপেক্ষা যথেষ্ট কম করিলেও ভদ্রতা রক্ষা হইত। বৃদ্ধ শিবচরণবাবু জাহাজ ছাড়ার পর একবারের বেশী কেবিনের দিকে আসেন নাই। জাহাজে উঠিলেই তিনি কিছু অসুস্থ বোধ করেন, ইহা একটা কারণ; তাঁহার পুত্র নিশ্চয় মায়ার যথেষ্ট তত্ত্বাবধান করিবে, এ বিশ্বাসও একটা কারণ হইতে পারে।

দেবকুমারের আগ্রহাতিশয্যে মায়ার মনেও যে কোনো রেখাপাত হয় নাই, তাহা বলা যায় না। ঠিক এইভাবে কেহ এ পর্য্যন্ত তাহার নিকট আসিবার চেষ্টা করে নাই। রেঙ্গুনে সে বাড়ীতে একলা, তাহার পিতা সারাদিন প্রায় বাহিরে ঘুরিতেন, সুতরাং মায়ার সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার যথেষ্ট ইচ্ছা থাকিলেও কোনো যুবক বেশী আমল পাইত না। মায়ার মনোরাজ্য এতদিন অতিথিহীনই থাকিয়া গিয়াছিল।

এই একদিনের মধ্যেই সেখানে যেন একটা পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল। দেবকুমার যতখানি আগ্রহ করিয়া তাহার কাছে আসিতে চাহিতেছিল, মায়ার মনের কোণেও যেন তাহার সাড়া জাগিয়া উঠিতেছিল। সে কি শুধু ভদ্রতার খাতিরেই এতটা করিতেছিল? মৃদু পুলকের শিহরণ কি থাকিয়া থাকিয়া তাহার হৃদয়কে দোলা দিতেছিল না? অথচ, কে এই যুবক, কোথা হইতে আসিয়া একদিনেই মায়ার হৃদয়রাজ্যে এতখানি আলোড়ন সৃষ্টি করিল? কয়েকদিন পূর্ব্বে ইহার নাম ভিন্ন সে কিছুই জানিত না। সত্যই কি মানুষকে জয় করিবার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয় না? শুধু শুভক্ষণের প্রয়োজন?

কিন্তু অধিক ভাবিবার সময় ছিল না। দ্বারে অতিথি তখনও দাঁড়াইয়া। মায়া কাপড় পরা শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

আজ জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছিবার দিন। সকাল হইতেই যাত্রীদের মধ্যে জিনিষপত্র গুছাইয়া পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিবার বড় ধুম লাগিয়া গিয়াছে। ডাঙার জীবের প্রাণ কয়েকদিন জলের উপর থাকিয়াই একেবারে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, আজ আবার ডাঙায় নামিবার সম্ভাবনায় সকলেই উৎফুল্ল। যাহারা এই তিন দিন খালি মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিয়াই কাটাইয়া দিয়াছে, তাহারাও আজ উঠিয়া বসিয়াছে, সহযাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছে। যাহারা নূতন ব্রহ্মদেশে যাইতেছে তাহারা পুরাণো বাসিন্দাদের কাছে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মগের মুল্লুকের গল্প শুনিতেছে। পুরাতন প্রবাসীরাও নিজের বহুদিন-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া বেশ একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে।

জলের রং ফিকা সবুজ হইয়া আসিয়াছে, দিক্-চক্রবালের কাছে তটভূমির অস্পষ্ট রেখা দেখা যায়। যাত্রীদের মধ্যে মহিলা যাঁহারা, তাঁহারা এরই মধ্যে সব কাজকর্ম সারিয়া নামিবার জন্য ফিটফাট হইয়া বসিতে পারিলে বাঁচেন। ছেলেমেয়েদের সাজসজ্জা এরই মধ্যে একরকম সারা হইয়া গিয়াছে। কর্ত্তাদের কোনোই তাড়া দেখা যায় না, কেহ বা নিশ্চিন্ত মনে খবরের কাগজ পড়িতেছেন, কেহ চুরুট ফুঁকিতেছেন, এমন কি এক-আধজন তাস খেলিবার জোগাড় পর্য্যন্ত করিতেছেন। গিন্নীদের তাড়া আসিলে বলিতেছেন, "রোস, রোস, এখনও কম ক'রে চার ঘণ্টা দেরি আছে। তার ভিতর পঞ্চাশবার কাপড় ছাড়া হয়ে যাবে। এখনই কি জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সাঁতরে যেতে চাও?"

মায়ার কেবিনেও গোছান চলিতেছিল। একলা মানুষ কাজ বেশী নাই, কিন্তু তাও যেন অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। মায়ার মুখ বড় গম্ভীর, কি যেন একটা ভাবনা তাহার মনে গভীর ছায়াপাত করিয়াছে, কিছুতেই ক্ষণমাত্রও সেটার হাত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই। অন্যমনস্কভাবে সে কাপড়-চোপড় পাট করিয়া সুটকেসে ভরিয়া রাখিতেছিল।

হঠাৎ কেবিনের দরজায় ঠক্‌ঠক্ করিয়া শব্দ হইল। মায়ার মুখে একটুখানি হাসি দেখা দিল। সে উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া বলিল, "এখনও আমার ঢের কাজ বাকি, প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগবে।"

আগন্তুক যে দেবকুমার তাহা বলাই বাহুল্য। সে বলিল, "যেমন তেমন ক'রে ঠেসে রেখে দিন না? এরপর ত খুলে আবার গুছিয়ে রাখতেই হবে।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "কিন্তু জিনিষগুলোর চিরদিনের মত শ্রাদ্ধ পিণ্ডি হয়ে যাবে যে! আপনারও বোধ হয় এখনও গোছান হয়নি? আপনার হ'তে হ'তে আমারও হয়ে যাবে।"

দেবকুমার ক্ষীণ হাস্য করিয়া বলিল, "আমার আবার গোছান? পুরুষ মানুষকে ভগবান্ গোছান জিনিষ আগোছাল করবার জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন। দেখেন না, যে-পরিবারে গৃহিণী খুব গোছাল হন, কর্ত্তা হন ঠিক তার উল্টো? মেয়ে আগোছাল যেমন দেখতে বিশ্রী লাগে, গোছাল পুরুষ মানুষ দেখতে তেমনি হাস্যকর লাগে।"

মায়া বলিল, "মন্দ নয়। নিজেদের দোষগুলোকে গুণ ব'লে খাড়া ক'রে দিচ্ছেন? ভগবান্ আপনাদের নিশ্চয় ও রকম ক'রে সৃষ্টি করেন নি বাড়ীর আত্মীয়স্বজনে আদর দিয়ে দিয়ে ও রকম ক'রে তুলেছে। বিশেষ ক'রে মা-মাসীর দল। আমাদের দেশের মেয়েদের ধারণা যে, ছেলেদের দিয়ে কোনো রকম কাজ করান ভয়ানক অশোভন ব্যাপার। তারা শুধু স্কুলে গিয়ে পড়বে, এবং বাড়ী এসে আবদার করবে এবং সর্দ্দারি করবে। তাই সব এ রকম ছেলে তৈরী হয়।"

দেবকুমার বলিল, "শুধু এদেশের মা-মাসী নয়, জগৎসুদ্ধ মা-মাসীই তাহলে এই রকম বলতে হয়। আমাদের দেশের ছেলেদের সঙ্গে ইউরোপের ছেলেদের 'মেন্‌ট্যালিটি'র খুব যে তফাৎ আছে, তা ত মনে হয়নি!"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "তারাও ঠিক আপনার মত আগোছাল বুঝি?"

দেবকুমার বলিল, "আমি ত তাদের কাছে সোনার চাঁদ। বাঙালী ছেলে বড়জোর জিনিষপত্র কাপড়-চোপড়ই লণ্ডভণ্ড ক'রে রাখে, তারা নিজেদের এবং পরের জীবনসুদ্ধ লণ্ডভণ্ড ক'রে দেয়। গোছান সংসারের দোহাই একেবারেই মানে না।"

মায়া কি যেন বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। আধ মিনিট খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমার কাজটা সেরে নিই আগে।"

দেবকুমার বলিল, "সেই ভাল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করার চেয়ে ব'সে ব'সে গল্প করতে ভালও ঢের লাগে, এবং ডেকের উপর ব'সে গল্প করাটা

স্বাভাবিক ব'লেই সহযাত্রীরা বেশী হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে না। অবশ্য আমরা খুব বেশী 'কন্‌সিডারেশন্‌' তাদের কাছে পাব না।"

মায়া হঠাৎ লাল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

দেবকুমার বলিল, "আমরা, আমরা ব'লেই। দেখবার জিনিষ যদি লোকে আগ্রহ ক'রে দেখে, তাতে দোষ দিতে পারি না।"

মায়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "আপনার আর যে দোষই থাক, বিনয়ের আতিশয্য নেই, তা পরম শত্রুকেও স্বীকার করতে হবে।"

দেবকুমার বলিল, "কি আশ্চর্য্য! বিনয় মানুষ নিজের হয়েই ক'রে থাকে; আমি অন্যের জন্যে করতে যাব কেন? বিশেষ ক'রে যে-ক্ষেত্রে সেটা এমনই অনর্থক হবে, যে তাকে অভদ্রতাও বলা চলবে।"

মায়া বলিল, "বাপ্‌ রে বাপ, এতও বাজে বকতে পারেন আপনি! আপনার সঙ্গে কথায় কেউ কখনও পারবে না। আমি কাজগুলো সেরে নিই। আপনার কিছু করবার না থাকে, ততক্ষণ ম্যাগাজিন পড়ুন গিয়ে।"

দেবকুমার বলিল, "অগত্যা। কিন্তু খুব বেশী দেরী করবেন না।"

সে নিতান্ত-অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন চলিয়া গেল। উল্টো দিকের কেবিনের খোলা দরজার ফাঁকে একটি গুজরাটি মেয়ে অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে এই দুটি গল্প-নিরত মানুষকে দেখিতেছিল। দেবকুমার চ'লয়া যাইতেই সেও সরিয়া গেল। ব্যাপারটা মায়ার চোখ এড়ায় নাই। এতক্ষণ গল্প করিয়া তাহার মনের কালিমা কখন নিজের অজ্ঞাতসারে কাটিয়া গিয়াছিল, আবার সেটা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

এই তিন দিনের মধ্যে মায়া নিজের মনের একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিল। জীবনে এত আনন্দ ও এতখানি বেদনা একসঙ্গে সে কখনও অনুভব করে নাই। অথচ কিই বা ঘটিয়াছে? একটি মানুষের সহিত তাহার নূতন পরিচয় ঘটিয়াছে, এই ত ব্যাপার। সে মানুষটি দেখিতে সুন্দর, তাহার কথা কানে শুনিতে সুন্দর, তাহার চিন্তাও মনে আনন্দ আনিয়া দেয়। কিন্তু ইহাতেই কি শুধু মায়ার মনে এমন সুখের হিল্লোল জাগিয়া উঠিয়াছে? সুন্দর মানুষ কি আর জগতে নাই? সুন্দর করিয়া আর কেহ কি কথা বলিতে পারে না? দেবকুমারের বিশেষত্ব কোন্‌খানে?

মায়া বুঝিতে পারে না। ভাল করিয়া বোঝে না বলিয়াই তাহার চিন্তা বাড়িয়া ওঠে। কেন সে এমন করিয়া এই যুবকের ইন্দ্রজালে ধরা দিতেছে?

তিন-চার দিনের মাত্র পরিচয়। ইহারই মধ্যে তাহার পদধ্বনি মায়ার বুকে পুলকের শিহরণ আনয়ন করে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনায় দিনের আলো উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে, জগতের শোভা-সৌন্দর্য্য সহস্রগুণ বাড়িয়া যায়। সকাল হইবামাত্র সে কান পাতিয়া থাকে, কখন দ্বারের কাছে তাহার পদধ্বনি শোনা যাইবে। রাত্রি হইলে, ভাবে, সারাদিনের মধ্যে কতবার, দেবকুমারের সহিত দেখা হইয়াছে। কখন্ সে মায়াকে কি বলিয়াছে, তাহার কোন্ কথার লুকান কি অর্থ আছে, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে মায়া ঘুমাইয়া পড়ে।

প্রেমের সিংহদ্বারে এই তাহার প্রথম আগমন, ভয় এবং আনন্দ মিশিয়া এক আশ্চর্য্য অনুভূতিতে তাহার বুক দুরদুর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। এতদিন সে কেবল ইহার নামই শুনিয়াছে, উপন্যাসে, কাব্যে ; বন্ধুবান্ধবকে ইহা লইয়া ঠাট্টা করিয়াছে, চলচ্চিত্রে ইহার বিকাশ দেখিয়া হাসিয়াছে বা গোপনে চোখ মুছিয়াছে। কিন্তু নিজের জীবনে প্রেমের ছোঁয়াচ তাহার কখনও লাগে নাই। মাতা বাঁচিয়া থাকিতে এসব কথা চিন্তা করাই ত তাহার পাপ বলিয়া মনে হইত। যদিই বা কৈশোরের নিয়মে কখনও প্রভাস সম্বন্ধে তাহার কল্পলোকে কোনো রঙ্গিন চিত্র সে আঁকিতে বসিত, অল্পক্ষণের মধ্যে নিজের কাছেই নিজে অপরাধী হইয়া যাইত। ছি ছি, হিন্দুর মেয়ের এ সকল কথা ভাবতেও নাই।

রেঙ্গুনে আসার পর তাহার অবশ্য মতের পরিবর্ত্তন অনেক দিক্ দিয়াই ঘটিতেছিল। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে ভালবাসা উচিত, কি অনুচিত, সে বিষয়ে মায়া এতদিন কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারে নাই। রেঙ্গুন আসিবার সময় মনে মনে অনেক সঙ্কল্প লইয়া সে আসিয়াছিল। পিতা তাহাকে যতই পাশ্চাত্য শিক্ষা দিন, সে নিজে যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহা কখনও ভুলিবে না। সে নিরঞ্জনের মেয়ে যেমন, সাবিত্রীরও তেমনিই। একের খাতিরে অন্যজনের সকল শিক্ষাদীক্ষা কখনই বিসর্জ্জন দিবে না, বিশেষ করিয়া মাতার শিক্ষাকেই যখন সে সত্য বলিয়া মনে করে।

আহার সম্বন্ধে এতদিন পর্য্যন্ত সে খুব আচারবিচার রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। পূজাপার্ব্বণ প্রভৃতিতেও শ্রদ্ধাসহকারে যোগ দিয়াছে, যদিও অন্য সকল দিকে সাহেবীআনার অন্ত তাহার ছিল না। পূজা ইত্যাদিতে সে সত্যাই বিশ্বাস করে কিনা, তাহা কখনও ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখে নাই,

ভাবিতে গেলে বিপদ্ হইতে পারে জানিয়াই যেন জোর করিয়া ভাবে নাই। কিন্তু নিরঞ্জন তাহাকে বিলাত পাঠাইতে চান, তাহা সে জানিত। নিজেরও তাহার এখন কিছু অমত ইহাতে ছিল না। তাহার টাকার অভাব হইবে না, ইচ্ছামত বন্দোবস্ত করিয়াই সে বিলাতে থাকিতে পারিবে। আগে আগে অনেক ভারতীয় মেয়েই ত এইভাবে আচার বাঁচাইয়া বিদেশ বাস করিয়া আসিয়াছেন, সে কেন পারিবে না? মোটের উপর অন্যেরা তাহাকে যতই মেমসাহেব বলিয়া ঠাট্টা করুক, সে জানিত, সে হিন্দুর মেয়েই আছে। সাবিত্রী যদি আজ পরপার হইতে ফিরিয়াও আসেন, তবু কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইতে তাঁহার কোনখানে বাধিবে না।

কিন্তু সংগ্রাম সুরু হইল এইবার। বিবাহ-সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারিতাকে সাবিত্রী অত্যন্তই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, এবং এ-বিষয়ে তাঁহার মতামত এমনি স্পষ্ট ছিল, যে, ভুল করিবার সম্ভাবনামাত্রও সেখানে ছিল না। তাঁহার কন্যা হইয়া মায়া কি শেষে তাহাই করিবে? শুধু তাহাও ত নহে! দেবকুমার কায়স্থ, সে ব্রাহ্মণ-কন্যা। হিন্দুশাস্ত্রমতে তাহাদের বিবাহ হইতেই পারে না। দেবকুমারকে বিবাহ করিতে হইলে চিরদিনের মত তাহাকে সনাতন ধর্ম্মের গণ্ডী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। ইহা ত শুধু ধর্ম্মত্যাগ নহে, পরলোকবাসিনী জননীর সঙ্গে তাহার জন্ম-জন্মান্তরের বিচ্ছেদ।

সাধারণতঃ মাতা এবং কন্যার ভিতর যে সম্বন্ধটা থাকে, মায়া এবং তাহার জননীর সম্বন্ধটা তাহা হইতে কিছু অন্য ধরণের ছিল। সাবিত্রী সম্বন্ধে নিরঞ্জন ন্যায়বিচার করেন নাই, এ ধারণা এখনও মায়ার মন হইতে যায় নাই। সাবিত্রীর জীবন শেষ হইয়াছিল, অনাদর অবহেলার মধ্যে। নিজের জীবনে নিরঞ্জনের কৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিতে মায়া সঙ্কল্প করিয়াছিল। সত্য বটে, সাবিত্রী এখন পরলোকে, স্বামীর অবহেলা বা কন্যার প্রায়শ্চিত্ত কিছুতেই তাঁহার কিছু আসিয়া যায় না, তবু মায়ার একান্ত ইচ্ছা ছিল, এই ব্রত হইতে কখনও ভ্রষ্ট হইবে না। কিন্তু প্রলোভনের প্রথম সাক্ষাতেই কি তাহার পরাজয় ঘটিল?

যতক্ষণ দেবকুমারের সহিত কথা বলিত, ততক্ষণ এ সকল ভয়, ভাবনা, সংশয় তাহার মনের কোথাও ছায়াপাত করিত না কিন্তু তাহা ভিন্ন আর সমস্ত সময়ই তাহার দুশ্চিন্তার সীমা থাকিত না। কি করিবে সে, কোন্ পথে যাইবে? সম্মুখে কর্ত্তব্যের পথে দারুণ অন্ধকার, নিরাশা এবং বেদনা;

মায়ার প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত। অন্য পথে আশা ও আনন্দের রঙীন আলোতে উদ্ভাসিত কল্পলোক, ইহার দুর্দমনীয় আকর্ষণ হইতে কখনও কি সে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে? ক্রমেই নিজের সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ বাড়িয়া চলিয়াছিল। এই তিন দিনের ভিতরেই সে এক রকম স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছিল, ইহা ক্ষণিক মোহ মাত্র নয়, এই আশ্চর্য্য অনুভূতি তাহার জীবনকে একেবারে স্পর্শমণির ছোঁয়ার মত আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছে। সপ্তাহমাত্র আগে যে মায়া ছিল, তাহার সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘটিয়াছে, আর তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার কোনো উপায় নাই।

এ-সকল ভাবনা ত তাহাকে সারাক্ষণ পীড়িত করিত, কিন্তু ইহা ছাড়াও তাহার অন্য ভাবনা ছিল। সম্প্রতি সেইগুলিই তাহার যথেষ্ট বেশী বেদনার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের মন বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই, ভাল করিয়াই সে বুঝিয়াছিল। দেবকুমারের দিক্ হইতে মন ফিরাইবার আর তাহার উপায় নাই। নিজে সে নিঃশেষেই চিত্তসমর্পণ করিয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখদুঃখ আর তাহার নিজের নিয়ন্ত্রিত করিবার সাধ্য নাই, সে ক্ষমতা এখন অন্যের হাতে চলিয়া গিয়াছে। এত শীঘ্র এমন ঘটনা যে ঘটিতে পারে তাহা এতদিন সে, কবি ও ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিতে ভিন্ন, বাস্তব জগতে সম্ভব বলিয়াই মনে করিত না। কবির ভাষাতেই তাহার ক্রমাগত মনে হইতেছিল, "দৈবে যাহারে সহসা বুঝায় সে ছাড়া সে কেহ বোঝে না কভু।"

কিন্তু দেবকুমারের মনের কথা বুঝিবার তাহার কোন উপায় ছিল না। সেও কি মায়ার প্রতি কিছুমাত্র আকৃষ্ট হইয়াছে, না, ইহা ক্ষণিকের খেলা মাত্র? সে পুরুষ, সবেমাত্র বিদেশ হইতে ফিরিয়াছে; সেখানে এরকম অভিনয় সদাসর্ব্বদাই চলিতেছে। ইহা যে খেলা মাত্র, তাহা উভয় পক্ষেই মানিয়া লয়, এবং খেলা ভাঙিয়া গেলে কেহই কিছু মনে করে না। 'ফ্লার্টিং' ব্যাপারটাকে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ একটা ব্যাপার বলিয়াই সে-দেশে সকলে জানে। দেবকুমার যদি তাহাই মনে করিয়া থাকে? মায়া শিক্ষিতা, বিদেশের হালচাল সবই জানে। দেবকুমার যদি আশা করিয়া থাকে, মায়া জিনিষটাকে তাহারই মত হাল্‌কাভাবে গ্রহণ করিবে? জাহাজে সময় কাটে না। সেই সময়টুকুর জন্যই কি দেবকুমার মায়াকে এতটা বন্ধুত্ব দেখাইতেছে? ইহার ভিতর আর কিছুই কি নাই? যাতনায় যেন মায়ার কণ্ঠরোধ হইয়া

আসিল, সে প্রাণপণে এই অসহনীয় চিন্তাকে মন হইতে দূর করিয়া দিল। এই ভাবনাই এখন তাহার মনে সকলের চেয়ে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, অথচ কোনো সমাধান তাহার হাতে ছিল না। দেবকুমার নিজে ধরা না দিলে মায়ার কোনো কিছুই জানিবার উপায় নাই।

কিন্তু বর্ত্তমানের এই অমূল্য ক্ষণগুলিকে হেলায় বহিয়া যাইতে দিতে সে পারে না; মায়া কাজ সারিয়া উঠিয়া পড়িল, রঙীন সজ্জায় নিজের লাবণ্যকে উজ্জ্বলতর করিয়া ভাবনা-চিন্তাকে সবলেই যেন মন হইতে দূর করিয়া দিল। তাহার পর কেবিনের দরজায় তালা বন্ধ করিয়া ডেকের সিঁড়ির দিকে চলিল।

মাঝপথেই দেবকুমারের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। সে এরই মধ্যে পুরা সাহেব সাজিয়া ফিটফাট হইয়া আসিয়াছে। মায়ার মনে হইল, এত সুন্দর মানুষ ইতিপূর্ব্বে সে কখনও দেখে নাই। নিজের রূপের গর্ব্ব তাহার যথেষ্টই ছিল, কখনই সহজে সে কোনো মানুষকে সুন্দর বলিয়া স্বীকার করিত না। দেবকুমারই প্রথম তাহাকে হার মানাইল। মায়া ভাবিল, দেবকুমার তাহার চেয়ে আরও কত সুন্দর, ইহার কাছে তাহার নিজের রূপ-লাবণ্যের আকর্ষণ কতটুকুই বা হইবে? মনটা তাহার ভার হইয়া আসিল। নিজের অজ্ঞাতেই মুখের ভাবটাও একটু বিষণ্ণ হইয়া গেল।

দেবকুমারের চোখে সবটাই ধরা পড়িল, যদিও সে তাহার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমার সাহেবী পোষাক দে'খে বিরক্ত হলেন? এ বিষয়ে আপনার কোনো বিরুদ্ধতা আছে জানলে এগুলো পরতামই না। আচ্ছা, এরকম ভুল আর হবে না।"

মায়া চমকাইয়া গেল। তাহার মতামতের মূল্য কিছুও কি দেবকুমারের কাছে আছে? না, ইহাও খেলারই অংশমাত্র? কি করিয়া বুঝিবে সে? ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, তা কেন? ওসব বিষয়ে আমার কাটাছাটা কোন মতামত নেই। যার যাতে সুবিধে হয়।"

দুইজনে ডেকের উপর গিয়া বসিল। দেবকুমার চেয়ার-দুখানার উপর রাজ্যের মাসিক ও দৈনিক কাগজ বোঝাই করিয়া রাখিয়াছিল, যাহাতে তাহার অনুপস্থিতিতে আর কেহ আসিয়া সেগুলি দখল না করিয়া বসে। এখন ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া সেগুলা পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া সে বলিল, "এগুলো শুধু শুধু নিয়ে এসেছিলাম, একখানাও খুলে দেখিনি।"

মায়া ভালমানুষের মত বলিল, "কেন ?"

দেবকুমার বলিল, "চোখ ছিল সিঁড়ির দিকে এবং মন ছিল অন্য কোথাও। ও দুটোর একটাও 'স্পেয়ার' করতে না পারলে বই খুলে রেখে লাভ কি ?"

মায়া হাসিয়া বলিল, "ইংরাজীতে এ ধরণের কথাগুলো চ'লে যায়, বাংলায় কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি মনে হয়, না ?"

দেবকুমারও একটুখানি হাসিয়া বলিল, "তা কোনো মানুষের মনোভাবে যদি বাড়াবাড়ি থাকে, ভাষায় সেটা খানিকটা প্রকাশ পেতে বাধ্য।"

মায়া বলিল, "মনোভাবে যদি সেটা থাকে, তাহলে ত প্রকাশ পাবেই। তবে বিলাত থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কোন্‌টা মুখের কথা, আর কোন্‌টা মনের কথা, তা বুঝবার কোনো উপায় থাকে না।" কথাটা বলিয়াই সে লজ্জিত হইয়া পড়িল ; মনে হইল, এত খোলাখুলি ভাবে না বলিলেও চলিত।

দেবকুমার একটু গম্ভীর হইয়া গেল। মিনিট-খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি যে কেবল মুখের কথাই বলি না, সেগুলো 'মীন্'ও করি, তা আশা করি একদিন আপনাকে বিশ্বাস করাতে পারব।"

মায়ার বুক কাঁপিয়া উঠিল। এও কি মুখের কথা ? তাহাই যদি হয়, জীবনে আর কোন মানুষের কথাকে, মুখের ভাবকে, ব্যবহারকে সে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু এ ভাবে কথা চালাইতে তাহার আর সাহস হইল না। অন্তত আরও কয়েকটা দিন কাটিয়া যাক। তিন-চারটা দিনের মধ্যে চিরজীবনের ব্যবস্থা না-হয় না-ই হইল ?

যাত্রীদের ব্যস্ততা ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছিল। মায়া সেইদিকে চাহিয়া বলিল, "আমরা ত এসে পড়লাম বলে। বাবা, মানুষের যে কেন 'সি ভয়েজ' পছন্দ হয় জানি না, আমি ত কেবল দিন গুনি, কখন ডাঙায় নামতে পারব।"

দেবকুমার বলিল, "আমি কিন্তু এই 'সি ভয়েজ'টা শেষ হওয়ায় একটুও খুসী হইনি।"

মায়া ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া লইবার জন্য হাসিয়া বলিল, "বি-আই-এস্-এন্ কোম্পানীকে এতবড় কম্‌প্লিমেন্ট্ কেউ কখনো দেয়নি।"

দেবকুমার বলিল, "কম্‌প্লিমেন্ট্ও নয়, এবং 'বি-আই-এস-এন্'কেও নয়। কিন্তু আপনি আবার ভাববেন, আমি বাজে কথা বকছি, কাজেই আর কিছু ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করব না।"

কথাটা অন্যদিকে চলিয়া গেল। দেবকুমারের বাবা আসিয়া পড়িয়া পুত্রকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন, যে, তাঁহাদের জিনিষপত্র ঠিকভাবে একটাও বাঁধাছাঁদা হয় নাই। দেবকুমারকে অগত্যা উঠিয়া যাইতে হইল। মায়া ভদ্রতার খাতিরে উঠিতে পারিল না। বসিয়া শিবচরণবাবুর সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল।

৩২

শনিবারের বিকালবেলা। মায়ার কলেজ সকাল সকাল ছুটি হওয়ায় সে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। নিরঞ্জন এখনও ফিরেন নাই, তবে শনিবারে মাঝে মাঝে তিনিও বেলা থাকিতে থাকিতে বাড়ী চলিয়া আসেন।

প্রায় এক সপ্তাহ হইল মায়া রেঙ্গুন ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার অনুপস্থিতিতে সংসারে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, তাহা গুছাইয়া লইতে তাহার অনেক সময় গিয়াছে, তাহার উপর কলেজও খোলা। দেবকুমারের সহিত তাহার একদিনের বেশী দেখা হয় নাই, তবে চিঠি ইহারই মধ্যে দুই-তিনখানা আসিয়া পৌছিয়াছে। বাড়ী খুঁজিতে, জিনিষপত্র কিনিতে, 'বার'-এ ভর্ত্তি হইতে সে এখন মহাব্যস্ত। আসিয়া রোজ দেখা করিতে পারে না বলিয়া অনেক করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছে, এবং শনিবারে নিজেই যাচিয়া চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছে।

এই দিনগুলি মায়ার মোটেই ভাল কাটে নাই। জাহাজে দেবকুমারের নিকট যখন ছিল, তাহার চেয়ে এখন তার মন আরও অধীর, আরও উতলা হইয়া উঠিয়াছে। কি যেন এক অদৃশ্য ডোরে তাহার জীবন ঐ মানুষটির সহিত গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। মায়া যত দূরে যাইতেছে, ততই উহাতে টান পড়িতেছে এবং বেদনায় হৃদয় হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছে। নিজের অবস্থায় এক-একবার তাহার হাসি পাইত। এ কি হইল? প্রেমকে উপহাস করা তাহার স্বভাব ছিল, ইহা কি প্রেমের দেবতার প্রতিশোধ? ভালবাসায় পড়িতে সে অনেক মানুষকেই দেখিয়াছে, কিন্তু এতখানি কষ্ট পাইতে কাহাকেও দেখে নাই। অন্যেরা ত দিব্যি খায় দায়, ঘুমায়, নানা রকম প্ল্যান্ করে, সেইমত কাজও করে। দেখিয়া মনে হয় না, ভালবাসাটা তাহাদের জীবনে বিশেষ কোনো বিশৃঙ্খলা আনিয়াছে। যেমন দিন চলিতেছে, তেমনি

চলে, উপরন্তু স্ফূর্ত্তি করিবার, আমোদ করিবার নূতন কতকগুলি সুযোগ, সুবিধা ঘটিয়া যায়।

কিন্তু তাহার বেলা কি ঘটিল সকলই অন্য রকম? আমোদ স্ফূর্ত্তি ত দূরে থাক, তাহার বাঁচিয়া থাকাই যেন দায় হইয়া উঠিয়াছে। জীবনটা এমনি উলটপালট হইয়া গিয়াছে যে, সে যে ইহার পর কেমন ভাবে, কি করিয়া এটাকে কাটাইবে তাহা ভাবিয়াই স্থির করিতে পরে না। চিরদিনের অভ্যস্ত পথে আর সে চলিতে পারিবে না, ইহা ধ্রুব সত্য। তাহার জীবনে দারুণ একটা সন্ধিক্ষণ যে দ্রুতবেগে ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

জাহাজে থাকিতে এক-একবার তাহার মনে হইত, নিজের অভ্যস্ত জীবন-ধারার মধ্যে আবার গিয়া পড়িতে পারিলে হয়ত এই নূতন মোহের ঘোর তাহার কাটিয়া যাইবে। কিন্তু এখন দেখে, বৃথা সে আশা। কর্ত্তব্য বলিয়া এতকাল যাহা সে বুঝিত, তাহা হইতে যদি ভ্রষ্ট হইতে না হয়, তাহা হইলে দেবকুমারের চিন্তাও মন হইতে তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কিন্তু তখন জীবনে আর তাহার থাকিবে কি? সে কি আর মাথা সোজা করিয়া চলিতে পারিবে? দুর্ব্বিষহ বেদনার ভারে একেবারে ভাঙিয়া পড়িবে না? ক্রমাগত নিজের মনের সহিত সংগ্রাম করিয়া মায়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর সে পারে না, ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে যাহা ঘটিবার ঘটুক মনে করিয়া সে যেন হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল।

রোদ পড়িয়া আসিতেছিল। নিরঞ্জন চায়ের সময় আসিয়া জুটিতে পারিবেন কি না স্থিরতা নাই। অজয় আসিবে বলিয়া গিয়াছে, তবে সেটা তাহার দুষ্টামি, না, সত্য কথা, মায়া তাহা ঠিক জানে না। মনে মনে সে স্বীকার না করিয়া পারিতেছিল না যে, একজন আসিলেই তাহার আনন্দ পরিপূর্ণ হইবে, বাড়ীর লোকগুলি আসুক বা না-ই আসুক, তাহাতে বিশেষ আসিয়া যায় না।

সম্প্রতি সে চায়ের জোগাড় করিতেই ব্যস্ত ছিল। দেবকুমার যেন মনে না করে যে, এ গৃহের গৃহিণী নাই বলিয়া অতিথির কোনো আদরযত্নই হয় না। চা-টা কোথায় দেওয়া হইবে, তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। তাহাদের বাগানটায় চারটা সাড়েচারটা পর্য্যন্ত অত্যন্তই রোদ থাকে, কিন্তু ঐ জায়গাটার সম্বন্ধে মায়ার মনে খুব একটা পক্ষপাত আছে। বাড়ীতে অবশ্য

বহুমূল্য আসবাবে সাজানো ড্রয়িং রুম বা ডাইনিং রুমের অভাব নাই, কিন্তু বিকাল বেলাটা ঘরের কোণে বসিতে মায়ার ইচ্ছা ছিল না। তাহা ছাড়া চারিদিকে চাকর-বাকরের ভিড়। ভারতীয় চাকর-বাকরের চোখে ধূলা দেওয়া বড়ই শক্ত ব্যাপার। দেবকুমার এবং মায়ার মনের সম্বন্ধটা তাহাদের বুঝিতে বিশেষ দেরি হইবে না, এবং তাহা লইয়া ঝি-চাকর-মহলে যে রসাল আলোচনার সূত্রপাত হইবে, তাহা ভাবিয়াই মায়া শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু দেবকুমার সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত, চা খাইতে সে চারটার মধ্যেই আসিবে, সন্ধ্যার পর আসিবে না, কাজেই ঘরে চা দেওয়ারই বোধ হয় ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশী, বিলাতী, সকল রকম খাদ্যই প্রচুর পরিমাণে ফরমাস দিয়া, এবং একটি দামী চায়ের সেট্ বাহির করিয়া দিয়া মায়া উপরে চুল বাঁধিতে এবং কাপড় বদলাইতে চলিয়া গেল। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজের মুখের বিবর্ণ প্রতিকৃতি দেখিয়া সে যেন চমকিত হইয়া উঠিল। যে মানুষ নিজে সুন্দর, সে সৌন্দর্য্যকে সমাদর করে, এবং সৌন্দর্য্যের অভাবের প্রতি অবজ্ঞা থাকাও তাহার মনে খানিকটা স্বাভাবিক। মায়ার এমন বিবর্ণ শ্রীহীন মুখ দেখিলে দেবকুমার মনে করিবে কি? সে যথাসাধ্য যত্নে প্রসাধন করিয়া, নিজের রূপকে দীপ্ত উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। নিজের বাড়ীতে এত সাজসজ্জা কখনও সে করে না, অজয় যদি হঠাৎ আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে মায়াকে সে যে ঠাট্টা করিয়া অস্থির করিয়া তুলিবে, তাহাও মায়া জানিত, তবুও লোভ সম্বলাইতে পারিল না। দেবকুমার যদি তাহাকে দেখিয়া একটু মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, তাহা হইলে আর সে কিছুতে ভয় করে না।

মাঝ পথে তাহার বুড়ী আয়া আসিয়া চেঁচামেচি জুড়িয়া দিল, "থোড়া সুন্নাউন্না নিকালকে ডালো না, ওসব ক্যা খালি পেটিমে রখ্‌নেকো ওয়াস্তে বনায়া?" মায়ার শরীরে অলঙ্কারের অপ্রাচুর্য্যটা তাহার ভাল লাগিল না।

মায়া বলিল, "ঘরে ব'সে আবার ক'ঝুড়ি গয়না পরতে হবে? যা, পালা এখান থেকে। দেখ্‌গে যা, আমার ব্লু চায়ের সেট্‌টা ছোকরা এখনি ভেঙে রাখবে।" অন্য চাকর-বাকরকে গাল দিবার সুযোগ বুড়ী কখনও উপেক্ষা করিত না, সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

মায়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, চারটা বাজিতে আর কয়েক মিনিট মাত্র দেরি আছে। নীচে আগেই নামিবে, না, দেবকুমার আসার খবর

পাইলে পর যাইবে, তাহাই ভাবিতেছে, এমন সময় বেয়ারা আসিয়া খবর দিল, "সাহেবের গাড়ী এসেছে।"

মায়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। কিন্তু গিয়া দেখিল, নিরঞ্জন আসেন নাই, শুধু গাড়ীই আসিয়াছে। ড্রাইভারের হাতে নিরঞ্জন চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "আজ এত কাজের চাপ পড়েছে যে, কিছুতেই যেতে পারলাম না। দেবকুমারকে ব'লো, সে যেন কিছু মনে না করে।"

চিঠি পড়িয়া মায়া ড্রাইভারকে বিদায় করিয়া দিল। তারপর আবার উপরে উঠিবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় ট্যাক্সি হাঁকাইয়া দেবকুমার স্বয়ং আসিয়া পড়িয়া সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিল।

দেবকুমার আজ ফিটবাবু সাজিয়া আসিয়াছে। শান্তিপুরে ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী, এবং পায়ে কালো মখমলের নাগরা জুতা। বিলাতী সাজের মধ্যে হাতের মণিবন্ধে একটা 'রিষ্ট ওয়াচ', আর বিদেশী-আনার কোন চিহ্ন নাই।

মায়া অগ্রসর হইয়া আসিতেই দেবকুমার হাস্যমুখে তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "দেখুন, আজ আপনার 'অনারে' পূরো বাঙ্গালী বাবু সেজে এসেছি।"

মায়াও হাসিয়া বলিল, "যা নিজের থেকেই করা উচিত, তা অন্যের খাতিরে করলে তার কি খুব বেশী মান বাড়ে?"

দেবকুমার বলিল, "নিশ্চয়ই। একজন পথভ্রষ্টকে 'রিক্লেম' করার মাহাত্ম্য কি কম?"

মায়া বলিল, "আচ্ছা, এখন বসবেন চলুন, তারপর বক্তৃতা করবেন।"

দুজনে বসিবার ঘরে আসিয়া বসিল। দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাবা বুঝি এখনও এসে পৌঁছন নি?"

মায়া বলিল, "তাঁর আজ আসতে দেরিই হবে, ব'লে পাঠিয়েছেন।"

দেবকুমার আর সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করিয়া বলিল, "এ ক'দিন এমন ভয়ানক ব্যস্ত ছিলাম, যে কিছুতেই আসতে পারিনি। আপনি আমাকে নিশ্চয়ই ভয়ানক রকম অসভ্য ভেবেছেন।"

মায়া বলিল, "ওমা, তা মনে করতে যাব কেন? মানুষের কাজ আগে, না বেড়ানো আগে?"

দেবকুমার বলিল, "ও ত নিতান্ত নীতিশাস্ত্রের কথা হ'ল। মানব শাস্ত্রে একটা বিশেষ কালে, অন্ততঃ স্থান-বিশেষে, বেড়ানোটাই ঢের আগে। যখন নেহাৎ আর কিছু করবার থাকে না, তখনই মানুষ কাজ করে।"

মায়া বলিল, "আপনার মতানুসারে চললে পৃথিবী এতদিনে থেমে দাঁড়িয়ে যেত।"

দেবকুমার বলিল, "মোটেই না। বরং আপনি যা বলছেন সেইভাবে চললেই বিপদ্ হত বেশী। জগতের অধিকাংশ মানুষই কর্ত্তব্য ব'লে কাজ করে না, হয় করে দায়ে প'ড়ে, নয় কাজের মধ্যে 'প্লেজার' পায় ব'লে।"

মায়া বলিল, "থাক, আপনার সঙ্গে তর্কে পারবার কোনোই সম্ভাবনা যখন আমার নেই, তখন তর্ক নাই করলাম। বাড়ীটাড়ি পছন্দমত পেলেন কিছু?"

দেবকুমার বলিল, "এখানে বাড়ী থাকলে ত বাড়ী পাব? বাড়ী মানে ত খাঁচার মত কতগুলি 'ফ্ল্যাট'? দেখলেই আমার হাড় জ্ব'লে যায়। যা-ও বা দু-একটা ভাল আছে একটু, সেগুলোর ভাড়া এত বেশী যে বাবা শুনলেই লাফিয়ে ওঠেন। কি যে করি, ভেবেই পাচ্ছি না। বেশীদিন এভাবে ভেসে বেড়ালে আমার মোটেই চলবে না। আমি শীগগির ক'রে গুছিয়ে বসতে চাই।"

মায়া বলিল, "সত্যি, এখানে বাড়ীর ভয়ানক অসুবিধা। ভাগ্যে বাবা এই বাড়ীটা করেছিলেন, নইলে আমাকেও কোন্ এক খাঁচায় গিয়ে উঠতে হ'ত তার ঠিকানা নেই। আমার আর সব দিকের অভাব সহ্য হয়, কিন্তু থাকবার জাগগাটা বেশ বড় না হ'লে ভারি কষ্ট হয়।"

দেবকুমার হাসিয়া উঠিল, বলিল, "খাবার পরবার অভাব যে কি জিনিষ, তা যদি সত্যি জানতেন, তাহলে আর একথা বলতেন না।"

মায়াও হাসিল, বলিল, "তা একেবারে একটুও যে জানি না তা নয়। চিরদিন ত আমার এ রকম ক'রে কাটে নি? গ্রামে যখন থাকতাম তখন কিছু কিছু 'প্রাইভেশন' সয়েছি বই কি?"

দেবকুমার বলিল, "সত্যি, আপনার জীবনের এই অংশটার 'হিষ্ট্রি' আমার ভারি অদ্ভুত লাগে। বাঙালীর মেয়ে 'রিলিজিয়াস্ কন্‌ভিক্‌শন্'-এর খাতিরে স্বামীও ছেড়ে দেয়, এ আর আগে কখনও শুনিনি।"

মায়া একটু গর্ব্বের সহিতই বলিল, 'তাঁর ভিতর যে জিনিষ ছিল, সব বাঙালীর মেয়ের মধ্যে তা কোথায় পাবেন?"

দেবকুমার একটু দীর্ঘক্ষণ মায়ার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "তিনি যা করেছিলেন, তাই কি আপনার ঠিক মনে হয়? ধর্ম্মমত কি মেয়েদের কাছে স্নেহ, প্রেম, সব-কিছুর চেয়ে বড় হওয়া উচিত?"

মায়া কিছু না ভাবিয়াই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই। মতের জন্যে যে ত্যাগস্বীকার করতে না পারে, তার মত থাকা-না-থাকা সমান।"

দেবকুমার গম্ভীর হইয়া গেল। খানিকক্ষণ পরে বলিল, "আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ভালবাসার চেয়ে মতের দাম স্ত্রীলোকের কাছে বেশী হওয়া উচিত নয়। তাহলে সংসার টিঁকতে পারে না।"

মায়া যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার অন্তরও এই কথাই বলে, কিন্তু তাহার বুদ্ধি এখনও ইহা স্বীকার করিতে চায় না। দেবকুমার একথা পাড়িতেই বা গেল কেন? সেও কি এই ভাবনায় পড়িয়াছে? কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই কি সে আজ এই আলোচনা উত্থাপন করিয়াছে? মায়ার মন সভয়ে পিছাইয়া গেল। না, না, এখনই এ মীমাংসার প্রয়োজন নাই। আরও কয়েকটা দিন অন্ততঃ অনিশ্চিতের আশ্রয়েই থাকিয়া দেখা যাক। সে কথা ঘুরাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল, "তর্ক ক'রে ত গলা শুকিয়ে ফেললেন, এইবার চা আনতে বলি?"

দেবকুমার হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু গলাটা একবার ভিজিয়ে নিয়ে আবার যদি দ্বিগুণ উৎসাহে তর্ক করি, তখন আমায় দোষ দেবেন না।"

মায়া ইলেকট্রিক বেল বাজাইয়া চাকরকে ডাকিয়া চা আনিতে বলিয়া দিল। দেবকুমার ঘরের চারিদিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া লইয়া বলিল, "আপনি সব জিনিষেই দেশী ভাব বজায় রাখবার খুব পক্ষপাতী, না?"

মায়া বলিল, "ছবি আর ফার্নিচার দে'খে বলছেন? এগুলো আমারই আমদানী বটে। বাবা আগে সব কিছু পুরো বিলাতি স্টাইলেই সাজিয়েছিলেন। আমি এখন অল্পে অল্পে বদল করছি।"

দেবকুমার বলিল, "আপনি দেখছি 'রিফর্মার' হয়েই জন্মেছেন।"

মায়া বলিল, "আমি ঠিক তার উল্টো। আমাকে এখানের সকলে ভয়ানক গোঁড়া ব'লেই গাল দেয়। বাবাকে বিরক্ত করতে চাই না ব'লে বেশী বাড়াবাড়িগুলো করি না, কিন্তু আসলে আমার মন আগের মতই 'অর্থোডক্স্' আছে।"

দেবকুমার বলিল, "আমার কিন্তু তা মোটেই মনে হয়নি।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "আপনি আমাকে কতটুকুই বা জানেন? দুদিন জাহাজে দেখেছেন বই ত নয়?"

দেবকুমার বলিল, "মানুষকে বুঝবার জন্যে কি আর একজন্ম ব'সে দেখতে হয়? তার সত্যিকার পরিচয় অল্পক্ষণের দেখাতেই পাওয়া যায়।"

এই সময় চা-টা আসিয়া পড়িল। দেবকুমার বলিল, "আপনি করেছেন কি? একটা মানুষ কি এত খায়?"

মায়া বলিল, "একটা কেন? আমিও রয়েছি।"

দেবকুমার বলিল, "যা দেখছি, এর ভিতর বেশী জিনিষই আপনি খাবেন না। আমার জন্যে কেন আনালেন?"

মায়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "ওমা, আমি খাব না ত কি হবে? যে বাড়ীর কর্ত্তা নিরামিষ খায়, সে কি মাছ খেতে কাউকে ডাকেও না?"

দেবকুমার বলিল, "আমি বুঝি শুধু খেতেই এসেছি? না, এগুলো নিয়ে যেতে বলুন। আপনি নিজে যা খেতে পারেন, সেইগুলোই শুধু থাক।"

মায়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, অততে দরকার নেই। আপনি খান ত, এখনি অজয় আসবে, বাবাও আসতে পারেন, আপনাকে সঙ্গ দেবার লোকের অভাব হবে না।"

দেবকুমার একটা সন্দেশ তুলিয়া লইয়া বলিল, "এই হ'লেই আমার হবে, চা-টা অবশ্য খাব।"

মায়া বলিল, "আপনি ছোট জিনিষকে বড় বেশী বাড়ান। আচ্ছা, আচ্ছা, আমিও না হয় খাচ্ছি, আপনার অত রাগ করবার দরকার নেই।"

কথাটা বলিয়াই কিন্তু তাহার মন দমিয়া গেল। দেবকুমারের কথাই ত তাহা হইলে ঠিক বলিয়া প্রমাণ হইল। মেয়েদের মতের কোনোই মূল্য সত্যই কি নাই?

দেবকুমার কিন্তু সে কথা আর তুলিল না। এমন ঘটা করিয়া খাইতে লাগিল, যেন মায়া তাহাকে খাইতে সুযোগ দিয়া একেবারে বাঁচাইয়া দিয়াছে।

খানিক পরে অজয় আসিয়া জুটিল। চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি, কিছু বাকি আছে?"

দেবকুমার হাসিয়া বলিল, "বিশেষ কিছু নয়।"

এই পার্টির কথা মায়া জীবনে কোনোদিন ভুলিতে পারে নাই। ঘণ্টা দুই-তিনের ভিতর তাহার সারা জীবনের ধারা যেন এইখানেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া গেল। কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধানই হইল না। মায়া বুঝিল যে এতদিন সে যাহা ধ্রুবসত্য বলিয়া জানিয়াছে, চিরদিন যাহা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া

রাখিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহার কিছুই আজ আর পূর্ব্বের মূর্ত্তিতে তাহার চোখে পড়িতেছে না। দেবকুমারের দৃষ্টি এখনই যেন তাহার দৃষ্টিকে অনুরঞ্জিত করিতেছে। তাহার স্বাধীন সত্তা এখনই যেন অবলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। বুদ্ধির দিক্ হইতে সে বুঝিতেছিল, সে নিজের অপমান করিতেছে; কিন্তু হৃদয়ের দিক্ হইতে এই পরাজয় স্বীকারেই তাহার এক আশ্চর্য্য আনন্দ হইতেছিল। মানুষের প্রিয় যাহা কিছু, সকলের জন্যই তাহাকে মূল্য দিতে হয়। মায়ার কাছে নিজের স্বাধীনতার মূল্য অনেকখানিই ছিল, তাহা বিসর্জ্জন দিয়া সে যেন দেবকুমারের ভালবাসা পাইবার অধিকার অর্জন করিল।

অজয় ভদ্রতার খাতিরে চা খাইতে আসিয়াছিল বটে, এবং খানিকটা মজা দেখিতে পাইবার আশায়ই যেন খানিকক্ষণ বসিয়াও ছিল, কিন্তু তাহাকে নিরাশই হইতে হইল। দেবকুমার নিতান্ত সাধারণভাবে গল্প করিতে লাগিল। প্রেমিক-প্রেমিকার আলাপের যে রকম ধারণা অজয়ের মনে ছিল, তাহার সঙ্গে কিছুই মিলিল না। চাক্ষুষ এ সব সে কোনোদিনও দেখে নাই। হিন্দু ব্রাহ্মণঘরে তাহার জন্ম, কলিকাতায় বাস করিলেও তাহাদের পরিবারে কোনোরকম আধুনিকতা প্রবেশ করে নাই। কাজেই এ বিষয়ে তাহার সমস্ত ধারণাটাই নভেল, নাটক ও বায়োস্কোপ হইতে সংগৃহীত ছিল। মায়া এবং দেবকুমার তাহার কৌতূহলের কোনো খোরাকই জোগাইবার লক্ষণ দেখাইতেছে না দেখিয়া সে খানিক পরে কাজের ছুতা করিয়া উঠিয়া গেল।

সে যাইতেই দেবকুমার বলিল, "আমি কিন্তু অভদ্রের মতই ব'সে আছি, নড়বার নাম নেই। হয়ত আপনার কাজের অসুবিধা হচ্ছে এবং বিরক্তও হচ্ছেন। তা যদি হয় ত বলুন, কিছু সঙ্কোচ করবেন না।"

মায়া বলিল, "আমার কাজের ত সীমা নেই। সন্ধ্যার সময় আবার কি কাজ থাকবে? অন্তদিন ত সময়ই কাটে না। একটা যে কেউ এলেই বর্তে যাই।"

দেবকুমার বলিল "আপনার কথার গোড়াটা শুনে সবে একটু খুশী হতে আরম্ভ করেছিলাম, এমন সময় আপনি সব মাটি ক'রে দিলেন।"

মায়া হাসিয়া বলিল "মেয়েদের নামেই অপবাদ যে তাঁরা compliment পাবার জন্যে জাল ফেলেন, তা আপনারাও কম যান না। যা নিজে জানেনই, তা আর একবার আমার মুখ থেকে শুনে কি হবে?"

দেবকুমার বলিল, "পৃথিবীতে কতকগুলো কথা আছে যা হয়ত খুবই জানা, তবু বার বার লোকের মুখে শুনতে ইচ্ছা করে। অবশ্য সব লোকের মুখে নয়।"

মায়া উত্তরে কিছু না বলিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর কথা বদ্‌লাইয়া বলিল, "আপনার কাজ আরম্ভ করছেন কবে?"

দেবকুমার বলিল "এখন করলেই হয়। বাপের টাকা ত অনেক খরচ করা গেল, অতঃপর উপার্জনটা নিতান্তই সুরু করতে হয়। কতদূর পেরে উঠব তা জানি না, তবে সবাই বলে রেঙ্গুনে উকীল-ব্যারিষ্টারদের কপাল খুব দরাজ, এই যা ভরসা।"

মায়া বলিল "তা সত্যি, এখানে নিতান্ত হাবা বোকা মানুষেও যে পরিমাণে টাকা রোজগার করে, তা দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। তখন আর মনে হয় না যে মানুষের বুদ্ধি বা cultureএর কোনো দাম আছে।"

দেবকুমার বলিল "আচ্ছা, খুব গাদা-খানেক টাকা পেতে আপনার কি ইচ্ছে করে? আপনার অবশ্য তা আছেই, তবু এর চেয়েও বেশী হলে ছিল ভাল, এ কথা কখনও মনে হয়?"

মায়া সংক্ষেপে বলিল, "না, যখন গরীব ছিলাম, তখনও টাকার অভাব কিছু অনুভব করিনি। এখন হয়ত নানাদিকে আমি তখনকার চেয়ে সুখী, কিন্তু তার অন্য কারণ রয়েছে।"

দেবকুমার বলিল, "তবু টাকা জিনিষটা খুবই যে দরকারী, তা ত আপনি অস্বীকার করেন না?"

মায়া বলিল, "না, তা মোটেই করি না। লেখাপড়া শেখা, ইচ্ছা মত কাজ বেছে নেওয়া, দেশের বা দশের উপকার করা, এ সবের কোনোটাই ত টাকা না হলে করা যায় না? মনটা সুদ্ধ অভাবে শুকিয়ে আসে, নিজের খাওয়া পরা আর থাকার ভাবনা ছাড়া আর কিছু মানুষ তখন ভাবতেই পারে না।"

দেবকুমার বলিল, "আপনার মুখে এ কথাটা শুনে খুব ভাল লাগল। আপনি নিজে ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও তার যথার্থ দামটা যে ভোলেননি এইটাই আশ্চর্য। ও দেশে পথে ঘাটে, ঘরে বাইরে খালি টাকার জন্যে লোলুপতা দেখে দেখে ঘেন্না ধ'রে গেছে। বিশেষতঃ অল্পবয়সী মেয়েদের সুদ্ধ টাকার পিছনে পাগল হয়ে ছুটতে দেখলে বড় খারাপ লাগে।"

মায়া বলিল, "চলুন, এবার আমার বাগানটা আপনাকে দেখিয়ে আনি। রোদটা বেশ প'ড়ে গিয়েছে। সমাজতত্ত্ব আলোচনা ক'রে ক'রে আপনিও হাঁপিয়ে গিয়েছেন।"

দেবকুমার হাসিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, "আপনার বয়সের পক্ষে আপনি

মানুষ চেনেন বড় বেশী দেখছি। সমাজতত্ত্বের আলোচনাটা যে আমার খুব মুখরোচক নয় তা এরই মধ্যে ধ'রে ফেলেছেন? কিন্তু কি করা যায় বলুন? যাবার মতলব মোটেই নেই, তাই আজেবাজে ব'কে আপনাকে entertain করার চেষ্টায় আছি। আপনার gardening খুব ভাল লাগে নাকি?"

. মায়া বলিল, "খুব। দেশে থাকতে কত গাছ যে লাগিয়েছিলাম তার ঠিক নেই, ফলের গাছ, ফুলের। এবারে গিয়ে দেখলাম, ফুলের গাছগুলো একটাও নেই, ফল এবং তরকারির গাছগুলো তবু আছে। এখানে বাগান একটা আগেই ছিল, আমি সেটা বদ্‌লে নিজের পছন্দমত করেছি। তবে মালীটা মাঝে মাঝে সর্দারি ক'রে আমাকে খুব জ্বালিয়ে তোলে।"

কথা বলিতে বলিতে দুইজনে বাগানের মধ্যে আসিয়া পড়িল। দেবকুমার বলিল, "ফুলের বাগান তদারক যারা করবে তারা আকৃতি-প্রকৃতিতে খানিক ফুলের মত হলেই ঠিক হয়। আমাদের দেশে কেন যে এটা কেউ মনে রাখে না।"

মায়া বলিল, "তা হলে বাগান করাটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আর হয়েই ওঠে না ব'লেই বোধহয় মনে রাখে না। তা আমার বাগানটা লাগল কি রকম আপনার?"

দেবকুমার বলিল, "দেখতে ত বেশ, তবে styleএ খানিকটা Eurasian."

মায়া বলিল, "style এর শুদ্ধতা রক্ষা করার মত জ্ঞান ত আমার নেই, কাজেই এরকম ভুল হওয়া অনিবার্য। যেখানে যা ভাল লাগে, তাই করি, চোখে কেমন দেখায় সেইটাই মাত্র বিচার করি।"

দেবকুমার বলিল, "সেইটাই আসল প্রয়োজন যদিও। আমার কাছে gardeningএর বিষয়ে কতগুলো বই আছে ছবি সমেত, সেগুলো আপনাকে এনে দেব। ছবিগুলো দেখতে মন্দ নয়। আমাদের দেশেও এক সময় বাগান করার খুব চলন ছিল, মুসলমানদের আমলে। আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, কাশ্মীর, প্রভৃতি বেড়ালে, দেশী gardeningএর আন্দাজ পাওয়া যায়। ও দিকে কখনও যাননি বুঝি?"

মায়া বলিল. "কখন আর গেলাম? ছিলাম পাড়াগাঁয়ে. সেখান থেকে সোজা বর্মায়। ওসব বুড়ো বয়সের জন্যে তোলা রইল।"

দেবকুমার বলিল, "বুড়ো বয়সে কেন, অল্প বয়সেই যাবেন। এখনই ত সময়, বেশী বয়সে কি আর ওসব দিকে ঝোঁক থাকে?"

মায়া বলিল, "এখন যেতে চাইলেই বা নিয়ে যাবে কে? বাবা ত তাঁর ব্যবসা ছেড়ে এক দিনের জন্তেও নড়তে চান না। তিনি আবার যাবেন বেড়াতে!"

দেবকুমার বলিল, "না হয় একলাই যাবেন। আর আপনার বাবা ছাড়া নিয়ে যাবার অন্য লোকও কেউ জুটে যেতে পারে।"

মায়ার গালের কাছটা একটু লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "অনেক ত ঘোরা হল, এখন একটু বসা যাক, চেয়ার দিয়ে গিয়েছে।"

দেবকুমার বলিল, "আমি যাচ্ছি না একেই, তার উপর আপনি আমায় আরো প্রশ্রয় দিচ্ছেন। এরকম করলে আমি রোজ এসে উৎপাত করব।"

মায়া বলিল, "ভালই ত, আমি তাতে একটুও দুঃখিত হব না।"

দেবকুমার বলিল, "দেখুন, এ কথাটা আমি কিন্তু seriouslyই নিলাম, আপনি যদিও খুব সম্ভব ভদ্রতা ক'রে বলেছেন।"

মায়া লজ্জিত হইয়া ভাবিল, ঠিক এমন ভাবে কথাটা না বলিলেই হইত। কিন্তু বলিয়াছে যখন তখন ফিরানো আর যায় না। মনের ভিতর কে যেন তাহাকে এই কথাটা বলাইতেই চাহিতেছিল। দেবকুমার আসিলে সে যে খুশী হয়, তাহা দেবকুমার জানিলে দুঃখটা কি?

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, অন্ধকার হইয়া আসিল। এদিকটা সব সময়ই নীরব, এখন যেন নীরবতাটা আরো গভীর হইয়া আসিল। মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দও যেন স্পষ্ট হইয়া কানে বাজিতে লাগিল।

দেবকুমার বলিল, "চা খেতে এসে ত রাত হয়ে গেল। অন্য মানুষ হলে মনে করত যে রাত্রের খাওয়াটাও খেয়ে যাওয়ার মতলব। আপনি অবশ্য তা মনে করছেন না?"

মায়া বলিল, "না। জাহাজে আপনার খাওয়ার নমুনা ত দেখেছি, কাজেই আপনাকে বেশী পেটুক আর কি ক'রে মনে করি?"

দেবকুমার নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেই উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আপনার বাবা বাড়ী এসে আমাকে ব'সে থাকতে দেখলে নিশ্চয়ই পাগল মনে করবেন। আপনি কি শহরের দিকে একেবারেই যান না?"

মায়া বলিল "যাই বই কি? বন্ধুবান্ধবের বাড়ী যাই, সিনেমায় যাই, ভাল opera বা ballet এলে তাতেও যাই।"

দেবকুমার খুব উৎসাহিত হইয়া বলিল, "একটা খুব ভাল Russian Ballet এসেছে, যাবেন? বলেন ত টিকিট ক'রে রাখি।"

মায়া বলিল, "যাবার সময় হবে কিনা তা ত জানি না। তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রে জানাব।"

দেবকুমার বলিল, "তা ঠিক, আমারই ভুল হয়েছিল। ও দেশে ত বাপ-মায়ের অনুমতি নেওয়া জিনিষটা একটা প্রাগৈতিহাসিক কাণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখানে যে তা মোটেই নয়, তা মনে ছিল না। আমি টেলিফোন নিয়েছি আমার রুম্-এ। আমায় তা হলে কাল দয়া ক'রে জানাবেন।"

মায়া বলিল "আচ্ছা। বাবার এ সবে এখনও উৎসাহ আছে, সময় থাকলে তিনি কখনও না বলবেন না।"

দেবকুমার বলিল, "আপনাকে এতক্ষণ জ্বালানোর শাস্তি স্বরূপ এরপর আমাকে হেঁটে রেঙ্গুন ফিরতে হবে বোধহয়। এ দেশে গাড়ী বা ট্যাক্সি কিছুই পাওয়া যায় না ত?"

মায়া বলিল "আমার গাড়ীতে যান, আমি ড্রাইভারকে ব'লেই রেখেছি। এদিকে মোটর-বাস্ ট্রাম সবই আছে, কিন্তু তাতে যাবার কিছু দরকার নেই আপনার।"

দেবকুমার বলিল, "আপত্তি করা উচিত ছিল, করব না। আপনার ড্রাইভার যদিও মনে মনে আমাকে খুব গাল দেবে।"

মায়া বলিল, "গাল দেবার জন্যে ত তাকে রাখা হয়নি, কাজ করবার জন্যে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া বিকেলের দিকে আমাদের বাড়ী অতিথি-অভ্যাগত কেউ এলে, তাঁদের যে আমরা বাড়ী পৌঁছে দিতে বলব, তা তাদের জানাই আছে।"

দেবকুমার এবং মায়া দুইজনেই গাড়ীবারান্দার দিকে অগ্রসর হইল। হঠাৎ দেবকুমার নীচু গলায় বলিল, "আমি কবি হলে আজ একটা কবিতা লিখতাম। কিন্তু সে ক্ষমতাটা নেই। পাঠকরা একটা ভাল জিনিষ থেকে বঞ্চিত হল।"

মায়ার মনটা কেমন যেন করিয়া উঠিল। কিছু বলার খাতিরে জিজ্ঞাসা করিল, "লেখা অভ্যাস আছে বুঝি?"

"অভ্যাস ত ছিল না, দরকার বোধও করিনি। তবে মনে হচ্ছে এরপর অভ্যাসটা করতে হবে," হাস্যমুখেই কথাটা বলিল।

মায়া কিন্তু হাসিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না কথাটার মধ্যে। উত্তরেই বা সে কি বলিবে? দেবকুমার কি মনে করিয়া কথা বলিতেছে তাহা সে বুঝিবে কেমন করিয়া? কিন্তু কে যেন তাহাকে বুঝাইয়া দিতে চাহিতেছে।

গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। দেবকুমার বলিল, "খুব অনেকক্ষণ ক'রে বিরক্ত ক'রে গেলাম, কিছু মনে করবেন না।"

মায়া বলিল "আপনি সত্যিই নিশ্চয় ভাবছেন না যে এতক্ষণ থেকে আপনি আমায় একটুও বিরক্ত করেছেন? আমি এত বেশী একলা থাকি যে কেউ দয়া ক'রে এলে অত্যন্ত খুশী হই।"

দেবকুমার বলিল, "দয়া তারা করে না, আপনিই করেন তাদের আসতে দিয়ে আর থাকতে দিয়ে। তবে সেটা নিজে বুঝতে পারেন না। আচ্ছা, আজ আসি তবে।" সে নমস্কার করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

গাড়ী চলিয়া যাইবার পরও মায়া খানিকক্ষণ নীচে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। অজয় বা তাহার পিতা যে বাড়ীতে নাই, ইহাতে সে খানিকটা যেন স্বস্তি পাইতেছিল। তাহার মনের অবস্থাটা এমনই হইয়াছিল যে, কাহারও সঙ্গে কথা বলাই তাহার অসম্ভব বোধ হইতেছিল।

নিজের শুইবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, আয়া তখনও বিছানা করিতেছে। মায়াকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব চলা গিয়া দিদিমণি?"

মায়া বলিল, "হাঁ।" সে অন্যমনস্কভাবে ব্রোচ্, নেক্‌লেস্, প্রভৃতি খুলিয়া রাখিতে লাগিল। আয়া একটু পরে বলিল, "বহুৎ আচ্ছা দেখ্‌নে কো হায়। ছোক্‌রা বোল্‌তা বারিষ্টর্ বন্‌কে আয়া?"

মায়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "যা, যা, তোর অত খবরে কাজ কি? ব্যারিষ্টার ত কত লোকেই হয়।" আয়ার কাজ আর শেষই হয় না। চাদর ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "সাদি হোনে সে বহুৎ আচ্ছা।"

মায়া চম্‌কিয়া উঠিল ভয়ানক ভাবে। চাকরবাকরও হঠাৎ একথা বলিতে সুরু করিল কেন? তাহার যে দেবকুমারের সঙ্গে বিবাহ হইতে পারে, তাহা মনে করিবার উহাদের কি কারণ ঘটিয়াছে? মায়া ত যথেষ্ট সাবধান হইয়া চলিয়াছিল, দেবকুমারের ব্যবহারেও কোথাও কোনো ত্রুটি হয় নাই। তাহা হইলে এমন কথা উহাদের মনে আসিল কেমন করিয়া?

সে আয়াকে তাড়া দিয়া বলিল, "কি বাজে বকিস্? ফের এ সব কথা শুনলে তোর চুল ছিঁড়ে দেব। যত বুড়ো হচ্ছিস্, তত আক্কেল কমছে।"

আয়া হাসিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। যাইবার আগে একখানা চিঠি

আয়ার হাতে দিয়া বলিল, চিঠিখানা খানিক আগে আসিয়াছে, বাহিরের লোক থাকার জন্য সে দিতে পারে নাই।

উপরের হাতের লেখাটা দেখিয়া মায়া চিনিল প্রভাসের চিঠি। খুলিতে বিশেষ উৎসাহ বোধ হইল না। চিঠিখানা ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখিয়া সে আস্তে আস্তে কাপড়চোপড় ছাড়িতে লাগিল। তাহার মনোজগতে এখন প্রভাসের স্থান কোথায়? সাবিত্রী, তাহার স্মৃতিমন্দির স্থাপন, দেশের কাজ করা, সবই যেন মায়ার জীবন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। সেখানে এখন একাধিপত্য। কয়েকটা মাত্র দিন আগে যে মানুষের অস্তিত্ব সে জানিত না বলিলেই হয়, এখন তাহাকে ছাড়া আর কিছু মায়া ভাবিতেই পারে না। কিন্তু সে ভাবনায় আনন্দ যত, বেদনাও তত। মায়া কি করিবে, কোন্ পথে যাইবে?

কাপড়চোপড় ছাড়া হইয়া গেল। সে-সব নিজে গুছাইয়া রাখিতে আর তাহার ইচ্ছা হইল না। আয়ার জন্য ইলেক্‌ট্রিক্ বেল্ বাজাইয়া, চিঠিখানা হাতে করিয়া সে নিজের পড়ার ঘরে চলিয়া গেল।

প্রভাস বেশী কিছু লেখে নাই। সে সময় মত ছুটি পায় নাই। কয়েকদিন পরে মাস দেড়েকের ছুটি লইয়া বাড়ী যাইবে। ছোট ভাই সুভাষের বিবাহ সেই সময়। বিবাহ এবং তদানুষঙ্গিক সব গোলমাল চুকিয়া গেলেই, সে মায়ার কাজ লইয়া পড়িবে। Plan সব ঠিক হইয়া গেলেই সে বর্মা যাত্রা করিবে। তাহার দেশ বেড়ানোও হইবে, মায়ার কাজও হইবে। অনেক দিন হইতেই তাহার দেশবিদেশ বেড়াইবার ইচ্ছা, কিন্তু এতদিন সময়ও পায় নাই, অর্থও ছিল না। এখন দুইটার ব্যবস্থাই একরকম হইয়াছে, কাজেই ভাবনা নাই। মায়া এবং নিরঞ্জনের সহিত মুখোমুখি পরামর্শ করিয়া কাজ করাই ভাল, না হইলে চিঠি লেখালেখি করিয়া অনর্থক সময়ও যাইবে, এবং কাজও ভাল করিয়া হইবে না।

মায়ার আর একটা ভাবনা আসিয়া জুটিল। মায়ের স্মৃতিমন্দির স্থাপনের মধ্যে নিরঞ্জনকে না জড়ানোই তাহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রভাসের চিঠিতে বুঝিল, তাহা হইবার নয়। রেঙ্গুনে আসিলে সে তাহাদের বাড়ীতেই আসিবে, এবং নিরঞ্জনকে বাদ দিয়া কোনো কথাই সে বলিবে না, বলা সম্ভবও হইবে না। কাজেই যেমন করিয়া হোক, কথাটা তাহাকে আগে পাড়িয়া রাখিতেই হইবে।

তাহার শরীর মন অকারণে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর কিছু ভাবিতে তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না। সে চিঠিখানা দেরাজে রাখিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল। সে রাত্রে আর আহারাদি করিতেও উঠিল না।

৩৪

নিরঞ্জন সকালে অফিস্‌ঘরে বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। আগের দিন রাত্রে ফিরিতে তাঁহার অত্যন্ত দেরি হইয়া গিয়াছিল, আসিয়া আর মায়ার সঙ্গে দেখা হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন যে, সে শুইতে চলিয়া গিয়াছে, কাজেই আর ডাকেন নাই।

ছোকরা আসিয়া খবর দিয়া গেল যে চা দেওয়া হইয়াছে। কাগজপত্র রাখিয়া নিরঞ্জন খাবার ঘরে চলিলেন। মায়া নামিয়া আসিয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল দেবকুমার এসেছিল ত?"

মায়া চোখ নীচু করিয়াই উত্তর দিল, "হ্যাঁ, এসেছিলেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "এমন কাজের তাড়া পড়েছে যে কিছুতেই আগে আসতে পারলাম না। আজও ঐ রকম রাত হবে। এ সপ্তাহটা বোধ হয় যাবে এইভাবেই। তা অজয় ছিল ত?"

মায়া বলিল, "হ্যাঁ, অজয় এসেছিল। দেবকুমার বাবু বলছিলেন, খুব ভাল একটা Russian Ballet এসেছে। তিনি যাবেন, আমরাও যাব কিনা তাঁকে জানালে তিনি টিকিট ক'রে রাখবেন কালকের জন্যে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "সময় পাওয়া শক্ত। দেখি, অফিসে গিয়া যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারি।"

খানিকক্ষণ আর কিছু কথাবার্তা হইল না। নিরঞ্জন খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলেন, এবং মায়া চা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। প্রভাসের কথা বাবাকে না বলিলেও নয়, অথচ কেমন করিয়া যে সে কথাটা পাড়িবে তাহা ভাবিয়াই পাইতেছিল না।

অবশেষে আর কোনো উপায় না দেখিয়া বলিল, "কালকে আমাদের গ্রামের প্রভাসদার একটা চিঠি পেয়েছি।"

নিরঞ্জন মুখ তুলিয়া বলিলেন, "ও, প্রভাসের? সে তোকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে বুঝি? কি লিখেছে সে?"

মায়া বলিল, "না আগে ত লিখতেন না, এবার গ্রামে গিয়ে তাঁকে একটা কাজের ভার দিয়ে এসেছিলাম, তারই জন্যে লিখেছেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কি কাজ? গ্রামে গিয়ে তাই বুঝি আসতে দেরি হচ্ছিল?"

আর না বলিলে নয় যখন, তখন মায়া বলিয়াই ফেলিল। "মায়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্যে গ্রামে একটা কিছু করব ঠিক করেছিলাম। আমার হাতে কিছু টাকা জমেছে। তাই কি রকম জিনিষ হলে সব চেয়ে ভাল হয়, সেটা জানতে প্রভাসদাকে ব'লে এসেছিলাম। সেই বিষয়ে লিখেছেন, এখানে কিছুদিন পরে একবার আসবেন এবং মুখোমুখি সব আলোচনা করবেন, তাঁর ইচ্ছে।"

কথাটা বলিয়াই মায়া একবার ভয়ে ভয়ে পিতার মুখের দিকে তাকাইল। তিনি বিরক্ত হইবার কোনো লক্ষণ না দেখাইয়া বলিলেন, "তা বেশ ত। কবে আসছে?"

মায়া বলিল, "দিন পনেরো-কুড়ি পরে বোধহয়। তার ছোট ভাইয়ের বিয়ে এই সময়ে, সেটা হয়ে গেলেই আসবেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "উৎসাহ থাকতে থাকতে ক'রে ফেলা ভাল। বেশী দেরি করলে শেষ অবধি আর হয়েই ওঠে না। আমার ইচ্ছা ছিল, আমার বাবার নামে ভাল একটা টোল খুলব, কিন্তু হাতে তখন বেশী পয়সা ত থাকত না? সর্বদাই দেখতাম যে মৃতের চেয়ে জীবিতের claimটাই বড়। শেষ অবধি আর হলই না। যখন টাকা হল, তখন ওটা মনের মধ্যে অনেক জিনিষের তলায় চাপা প'ড়ে গিয়েছে, আর কিছু করে উঠতে পারলাম না। কিন্তু কত টাকাই বা তোর কাছে আছে? আচ্ছা, প্রভাস আসুক, তারপর সবাই মিলে পরামর্শ ক'রে ঠিক করব। করতে হলে ভাল ক'রেই করা উচিত।"

মায়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহা লইয়া যদি আবার গোলমাল কিছু হইত, তাহা হইলে বেচারীর আর যন্ত্রণার সীমা থাকিত না। সে এখন কোনো কিছুতেই মন দিতে পারে না, বাপের সহিত মায়ের স্মৃতি লইয়া তর্ক করার অবস্থা তাহার মোটেই নয়। পড়াশুনায় একেবারেই মন দিতে পারে না। কলেজে নিতান্ত না গেলে নয়, তাই যায়। কিন্তু সেখানে কি যে হয়, না হয়, কিছুই যেন তাহার মাথায় ঢোকে না। বাড়ীতেও বই হাতে করিয়া সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকে, তবু মন দিতে পারে না। নিজের অজ্ঞাত-সারেই দেবকুমারের চিন্তা আসিয়া তাহার মন জুড়িয়া বসে। সে কখন কি

বলিয়াছিল, কি মনে করিয়া বলিয়াছিল, তাহাই শতবার ভাবে। মানস-দৃষ্টিতে সেই-সব দৃশ্য আবার দেখিয়া পুলকিত হয়। মনোরাজ্যের মধ্যে যেখানে মানুষের স্মৃতির চিত্রশালা, সেইখানে ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রেমের আলোকে প্রিয়ের মুখ আরো উজ্জ্বল সুন্দর করিয়া দেখে।

নিরঞ্জন উঠিয়া যাইবার পরেও মায়া অনেকক্ষণ খাবার টেবিলেই বসিয়া রহিল। Russian Balletতে যাইতে পারিবে কি না, তাহা সকালের মধ্যেই দেবকুমারকে টেলিফোন করিয়া জানাইতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু নিরঞ্জন অফিসে গিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিবেন কি না, তাহা জানিতে না পারিলে সে দেবকুমারকে কি জানাইবে? কিন্তু দেবকুমার হয়ত জানিবার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। কোনো খবর না পাইলে সে মায়াকে মনে করিবে কি? একটা কোনো রকম খবর ত দেওয়া উচিত? মায়া ধীরে ধীরে টেলিফোনের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

দেবকুমারের সাড়া পাইতে মোটেই দেরি হইল না। ভাবে মনে হইল, সে রিসিভার হাতে করিয়াই যেন বসিয়াছিল। খুব উৎসাহিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর? আজ যাচ্ছেন ত?"

মায়া বলিল, "বাবা অফিসে না যাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছেন না। তাঁর কাছ থেকে খবর পেলেই আপনাকে জানাব।"

দেবকুমার বলিল, "খবরটা আমিই ত তাঁর অফিস থেকে জেনে আপনাকে জানাতে পারি। কোকাইন ঘুরে রেঙ্গুনের খবর আবার রেঙ্গুনে ফিরে আসার কি দরকার? অনর্থক খানিকটা সময় যাবে।"

মায়া বলিল, "আচ্ছা, তাই করবেন। আমাকে সাড়ে দশটার মধ্যে জানালে ভাল, কারণ তারপর ত আমি কলেজে চ'লে যাব।"

দেবকুমার বলিল, "নিশ্চয়, আমি এখনই যাচ্ছি তাঁর কাছে।"

মায়া টেলিফোন রাখিয়া উপরে উঠিয়া গেল। প্রভাসের চিঠিখানার একটা সংক্ষিপ্ত জবাব লিখিয়া রাখিল। দেবকুমার কখন যে তাহাকে টেলিফোন করিবে তাহার ঠিক নাই। আয়া আসিয়া স্নান করিবার জন্য বার-দুই তাড়া দিয়া গেল। কিন্তু মায়া নড়িবার নাম করিল না। আয়াকে বলিয়া দিল যে তাহার শরীর বিশেষ ভাল লাগিতেছে না, স্নান করিলেও পরে করিবে। সে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল, কখন ডাক আসে। দেবকুমারের ঘর নিরঞ্জনের অফিসের কাছেই, কাজেই খবর নিতে খুব বেশী দেরি হইবার কথা নয়।

টেলিফোনের ঘণ্টা টিং টিং করিয়া উঠিল। মায়ার ইচ্ছা করিতে লাগিল ছুটিয়া নীচে যায়, কিন্তু তাহা হইলে চাকরবাকরে মনে করিবে কি? কোনো-মতে ধৈর্য্য ধরিয়া সে খাটের উপর বসিয়া রহিল। কিন্তু কেহই তাহাকে ডাকিতে আসিল না। মায়া নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নিরঞ্জন হয়ত এখনও অফিসে পৌছান নাই, দেবকুমার তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। নয়ত তাহার নিজেরই কোনো কাজ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার জন্য দেরি হইতেছে।

ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল, সময় হইয়া আসিতেছে, কলেজ যাইতে হইলে আর দেরি করা চলে না। নিতান্তই অনিচ্ছা সত্ত্বে এবং নিরুৎসাহভাবে উঠিতে যাইতেছে এমন সময় আর একবার টেলিফোনের ঘণ্টা শোনা গেল। মিনিট খানিকের মধ্যেই ছোক্‌রা আসিয়া খবর দিল যে নীচে টেলিফোনে দিদিমণিকে ডাকিতেছে। মায়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। দেবকুমার তাহার সাড়া পাইবা মাত্র বলিল, "দেখুন, আপনার বাবা ত যেতে পারবেন না। কিন্তু থামুন, এখনি চ'টে রিসিভারটা ফেলে দেবেন না। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যেতে। আপনি কি যাবেন? তা হ'লে এখুনি গিয়ে টিকিট ক'রে রাখি।"

মায়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, যাব।" সে আর কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া আসিল।

নিরঞ্জন সব বিষয়েই সাহেবীআনার ভক্ত। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত কন্যা সম্বন্ধে একটু যেন বাঁধাবাঁধি করিতেন। অবশ্য মায়া আলাপ করিত সকলের সঙ্গেই, কিন্তু ইহার বেশী ঘনিষ্ঠতা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই। হঠাৎ দেবকুমারকে এতখানি নিকটে আসিবার সুবিধা এক রকম যাচিয়া দেওয়াতে মায়া অবাক্ হইয়া গেল। পিতা কি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন? এই কি তাঁহার আশীর্বাদ? মায়ার বুকের ভিতরটা দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কলেজে যাইতে তাহার মন কিছুতেই যেন রাজী হইল না। শরীর খারাপের ছুতা করিয়া সে গিয়া শুইয়া পড়িল। অনেক বেলায় তবে উঠিয়া স্নানাহার করিল। একবার আশা করিল, হয়ত দেবকুমার আবার টেলিফোন করিবে। কিন্তু আর কোনো আহ্বান আসিল না।

মায়ার ষোড়শ জন্মদিনে নিরঞ্জন তাহাকে একপ্রস্থ হীরার অলঙ্কার উপহার দিয়াছিলেন। উহা বহুমূল্য বলিয়া মায়া বিশেষ কখনও পারে নাই, ব্যাঙ্কেই

জমা থাকিত। আজ সখ করিয়া মায়া তাড়াতাড়ি সেগুলি আনিতে লোক পাঠাইয়া দিল। তাহার বন্ধুবান্ধবরা সর্বদা ঠাট্টা করিত যে, বর না আসিলে মায়া এগুলি কখনও পরিবে না। সেই কথা মনে করিয়া মায়ার মুখটা একটু লাল হইয়া উঠিল।

বেলাটা শীঘ্রই কাটিয়া গেল। দেবকুমার টেলিফোন করিয়া জানাইল যে, সে সাড়ে চারটার সময় মায়াকে আনিতে যাইবে। আজ বৈকালিক নৃত্যের আয়োজন, কাজেই তাড়া একটু আছে।

সাজসজ্জা আরম্ভ করার আগে মায়া গিয়া চায়ের আয়োজন করিতে বলিয়া আসিল। দেবকুমার আসিলে তাহাকে একেবারে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। তাহার পর আসিল সাজের পালা। এত যত্ন করিয়া মায়া কোনদিন সাজে নাই। কোথাও কোনো খুঁৎ সে রাখিল না। হীরার গহনার সঙ্গে ভাল মানাইবে বলিয়া খুব চওড়া ঢালা জরীর পাড়ের বহুমূল্য শাদা মাদ্রাজী শাড়ী ও সেই কাপড়ের ব্লাউস পরিল। চুলে পরিবার হীরা বসান একটা বড় গোল ফুল ছিল। বাহিরে যাইতে হইলে তখনকার রীতি অনুযায়ী মাথায় কাপড় দিয়াই মায়া যাইত। আজ মাথা খোলাই রহিল। আয়নার ভিতর চাহিয়া মায়া খুশী না হইয়া পারিল না। যেন দীপ্ত অগ্নিশিখার মতই তাহাকে দেখাইতেছে। ঘড়িতে চারিটা বাজিতেই সে চা ঠিক করিতে বলিল। ঠিক সাড়ে চারিটা বাজিতেই দেবকুমারের ট্যাক্সি গেটের ভিতর প্রবেশ করিল।

৩৫

ট্যাক্সিটাকে বিদায় করিয়া দেবকুমার হলের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। মায়ার দিকে চাহিয়া দেখিল, তবে কথা অল্পক্ষণ কিছুই বলিল না। মায়ার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। এত সাজার জন্য দেবকুমার তাহাকে না জানি কি ভাবিতেছে।

অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাইবার জন্য সে বলিল, "চা-টা তৈরিই ছিল, একটু খেয়ে গেলে হত না?"

দেবকুমার হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিল, "সময় আছে অল্প একটু। বললেন যখন, তখন না খেয়ে আর যাওয়া যায় না।"

খাইবার ঘরে গিয়া মায়া তাড়াতাড়ি দেবকুমারকে চা ঢালিয়া দিল, জলখাবার সাজাইয়া দিল। নিজেও এক পেয়ালা চা ঢালিয়া লইল, তবে কিছুই যেন তাহার গলা দিয়া যাইতে চায় না।

দেবকুমার খাইতে খাইতেই বলিল, "অত ব্যস্ত হবেন না, একটুও দেরি হবে না, ঠিক সময়েই পৌঁছাবেন।"

মিনিট দুই পরে দুজনেই উঠিয়া পড়িল। দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ী তৈরিই আছে ত?"

মায়া বলিল, "হ্যাঁ", গাড়ীও আসিয়া দাঁড়াইল। আয়াকে তাহার জন্য রাত্রে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দিয়া মায়া দেবকুমারের সহিত বাহির হইয়া পড়িল।

রাস্তা জনবিরল, অনেকক্ষণ পরে পরে একজন পথিক বা একটা গাড়ী দেখা যায়। দেবকুমার বলিল, "নীরবতার কেমন একটা প্রভাব আছে মনের উপর, নিজেকেও চুপ ক'রে যেতে হয়। অথচ কথা বলতে যে ইচ্ছে করছে না, তা মোটেই নয়।"

মায়া একটু হাসিয়া বলিল, "ইচ্ছে করলে ত কথা বলাই ভাল। চুপ ক'রে থাকতেই হবে এমন ত কোনো আইন নেই?"

দেবকুমার বলিল, "তা আইন নেই বটে। তবে এমন কিছু ব'লে বসা বিচিত্র নয়, যা বেআইনী বলে গণ্য হতেও পারে।"

মায়ার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। কি এমন কথা? ইচ্ছা করিলেই সে কথা ঘুরাইয়া লইতে পারিত, কিন্তু দেবকুমার কি যে বলিতে চায়, তাহা শুনিবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাহাকে পাইয়া বসিল। সে বলিল, "শুনলে তবে ত বুঝতে পারি আইনী কি বেআইনী।"

দেবকুমার বলিল, "তাহ'লে সাহসে ভর ক'রে ব'লেই ফেলি। আপনাকে আশ্চর্য রকম সুন্দর দেখাচ্ছে আজ।"

মায়ার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস ঘনাইয়া উঠিল। ইহার উত্তরে কি সে বলিতে পারে? কিন্তু এই কথাটা শুনিবার ইচ্ছাই কি তাহার মনে মনে ছিল না? এত যত্ন করিয়া সে সাজিয়াছিল কাহার জন্য? কিসের আশায়?

দেবকুমার মিনিট খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বিরক্ত হলেন কি? এই জন্যেই বলতে ইতস্তত করছিলাম।"

মায়া এতক্ষণ পরে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার দেবকুমারের মুখের দিকে চাহিল, বলিল, "না, নি, বিন্দুমাত্রও বিরক্ত হই নি।"

কথা না বলিয়া দেবকুমার বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত না। কিন্তু সেও আজ খানিকক্ষণ চুপ করিয়াই রহিল। তাহার পর শহরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "এসে ত পড়লাম। কেন জানি না, এখন আর নাচটা দেখতে খুব উৎসাহ বোধ করছি না।"

মায়ারও যে বিশেষ কিছু উৎসাহ বোধ হইতেছিল, তাহা নয়। অনেক কষ্টে সে একটুখানি হাসিল মাত্র। মনের ভিতরটা তাহার অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিতেছিল। বাড়ী গিয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। তাহার বদলে জনারণ্যের মধ্যে বসিয়া তাহাকে তিন-ঘণ্টা নাচ দেখিতে হইবে। তাহার মন থাকিবে কোথায়, আর চোখ দুইটাকে বাধ্য হইয়া থাকিতে হইবে কোথায়?

যে হলটিতে নাচ হইবে, তাহার সম্মুখে তখন ভয়ানক ভীড় জমিয়া গিয়াছে, যেমন গাড়ী-ঘোড়া, মোটর, তেমনি মানুষ। পুলিশের উৎপাতে একখানা গাড়ী আধ মিনিটের বেশী দাঁড়াইতে পারিতেছে না। মায়াদের গাড়ী দাঁড়াইবামাত্র দেবকুমার তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া বলিল, "চট্ ক'রে নেমে পড়ুন, যা ভীড় হয়েছে!"

মায়া নামিতে যাইবামাত্র পিছনের একটা গাড়ীর ঘোড়া ক্ষেপিয়া উঠিল। দেবকুমার ব্যস্ত হইয়া মায়াকে বাহু ধরিয়া নামাইয়া দিল এবং হাত না ছাড়িয়াই বলিল,, "চলুন, এটুকু পার হয়ে যাই, তাড়াতাড়ি। ইস্, কম ক'রেও হাজার-দুয়েক লোক এখানে জমেছে।"

ভীড় কাটাইয়া আসিয়াই সে মায়ার হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া একটু বিস্মিত হইল। মায়ার মুখটা একেবারে শাদা হইয়া গিয়াছে। কারণটা ঠিক বুঝতে পারিল না, তবে ভাবিল, তাহার হয়ত মায়াকে স্পর্শ করা ঠিক হয় নাই। এটা যে বিলাত নয় সেটা সে ভুলিয়া গেল কেন? এখানে সহসা কেহ অনাত্মীয়া যুবতীর হাত ধরিতে যায় না। একটু অপ্রতিভ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, "ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে?"

মায়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "না।"

দেবকুমার এবার একটু সন্দেহাকুল নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু এখন ত কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার সময় নয়। শুধু বলিল, "গিয়ে বসলেই একটু ভাল feel করবেন। বড় বেশী ভীড় হয়েছে।"

মায়াকে খানিকটা হাঁটিয়া যাইতেই হইল। তাহার পা তখন ঠকঠক

করিয়া কাঁপিতেছে। কোনোমতে ফুটপাথ অতিক্রম করিয়া সে হলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে বসিবার জায়গা খুঁজিয়া পাইতে তাহাদের বেশী দেরি হইল না। বসিয়া পড়িয়া সে যেন বাঁচিল।

দেবকুমার বলিল, "বাঙালীরা দেখছি conspicuous by their absence. তাদের নাচ ভালই লাগে না বোধ হয়।"

মায়া বলিল, "বাঙালী মেয়ে ত দেখছি একমাত্র আমি।"

দেবকুমার বলিল, "আমরা আমাদের মেয়েদের যা অবস্থায় রেখেছি, তাতে তাদের এ সব জায়গায় না আসাই ভাল। প্রকাশ্য জায়গায় হাজার লোকের মধ্যে তারা যে রকম হৈ চৈ বাধায়, দেখলে ভারি বিরক্ত লাগে। যতদিন বাইরে সপ্রতিভ এবং সহজভাবে চলবার জ্ঞান না হবে, ততদিন না বেরনোই ভাল।"

মায়া বলিল, "তা, বাইরে বের না করলে, কি ক'রে তারা শিখবে?"

এই সময় নাচ সুরু হওয়াতে তারা কথা বন্ধ করিল। মায়ার চোখ স্টেজের দিকে আবদ্ধ রহিল বটে, কিন্তু মন চলিয়া গেল অন্য কোনখানে। কি যে দেখিল এবং কি যে শুনিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে পারিত কি না সন্দেহ। দেবকুমারের অবস্থাও প্রায় তাহারই মত, কিন্তু তবু সে মাঝে মাঝে কথা বলিতেছিল, তবে মায়ার কাছে হ্যাঁ-না ছাড়া অন্য কিছু জবাব পাইতে-ছিল না।

ঘণ্টা তিন পরে তাহারা যখন বাহির হইয়া আসিল, তখনও মায়া গম্ভীর হইয়াই আছে। দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি ভাল লাগল না?"

মায়া বলিল, "না, বেশ ত লেগেছে!"

দেবকুমার মায়াকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া বলিল, "আপনাকে গিয়ে পৌঁছে দেওয়াই আমার উচিত, এবং তা যাবও, কিন্তু আপনার মুখ দেখে খুব ভরসা পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে, কোনো কারণে আপনি যেন ভয়ানক বিরক্ত হয়েছেন।"

মায়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি যে বলেন তার ঠিক নেই। বিরক্ত হতে যাব কেন? সে রকম কিছু ত হয় নি।"

দেবকুমার গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "তা হ'লে এ রকম মুখ ক'রে রয়েছেন কেন? আপনার বেশ ভাল লাগবে আশা ক'রেই আপনাকে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার একেবারেই ভাল লাগল না, এতে নিজেকে একটু snubbed লাগছে।"

গাড়ীটা শহরের সীমানা ছাড়াইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল, ইহারই মধ্যে। মায়া এতক্ষণ একদৃষ্টে বাহিরের দিকে চাহিয়াই বসিয়াছিল, এবার দেবকুমারের দিকে খানিকটা ফিরিয়া বসিয়া বলিল, "আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ত করলাম ভাল লাগাতে, কিন্তু কিছুতেই যে মন দিতে পারলাম না।"

দেবকুমার একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, "জানতে চাইবার আমার কোন অধিকার নেই, তবু জানতে না চেয়ে পারছি না। কেন পারলেন না মন দিতে ?"

মায়া কি যেন বলিতে গেল, আবার থামিয়া গেল। তাহার পর কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "ভয়ানক মন খারাপ হয়ে আছে আমার, আমি এখন কিছুই যেন ভাবতে পারি না, বুঝতে পারি না।"

দেবকুমার এতক্ষণ অনেকখানি দূরত্ব রক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ অনেকখানি কাছে সরিয়া আসিল। মায়ার মুখের উপর প্রায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কেন ? আমাকে বলা যায় না ?"

মায়া চেষ্টা করিল সরিয়া বসিতে, চোখ ফিরাইয়া লইতে ; চেষ্টাটা সফল হইল না। চোখ সে ফিরাইতে পারিল না। দেবকুমারের দৃষ্টি যেন তাহাকে আলিঙ্গনের মত জড়াইয়া ধরিল, তাহার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস মায়ার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। মায়া কিছুই আর বলিতে পারিল না। মাথা নীচু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

দেবকুমার মায়ার দুইটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কেঁদো না মায়া। গাড়ীতে ব'সে কি বলব আমি তোমাকে ? তুমি আজ বুঝতে পারলে নিজের মনকে ? আমি কবে থেকে পাগল হয়ে আছি, কিন্তু পথ দেখতে পাইনি। এ জন্মের সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য আজ তুমি আমায় দিলে। চুপ কর লক্ষীটি, একটু শান্ত হও, এখনি বাড়ী এসে পড়বে।" একবার তাহাকে একহাতে জড়াইয়া ধরিল, তখনি ছাড়িয়া দিল।

বাড়ীর কাছেই আসিয়া পড়িয়াছে গাড়ী। দেবকুমার মায়ার হাত ধরিয়া একটু নাড়া দিয়া বলিল, "সুন্দর মুখটা ত এখনও চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। মুছে ফেল চোখ। নইলে নামবে যখন বাড়ীতে, তখন তোমার ড্রাইভারটা কি ভাববে ? এর মধ্যেই যদি না কিছু ভেবে থাকে। অন্য চাকর-বাকরও সামনে পড়া অসম্ভব নয়।"

মায়া মাথা নীচু করিয়াই চোখ মুছিতে লাগিল। দেবকুমারের মুখের

দিকে সে যেন আর চাহিতে পারিতেছে না। এ কি ব্যাপার হইল? এ রকম কিছু যে হঠাৎ ঘটিয়া যাইতে পারে তাহা সে সন্ধ্যার সময় একবারও ভাবে নাই। দেবকুমারের ভালবাসা সে পাইয়াছে কিনা তাহাও সে সঠিক জানিত না। কথা সে ত অনেক রকমেই বলে। কিন্তু তাহা সদ্য বিদেশ-প্রত্যাগত যুবকের উচ্ছ্বাস বলিয়া ধরিয়া লওয়াও যায়। সেখানে ত এই ভাবে কথা সবাই সবাইকে বলে। কিন্তু মায়া এমন করিয়া ধরা দিয়া বসিল কেন? কেন পারিল না, নিজেকে সংযত করিতে? দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "মাথাই যে তুলছ না? খুব অনুতাপ হচ্ছে, এরকমভাবে মনের কথাটা প্রকাশ হয়ে গেল ব'লে? কিন্তু আমাকে তুমি বাঁচিয়েছ মায়া, আমি কি ক'রে যে একথা তোমায় বলব ভেবেই পাচ্ছিলাম না।"

গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল গাড়ীবারান্দার নীচে। মায়া নামিতে নামিতে বলিল, "এখনি চ'লে যাবেন না, আপনি বাবার অফিস্‌রুমে বসুন একটু, আমি এখনি আসছি।" দেবকুমার কিছু বলিবার আগেই সে ছুটিয়া উপরে চলিয়া গেল।

তাড়িতাড়ি মুখে চোখে জল দিয়া অশ্রুর চিহ্ন মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। চুলটা একবার ঠিক করিয়া লইল। নিজের শরীর তখনও কাঁপিতেছে, বুকের মধ্যে রক্তস্রোত ঝড়ের সাগরের মত উন্মত্ত তালে নাচিতেছে। কিন্তু এখন উপরে দাঁড়াইয়া ভাবিবার সময় নয়। নীচে তাহাকে যাইতে হইবে। কথায় যাহা জানাইবার আর প্রয়োজন নাই, তাহা জানাইতে হইবে হয়ত। যাহা শোনা তাহার হইয়া গিয়াছে, তাহাও আর একবার শুনিতে হইবে।

ঘরে ঢুকিবামাত্র দেবকুমার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। মায়াকে আলিঙ্গন করিয়া সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার কম্পিত ওষ্ঠাধরে চুম্বন করিয়া বলিল, "নিজের অধিকারটা বেশী নিচ্ছি না ত? আবার মুখ ফিরোচ্ছ কেন? চল বসবে, এমন কাঁপছ যে এখনই প'ড়ে যাবে মনে হচ্ছে। এত কেন upset হচ্ছ? নিজেকেও জান, আমাকেও জানলে। আর ভয় পাবার কিছু নেই।"

সোফায় বসাইয়া মায়ার পাশে সেও বসিয়া পড়িল। বলিল, "বড় বেশী বিচলিত মনে হচ্ছে তোমাকে। পরস্পরের কাছে আমরা এখনই ধরা পড়ি, এটা বোধ হয় চাইছিলে না?"

মায়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আগে ভেবে দেখিনি। নিজের মন ত জানতাম, কিন্তু আপনাকে খুব ভাল ক'রে বুঝতে পারিনি আজকের আগে।"

মায়ার হাত ধরিয়া আবার নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া দেবকুমার বলিল, "বড় বেশী ছেলেমানুষ তুমি। জানাবার চেষ্টার ত ত্রুটি করিনি। তবে আর বেশী কি করতে পারতাম বল? হঠাৎ এ ব্যাপারটা এগিয়ে গেল। নয়ত তোমার বাবার অনুমতি নিয়ে এগোবার ইচ্ছাই ছিল। মনে হয়েছিল, সেইটাই হয়ত তুমি পছন্দ করবে, বেশী আধুনিকতা চাইবে না। কিন্তু তাতে কি দুঃখিত হয়েছ?"

মায়া বলিল "না, আর দুঃখ করবার কিছু নেই। ছেলেবেলায় শুনতাম বটে যে বিয়ের আগে স্ত্রীপুরুষের ভালবাসা, একটা বড় নিন্দার জিনিষ, প্রায় মহাপাপ। এখন মনে হচ্ছে, এত বড় পুণ্য কর্ম্ম জগতে নেই। ভিতরের জীবনে এইটেই জন্মদিন। এর আগে বেঁচে যে ছিলাম তাই মনে হচ্ছে না।"

মায়ার মুখ দুই হাতে ধরিয়া দেবকুমার বলিল, "এইবারে বেশ কথা বলতে পারছ। যাক, ভাগ্যে তোমার ছেলেবেলার শিক্ষা এই সময়ে তোমাকে রক্ষা করতে আসেনি। তাহলে তোমাকে আমি পেতাম না হয়ত। অবশ্য আজ যা হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসে হঠাৎ হয়ে বসল, তা যদি নাও হত, তাহলেই কি আর আমি তোমার আশা ছাড়তে পারতাম? সনাতন মতে তোমার বাবার কাছেই প্রস্তাব করতে হত। কিন্তু তিনি কি বলতেন তাই বা কে জানে? আমার এখন অবধি এমন কিছু যোগ্যতা নেই, যার জন্যে তিনি খুশী হয়ে তোমাকে আমার হাতে দিতে পারেন। তবে তুমি তাঁর একমাত্র সন্তান, একমাত্র ভালবাসার জিনিষ। তুমি আমাকে ভালবাসছ, আমাকে চাইছ, এটা জানলে হয়ত তিনি আপত্তি করবেন না। আমার ভয়েরও অন্ত নেই। আশারও অন্ত নেই। প্রথম যেদিন তোমাকে আমি দেখি, সেদিন থেকে কে যেন আমার বুকের মধ্যে ব'লে দিয়েছিল, যে, তুমি আমার হবে।"

মায়া কথা বলিল না। নীরবে দেবকুমারের হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিল। দেবকুমার বলিল, "নাচটাচ আমিও আজ কিছুই দেখলাম না। সারাক্ষণ খালি তোমাকেই দেখেছি। নিজে যদিও তুমি সারাক্ষণ স্টেজের দিকে চেয়ে ছিলে। সুন্দর ত তুমি চিরকালই, কিন্তু এত সুন্দর তোমাকে কোনোদিন দেখিনি। বলছ বটে আজকের ব্যাপারটা হঠাৎ হয়ে গেল, কিন্তু

একটুও ইচ্ছা কি তোমার ছিল না যে আমি একেবারে সম্পূর্ণ ক'রে ধরা দিই? এমন ভুবনমোহিনী সাজে সেজে বেরোলে কেন তবে? বল দেখি আমায়? আমি একেবারেই অবিচলিত থাকব, এই ভেবেছিলে নাকি?"

"আমি বলতে পারব না," বলিয়া মায়া মুখ ফিরাইবার চেষ্টা করিল। দেবকুমারের হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টির দিকে সে চাহিতেই পারিতেছিল না। মুখ অবশ্য ফিরাইতে পারিল না।

দেবকুমার একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে কথা বলতেই চাইছ না? কি হল?"

মায়া বলিল, "যা বলার ছিল সবই বলা হয়ে গেছে, আর কি বলব বলুন!"

দেবকুমার বলিল, "আমাকে আপনি বললে আমি আর কথা বলব না।"

মায়া তাহার একটা হাত দুই হাতে ধরিয়া বলিল, "আচ্ছা, আপনি বলব না আর। দেখ, চিরদিন একভাবে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলাম, এখন একটা ঘণ্টার মধ্যে আমার জীবনের আগাগোড়া বদ্‌লে যেতে বসেছে। তাই দেরি হচ্ছে তোমার কথার উত্তর দিতে। সব কথার উত্তর দিতে পারছিও না। কিন্তু আমি যে নিজেকে সম্পূর্ণ ক'রে তোমাকেই দিতে চাইছি, এটা স্বীকার করাই কি যথেষ্ট হল না? তোমাকে মুখের কথায় আমি আর কি বলব?"

"কি আর বলবে? আর সত্যি কিই বা বলবার আছে? আমি যে কিছুতেই যেতে পারছি না তোমায় ছেড়ে, তাই ব'সে ব'সে বাজে কথা বকছি। কিন্তু রাত ঢের হল, এবার আমায় যেতেই হয়। তুমি বল, কাল সকালেই কি যাব তোমার বাবার কাছে?"

মায়া বলিল, "একটা দিন আর দেরি করবে?"

দেবকুমার বলিল, "তুমি বললে নিশ্চয়ই করব। কিন্তু কেন মায়া? এখন এক-একটা দিন যে এক-একটা যুগ মনে হচ্ছে? তোমার কি দেরি করতে ইচ্ছা করছে?"

মায়া বলিল, "না, না, তা মনে ক'রো না। আমারও কি দেরি ভাল লাগছে? তা ত নয়, তুমি ত জানই যে তা হতে পারে না। আমি যদি দেরি করতে চাইতাম তা হলে কি আর আজ এমন ক'রে ধরা পড়ি? চেষ্টা করলে হয়ত পারতাম নিজেকে শক্ত রাখতে।"

দেবকুমার তাহার মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "এসব চেষ্টা সফল হয় না মায়া। হাজার চেষ্টাতেও হয় না। প্রকৃতি দেবীর কতগুলি বিধান

আছে, তাকে অমান্য করা সহজ নয়। মুনিঋষিরাও পারেন নি তা আমরা ত সাধারণ মানুষ। তুমি ত বালিকা বললেই হয়। এতদিন চুপ ক'রে থাকতে পেরেছিলে, সেইটাই বেশী। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি ত স্টীমারেই তোমার সঙ্গে প্রেমে প'ড়ে বসেছিলাম। নিতান্ত যোগ্য ছিলাম না, তাই কিছু বলতে পারিনি, নইলে এত দেরিই কি আর আমি করতে পারতাম? তুমি যদি আজ দয়া না করতে, তাহলে আজও চুপ ক'রেই থাকতে হত, বুক ফেটে গেলেও।"

মায়া তাহার বুকে মাথা রাখিয়া বলিল, "কি যা তা বকছ? আমার আবার দয়া! আমারই আজ বুক ফেটে কথাটা বেরোল, পারলাম না নিজেকে সামলাতে ব'লে। চোখের জলই আমায় ধরিয়ে দিল। তুমি যে আমায় ভালবাস কি না, তাও আমি ভাল করে জানতাম না, তবু ত পারলাম না লুকিয়ে রাখতে। কি দশা হত আমার বল ত, যদি তুমি আমার ভালবাসা ফিরিয়ে দিতে, গ্রহণ না করতে?"

দেবকুমার বলিল, "তুমি মনে মনে একেবারেই জানতে না? আমি বিশ্বাস করি না। তাহলে আমাকে আর একটু দূরে রাখতে, তোমার বাবাও আমাকে এত সুযোগ দিতেন না কাছে আসবার। এতেই ত আমার সাহস বাড়ল, কিন্তু আসল কথাটাই যে তলিয়ে গেল? আর একদিন দেরি করতে কেন চাইছ?"

মায়া বলিল, "আমার আর একজনের কাছে অনুমতি নিতে হবে।"

"কার কাছে?"

মায়া বলিল "আমার মায়ের। তিনি বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁকে আমি অবহেলা করতে পারব না।"

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর অনুমতি তুমি কি ক'রে পাবে?"

মায়া অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "এ কথা আমি কাউকে বলি না, তোমাকে বলছি। মায়ের কাছে আমি মনে মনে যা বলি, মনে হয় তিনি জানতে পারেন। তারপরই তাঁকে স্বপ্নে দেখি। কিছু তিনি বলেন না, কিন্তু তাঁর মুখের ভাব দেখেই আমি বুঝতে পারি তিনি খুশী হয়েছেন কি না।"

দেবকুমার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "এর উপর কতটা নির্ভর করা যায় মায়া? মনের শান্তি হয়ত এতে তুমি পেয়েছ আগে আগে, কিন্তু এবারের প্রশ্নটা যে জীবনমরণ সমস্যা? এর মীমাংসা কি স্বপ্ন

দিয়ে করা চলে? হয়ত তাঁর অনুমতি পাবে না মায়া। তিনি যা ঠিক ভাবতেন আর তুমি আজ যা করতে চাইছ, দুটো একেবারে বিপরীতধর্মী জিনিষ। তখন তুমি কি করবে? আমাকে ছেড়ে দেবে?"

মায়া আর সামলাইতে পারিল না। দেবকুমারের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "তোমাকে ছেড়ে আমি কি বাঁচব নাকি?"

তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখে চুম্বন করিয়া দেবকুমার বলিল. "বাঁচা শক্ত বটে, দুজনের পক্ষেই। কিন্তু কেঁদো না মায়া। ছাড়তে আমাকে হবে না। আমি কি এমনই অপদার্থ যে যা একান্তই আমার তাও নিয়ে যেতে পারব না? তোমার বাবা অমত করলে হয়ত দু-চার মাস দেরি হতে পারে, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু যতদূর বুঝি, আমাকে তিনি ফেরাবেন না। তোমাকে এতখানি দুঃখ তিনি দিতে পারবেন না। আমাকে একেবারে অযোগ্য ভাবলে এভাবে তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেও দিতেন না। আমি কালই আসব আবার। এখন যাই?"

মায়া তাহার দিকে অশ্রু-আকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, "ভয়ানক ভয় করছে তোমাকে ছেড়ে দিতে।"

দেবকুমার তাহার চোখের জল নিজে মুছাইয়া দিয়া দুই হাতে তাহার মুখটা তুলিয়া ধরিল। কপালে চুম্বন করিয়া বলিল, "কেন ভয় পাচ্ছ? আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না, হতে দেওয়া হবে না। আমার উপর একটু বিশ্বাস রাখ। তুমি আমারই হবে। যদি পথে কিছু বিঘ্ন আসে, নিজেদের জোরে সেটাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। সেইটুকু মনের জোর রাখ, আমাকেও রাখতে দাও। ভয় পেয়ো না কিছুতেই। আবার কয়েক ঘণ্টা পরেই আমাদের দেখা হবে।"

মায়া দেবকুমারের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিল, তাহাকে বিদায় দিবার জন্ম। গাড়ী চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিল নিজের শয়নকক্ষে।

উপরের ঘরে আসিয়া দেখিল তাহার আয়া কোথা হইতে একটা ছেঁড়া মাদুর জোগাড় করিয়া আনিয়া কার্পেটের উপর বিছাইয়া দিব্য ঘুমাইতেছে। তাহাকে উঠাইয়া দিয়া বলিল, "আমাকে একটু ওভ্যাল্‌টিন্ ক'রে দে। আমি আর কিছু খাব না।"

বুড়ী বক্ বক্ করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল।

মায়া গহনা-কাপড় খুলিয়া রাখিতে লাগিল। তখনও তাহার শরীর-মন

প্রকৃতিস্থ হয় নাই। দেবকুমারের আদর যেন তখনও তাহার দেহে শিহরণ জাগাইতেছে। মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িতে চায়। একদিনে চিরজীবন একেবারে অন্য রূপ ধরিল যে? যে মায়া কাল ছিল, সে কোথায় গেল? আজ একই দেহে কে এই সম্পূর্ণ অপরিচিতা প্রেম-পাগলিনী আসিয়া জুটিল?

তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িবার জন্য সে মুখ-হাত ধুইয়া চুল বাঁধিতে আরম্ভ করিল।

আয়া ওভ্যাল্টিন্ করিয়া আনিল। মায়া বলিল, "একটু জল দে। আর কিছু দরকার নেই। যাবার সময় সিঁড়ির আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাস্।"

আয়া আলো নিভাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। খোলা জানলার পথে জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরখানিকে রহস্যময় করিয়া তুলিল। মায়া খাটের উপর বসিয়া এক মনে মৃতা জননীর চিন্তা করিতে লাগিল। নিজের হৃদয়ের ব্যাকুল আগ্রহ দিয়া সে যেন লোকান্তরিতাকে সব বুঝাইতে চাহিল। সাবিত্রীর জীবনে ধর্ম বা লোকাচার যে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার কন্যার জীবনে প্রেম সে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, ইহা কি সে বুঝিবে না?

খানিক পরে মাথা তুলিয়া মায়া সাবিত্রীর ছবির দিকে চাহিয়া দেখিল। ছবিখানা যেন দুলিয়া উঠিল। তাহার পর কি যে সে দেখিল, সেইই শুধু জানে।

পতনের শব্দে আয়া ছুটিয়া উপরে আসিল। মায়া অজ্ঞান হইয়া মেঝের উপরে পড়িয়া আছে। নিরঞ্জনও এই সময়ে আসিয়া পৌছিলেন।

৩৬

কোকাইনের বাড়ীর সে শান্তি টুটিয়া গিয়াছে। গৃহকর্তা হইতে ঝি চাকর পর্যন্ত সবাই শঙ্কিত, শশব্যস্ত। মায়ার এখনও ভাল করিয়া জ্ঞান হয় নাই। দুই-তিনবার চোখ খুলিয়া তাকাইয়াছে মাত্র। শহরে যত ডাক্তার ছিল, নিরঞ্জন সকলকে জোগাড় করিয়া আনিয়াছেন, কেহই বিশেষ কিছু করিতে পারিতেছে না। ব্যাপার কি তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে কি না সন্দেহ।

নিরঞ্জন আসিয়াই মায়াকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখেন। তখনই ডাক্তার আনিতে পাঠান, কিন্তু ডাক্তার আসিয়াও বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই।

তবে এখনই কোনো বিপদের সম্ভাবনা নাই বলিয়া নিরঞ্জনকে নিশ্চিন্ত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ঝি-চাকর কেহই ভাল করিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। ছোক্‌রা বলিয়াছে, দিদিমণিকে সে ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে ফিরিতে দেখিয়াছে, কিন্তু তখন তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও অসুস্থ দেখায় নাই। ব্যারিস্টার সাহেব যখন চলিয়া যান, তখনও সে দিদিমণিকে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া হাসিতে দেখিয়াছে। বুড়ী আয়া বলিল, সে দিদিমণিকে ওভ্যাল্‌টিন্ করিয়া দিয়া নীচে চলিয়া আসিয়াছিল, পরে কি হইয়াছিল, তাহা সে কিছুই জানে না। আর কেহ কিছু বলিতে পারিল না। সকাল হইবার আগে আর কিছু করা অসম্ভব। মায়ার শয়নকক্ষে বসিয়াই নিরঞ্জন সারারাত কাটাইয়া দিলেন।

ভোর হইতেই তিনি দেবকুমারের কাছে চিঠি লিখিয়া গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। বিশেষ প্রয়োজন, সে যেন একবার নিশ্চয় আসে। মায়াকে সজ্ঞান অবস্থায় সে-ই কাল রাত্রে দেখিয়া গিয়াছে, তাহার নিকট হইতে কোন খোঁজ মিলিলেও মিলিতে পারে।

সকালের দিকে আবার ডাক্তার আসিলেন। মায়া একবার চোখ খুলিয়া চারিদিকে তাকাইল। কিন্তু তাহার দৃষ্টি শিশুর দৃষ্টির মত অর্থশূন্য। কোনো কথা সে বলিল না, কাহাকেও চিনিতে পারিতেছে বলিয়াও বোধ হইল না। নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছ মায়া?"

মায়া কোনো উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ পরে আবার চোখ বুজিল। ডাক্তার বলিলেন, "থাক, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। এখনও 'শকে'র 'এফেক্ট্' কাটেনি। আস্তে আস্তে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসবেন। ওঁকে যেন কোন রকমে 'ডিস্‌টার্ব্' না করা হয়। একজন নার্স্ আনতে পাঠান, সেই চার্জ্ নিয়ে থাকবে। চাকর-বাকর ক্রমাগত ঢুকে যেন গোলমাল না করে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আচ্ছা, আপনিই গিয়ে একজন নার্স পাঠিয়ে দেবেন। আমার চাপরাশীকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি। আপনি আর কাকেও ডাকা কি দরকার মনে করেন? কলকাতায় টেলিগ্রাম করতে হলেও আজই ভাল।"

ডাক্তার বলিলেন, "আহা, আপনি অত ভয় পাচ্ছেন কেন? তেমন সিরিয়াস্ মনে করলে আমিই কি আর টেলিগ্রাম করতে বলতাম না? আপনি যখন অত ব্যস্ত হচ্ছেন, তখন বিকেলে আমি সিভিল সার্জনকে নিয়ে আসব

এখন। আমার মনে হয়, দু-এক দিনের মধ্যেই আপনার মেয়ে নিজের থেকেই ভাল হয়ে উঠবেন।"

নিরঞ্জন ডাক্তারের সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিলেন। তখনও তাঁহার চা খাওয়া হয় নাই। ছোক্‌রা আসিয়া জানাইল, চা দেওয়া হইয়াছে। নিরঞ্জন চিন্তিত মুখে আবার ঘরে ঢুকিয়া চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। খাওয়ায় রুচি তাঁহার ছিল না। এক পেয়ালা চা শুধু টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগিলেন।

মায়া তাঁহার একমাত্র সন্তান। জীবনের সকল ব্যর্থ স্নেহ, ভালবাসা সবই এই একমাত্র কন্যাকে আশ্রয় করিয়া এতদিনে সার্থক হইয়াছিল। মায়াই ছিল তাঁহার বিশ্বজগৎ। তাহাকে বাদ দিয়া কোনো কিছু আজকাল তিনি ভাবিতেই পারিতেন না। তাহার হঠাৎ এরকম অসুখ হইয়া পড়ায় নিরঞ্জনের বুকের ভিতরটা দমিয়া গেল। কেন যে এই প্রকার হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না। ডাক্তারদেরও কিছুই বলিতে পারেন নাই। দেবকুমার আসিলে খানিকটা কিছু বোঝা যাইবে মনে করিয়া তিনি তাহার আসার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ শোনা গেল। নিরঞ্জন ছোকরাকে বলিলেন, "তুমি ব্যারিস্টার সাহেবকে এখানেই নিয়ে এস, আর একটা চায়ের পেয়ালা দাও।"

ছোক্‌রা চায়ের পেয়ালা সাজাইয়া চলিয়া গেল, এবং মিনিট খানিক পরেই দেবকুমারকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। দেবকুমারের চেহারা ভাল দেখাইতেছিল না, কোনো কারণে সেও বেশ খানিকটা মুষড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা বোঝাই যাইতেছিল।

ছোক্‌রাকে বিদায় করিয়া দিয়া নিরঞ্জন বলিলেন, "বোস। চা খেয়ে এসোনি বোধ হয়?"

দেবকুমার বলিল, "না, আপনার চিঠি পেয়েই তাড়াতাড়ি চ'লে এলাম, চা খাইনি।"

সেও এক পেয়ালা চা টানিয়া লইয়া বসিল বটে, কিন্তু খাইবার চেষ্টাও করিল না। খবরের কাগজখানা উঠাইয়া লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল।

নিরঞ্জন বলিলেন, "তোমায় কেন ডেকেছি বুঝতে পারনি বোধ হয়।

তাড়াতাড়িতে সব কথা লিখিনি। কাল রাত্রে 'ব্যালে' থেকে ফিরবার পরই মায়া হঠাৎ 'ফেন্ট' করেছে। এখন পর্যন্ত ভাল ক'রে জ্ঞান হয়নি। ডাক্তার বলছেন, খুব একটা 'শক্' পেয়ে সম্ভবতঃ এরকম হয়েছে। তুমি যদি কিছু বলতে পার, এইজন্তেই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। ঝি-চাকরেরা কিছুই জানে না।"

দেবকুমারের মুখ আশঙ্কায় বেদনায় যেন কাল হইয়া উঠিল। মিনিট খানিক ভাবিয়া লইয়া বলিল, "কালকে 'এক্সাইটেড্' হবার মত কারণ তাঁর ঘটেছিল বটে, তবে কিছু 'শক্' পেয়েছেন ব'লে ত মনে হয়নি। আমার সঙ্গে যখন ফেরেন, তখন ত বেশ ভালই ছিলেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন " 'এক্সাইটেড্' কেন হয়েছিল কিছু বলতে পার ?"

দেবকুমার বলিল, "আমি তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলাম।" আর কিছু বলিল না। তাহার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল।

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়া কি উত্তর দিয়েছিল ?"

দেবকুমার আগেরই মত সংক্ষেপ বলিল, "তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। বাড়ী পৌছানোর সময় তাঁকে একটুও অসুস্থ মনে হয়নি।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কেন এরকম হল, কিছু আন্দাজ করতে পারছ না ?"

দেবকুমার বলিল, "কিছু না। উত্তেজনার আতিশয্যে এতটা হতে পারে না। বিশেষ ক'রে তাঁর যখন কোন অসম্মতি ছিল না। আমি চ'লে যাবার পরে কিছু এমন ঘটেছে সম্ভবতঃ যা তাঁকে খুব 'শক্' দিয়েছে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কি যে ঘটতে পারে তা ত জানি না। চাকর-বাকররা তাহলে কিছু ত অন্ততঃ লক্ষ্য করত ? আর কতটুকু বা সময় ? তুমি যাবার পর আধঘণ্টার মধ্যেই আমি এসেছি।"

খানিকক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর দেবকুমার বলিল, "আমি আজই আপনার কাছে যাব ঠিক করেছিলাম, আপনার অনুমতি নিতে। শুধু মায়া বারণ করাতে একদিন দেরিতে যাব স্থির ছিল।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আমার কিছু অসম্মতি নেই বাবা। সবদিক্ দিয়েই তুমি মায়ার যোগ্য পাত্র। সেও তোমার প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়েছে ব'লেই আমার মনে হয়েছিল। নিজের স্বামী সে নিজে ভালবেসে গ্রহণ করে, এই ইচ্ছাই আমার ছিল, কারণ নিজের জীবনে দেখলাম যে অন্যের দ্বারা মনোনীত পাত্র বা পাত্রী অন্য সকল দিক্ দিয়ে যোগ্য হয়েও এক জায়গায় ঠেকে যেতে পারে এবং দাম্পত্য [illegible] একেবারে ধ্বংস ক'রে দিতে পারে। নিজেরা

পরস্পরকে ভাল ক'রে চিনে জেনে নিলে, এ দুঃখটা অন্ততঃ ভোগ করতে হয় না। তবে মায়াকে এতকাল অবাধে মেলামেশা করতে দিইনি আমি সকলের সঙ্গে, পাছে এর থেকে মায়ার কোনো মনোবেদনার কারণ ঘটে। তুমি যে সেরকম কিছু ঘটাবে না, এ বিশ্বাস থাকাতেই, তোমাকে কিছু বাধা দিইনি। আজকার দিনটা সবদিক্ দিয়ে আনন্দের দিন হত, যদি মায়ার এই অসুখটা না হত।"

দেবকুমার অবনত হইয়া নিরঞ্জনকে প্রণাম করিল। নিরঞ্জন তাহার মাথায় হাত দিয়া নীরবে আশীর্বাদ করিলেন।

এমন সময় ট্যাক্সি চড়িয়া চাপরাশী নার্স্ লইয়া ফিরিয়া আসিল। দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁকে কে দেখছেন?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আমাদের পঞ্চানন ডাক্তার। তিনি বিকেলে সিভিল সার্জনকে নিয়ে আসবেন বলেছেন। দেখি তাঁরা কি বলেন। দরকার হলে কলকাতায় টেলিগ্রাম করতে হবে।"

দেবকুমার একটু ইতঃস্তত করিয়া বলিল, "আমি ওঁকে একবার দেখে যেতে পারি?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "চল, ডাক্তার যদিও ওর ঘরে লোকজন যেতে বারণ করেছেন, তবু তুমি গেলে ক্ষতি কিছু নেই, বরং লাভ হতে পারে।"

নিরঞ্জন দেবকুমারকে লইয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। মায়ার ঘরের দরজার কাছে বুড়ী আয়া বসিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছিল, সে দেবকুমারকে দেখিয়া একবার কট্‌মট্ করিয়া তাকাইল, তাহার পর সরিয়া বসিল। বুড়ীর ধারণা হইয়াছে যে দেবকুমারের কোন ত্রুটিতেই মায়ার এই দশা হইয়াছে।

দেবকুমারের তখন সে সব কিছু লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা ছিল না। সে নিরঞ্জনের পিছন পিছন ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল।

মায়া তখনও ঘুমাইতেছে মনে হইল। তবে মুখের রং আর আগের মত অস্বাভাবিক পাণ্ডুবর্ণ নাই। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও নিয়মিত হইয়া আসিয়াছে। নবাগতা নার্স্‌টি চুপচাপ এক কোণে বসিয়া আছে, তাহার বিশেষ কিছু করিবার নাই।

দেবকুমার চুপ করিয়া কিছুক্ষণ মায়ার বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "বিকেলে আর একবার আসব, সিভিল সার্জন ক'টার সময় আসবেন?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "সাড়ে চারটা কি পাঁচটায়। তুমি তোমার বাবাকে ব'লো আজ সব কাজ দেখতে। আমি একেবারেই যেতে পারব কি না জানি না। আজ আমার বোনকে আসতে টেলিগ্রাম করেছি। শুধু ভাড়া করা নার্সের হাতে মায়াকে রাখতে চাই না। ইন্দু না আসা পর্যন্ত আমার কাজকর্মের খুবই অসুবিধা হবে।"

দেবকুমার চলিয়া গেল। নিরঞ্জন নিজের কাগজপত্র লইয়াই উপরে আসিয়া বসিলেন। দুপুর বেলাটা প্রায় একইভাবে কাটিয়া গেল। মায়া তাকাইল না, বা কথা বলিল না, কিন্তু অবস্থার কোনো অবনতিও লক্ষিত হইল না।

বিকালে সিভিল সার্জনকে সঙ্গে করিয়া পঞ্চানন ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবকুমার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিল। ডাক্তার মায়াকে পরীক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া সে আর ঘরের ভিতর ঢুকিল না, বাহিরেই ঘুরিতে লাগিল।

সম্প্রতি কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই, এর বেশী সিভিল সার্জনও কিছু বলিতে পারিলেন না। যেমন হঠাৎ অসুখ হইয়াছে তেমনি হঠাৎ সারিয়াও যাইতে পারে। আবার অনেক দেরি হইতেও পারে। নিরঞ্জন তাঁহাকে আবার পরের দিন আসিতে বলিয়া দিলেন।

ডাক্তাররা চলিয়া গেলে দেবকুমার নিরঞ্জনের কাছে আসিয়া বলিল, "আমাকে দিয়ে কিছু কাজ হয় ত বলুন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কাজ করবার লোকের ত অভাব নেই, আগলাবার লোকেরই অভাব। ইন্দু না আসা পর্যন্ত দেখছি, আমার ঘর থেকে বার হওয়াই দায় হবে। তুমি যদি কয়েক ঘণ্টা ক'রে সকালে কি বিকালে এখানে থাক, তাহলে সেই সময় আমি অফিসের কাজগুলো সেরে আসতে পারি। ইন্দু কলকাতাতে আছে। ইংলিশ মেলে রওনা হলে তিন দিনের মধ্যেই এসে পড়বে।"

দেবকুমার বলিল, "যখন থাকতে বলবেন তখনই থাকব। এখন কি শহরে যাবার আপনার দরকার আছে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "এখন গিয়ে বিশেষ কিছু লাভ নেই, কাল সকালেই যাব। তুমি ভোরেই চ'লে এস, আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেব, এখানে এসেই চা টা খেও।"

দেবকুমার বলিল, "বাবা আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে আসবেন, বলছিলেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "বেশ ত। সন্ধ্যার সময় আসতে পারেন।"

দেবকুমার চলিয়া গেল। নিরঞ্জন একবার উপরে গিয়া মায়াকে দেখিয়া আসিলেন, তাহার পর বসিয়া কাগজপত্র দেখিতে লাগিলেন।

শিবচরণ বাবু অফিসের কাজকর্ম কোনমতে সারিয়া সন্ধ্যার পর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিরঞ্জন তখন নীচেই ছিলেন। শিবচরণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমার মা লক্ষ্মী কেমন আছেন?"

নিরঞ্জন বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "সেই একই রকম।"

শিবচরণবাবু বলিলেন, "এমন একটা আনন্দের সময় এমন দুর্দৈব। আমার কপালই এই রকম। যখনই ভাল কিছু হয়েছে, তার সঙ্গে তখনই মন্দ কিছু একটা ঘটেছে। ছেলে হয় না, ছেলে হয় না ক'রে সে কি কম আফশোস ছিল? তা ছেলে যদি বা হল, ত তার মা গেলেন মারা। দেবকুমারের বিয়ে এর চেয়ে ভাল কিছু কল্পনাও করা যায় না। তা এই সময় কিনা এমন বিপদ্! ডাক্তারেরা কিছু বলতে পারছে না?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "না, ভাল ক'রে জ্ঞান না হলে কিই বা বলবে? কি যে ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

শিবচরণ বলিলেন, "দেবকুমারকে অনেক রকম ক'রে জিজ্ঞেস করলাম, সেও কিছু বলতে পারল না। যাক, ভগবানের কৃপায় এখন মা লক্ষ্মী আমার শীগ্গির ভাল হয়ে গেলে বাঁচি। তাঁকে আজ আমার আশীর্বাদ ক'রে যাবার কথা, কিন্তু শুভকার্য্য এরকম নিরানন্দের মধ্যে করা ঠিক নয়। আজ শুধু তাঁকে দেখে যাই।"

নিরঞ্জন তাঁহাকে উপরে লইয়া গেলেন। নার্স্ নিরঞ্জনকে দেখিয়া বলিল, "একটু আগে একবার চোখ খুলে চারদিকে তাকাচ্ছিলেন। এখনও জেগেই আছেন।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওকে খাওয়ানো হয়েছে?"

নার্স্ বলিল, "হ্যাঁ, দুধ খাইয়েছি।"

শিবচরণবাবু বলিলেন, "চেহারা ত কিছু খারাপ হয়নি, মা লক্ষ্মী শীগ্গির ভাল হয়ে উঠবেন। যেদিন উঠে বসবেন, সেই দিনই আশীর্বাদ ক'রে যাব।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা ত করবেনই। আপনার আগ্রহে তাড়াতাড়ি যদি ভাল হয়ে ওঠে।"

তাঁহারা বাহির হইয়া গেলেন। মিনিট পাঁচেক পরে মায়া আর একবার চোখ খুলিয়া তাকাইল। নাস্ ́ তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি কিছু চাই?"

মায়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা, মাগো, তুমি কোথায় গেলে? ও পিসীমা, চার ধারে এরা কারা ঘুরছে?"

নাস্ ́ তাড়াতাড়ি আয়াকে নিরঞ্জনকে ডাকিতে পাঠাইল। নিরঞ্জন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিয়া মায়ার কাছে দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়া, কি হয়েছে মা? কাকে ডাকছ তুমি?"

মায়া কিছুক্ষণ অর্থশূন্যভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর সকলে কোথায় গেল? এটা কি হাসপাতাল?"

নিরঞ্জন একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নাস্ ́কে বলিলেন, "তুমি ওকে নিয়ে বোস। আমি আবার ডাক্তারকে আনতে পাঠাচ্ছি। অসুখটা খুব অপ্রত্যাশিত 'টার্ণ্' নিচ্ছে।"

নাস্ ́ ঘাড় নাড়িল। নিরঞ্জন বাহির হইয়া গেলেন।

৩৭

মঙ্গলবার দুপুরে রেঙ্গুনে ইংলিশ মেল ষ্টীমার আসিয়া পৌঁছায়। অন্য ষ্টীমারগুলি চারিদিনের দিন পৌঁছায়, এটি সে জায়গায় তিন দিনে আসে, এইজন্য যাহাদের তাড়াতাড়ি থাকে, তাহারা ইংলিশ মেল ষ্টীমার ধরিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এই কারণে এই জাহাজটিতে অসাধারণ ভীড় হয়।

আজ মঙ্গলবার, বেলা প্রায় তিনটা। জাহাজঘাট লোকে লোকারণ্য। জাহাজ চোখে দেখা যাইতেছে বটে, তবে এখনও ঘাটে ভিড়ে নাই।

বাহিরে একখানি মোটরে নিরঞ্জন বসিয়া ছিলেন। তাঁহার মুখ শুষ্ক ও বিষণ্ণ, নিতান্ত অন্যমনস্কভাবেই একখানা খবরের কাগজ উল্টাইতে-ছিলেন তিনি।

খানিকপরে মুখ তুলিয়া ড্রাইভারকে বলিলেন, "আর একবার গিয়ে দেখে

এস, জাহাজ ভিড়তে কত দেরি। আমার একঘণ্টার মধ্যে একবার অফিসে না গেলে চলবেই না।"

ড্রাইভার আবার জেটির ভিতরের দিকে চলিল। কিন্তু সে ফিরিয়া আসার আগেই জাহাজের সিঁড়ি নামানোর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, কুলি এবং জনতার চিৎকার নিরঞ্জনকে জানাইয়া দিল যে জাহাজ ভিড়িয়া গিয়াছে। তিনি মোটরের দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িলেন। সঙ্গে একটি মাদ্রাজী ভৃত্য আসিয়াছিল, তাহার জিম্মায় গাড়ী রাখিয়া ভিতরের দিকে অগ্রসর হইলেন মাঝপথে ড্রাইভারকেও ফিরিয়া যাইতে দেখিলেন।

আজ ইন্দুর আসিবার কথা, সঙ্গে কলিকাতা হইতে একজন বিখ্যাত চিকিৎসকও আসিতেছেন। ইনি সকল প্রকার স্নায়বিক রোগের বিশেষজ্ঞ। রেঙ্গুনের চিকিৎসকগণ যখন মায়ার অসুস্থতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিতে পারিলেন না, তখন নিরঞ্জন বহু অর্থ ব্যয়ে এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকটিকে আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। কাজ ফেলিয়া কলিকাতায় গিয়া বসিয়া থাকিলে নিরঞ্জনের বড় ক্ষতি হয়। এজন্য কলিকাতা যাইবার চেষ্টা আর করেন নাই।

যাত্রীরা যেখানে নামে, বাইরের লোককে সেখানে যাইতে দেওয়া হয় না। কাঠগড়ার বাহিরে তাহারা দাঁড়াইয়া থাকে। যাত্রীরা নামিবার ছাড়পত্র সমর্পণ করিয়া তাহার পর কাঠগড়া পার হইয়া আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করিতে পারে। নিরঞ্জন রেলিংএর কাছে আসিয়াই জাহাজের ডেকের উপর ইন্দুকে দেখিতে পাইলেন। সে ব্যগ্র হইয়া জনতার দিকে চাহিয়া ছিল, তাহাকে কেহ লইতে আসিয়াছে কি না দেখিবার জন্যই বোধহয়। তাহার পাশেই একজন খদ্দর-পরিহিত যুবক দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে দেখিয়া নিরঞ্জন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। আর কাহারও ত আসিবার কথা ছিল না? জাহাজে ইন্দু ইহার সহিত আলাপ করিয়াছে, তাহাও সম্ভব নয়। হিন্দুঘরের মেয়ে সে, হাজার বয়স হইলেও কখনও নিজে অগ্রসর হইয়া অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিবে না। পরিচিত কেহ হইলে নিরঞ্জন তাহাকে চিনিতেই পারিতেন। ডেকযাত্রীর ঠেলাঠেলি একটু কমিলে ইন্দু ও সেই যুবকটি নামিয়া আসিল। চিকিৎসক ডাক্তার মিত্রের সহিত নিরঞ্জন সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন না, কাজেই তিনি আসিয়াছেন কি না এবং নামিয়াছেন কি না তাহা নিরঞ্জন বুঝিতে পারিলেন না।

কাছাকাছি আসিয়া পড়িতেই ইন্দু রেলিংএর ওপার হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "মেজদা, মায়া এখন কেমন আছে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "প্রায় একই রকম। তবে এখন নাওয়া খাওয়া করছে। আসল রোগ যা তা ত সারবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ডাঃ মিত্র এসেছেন?"

ইন্দু ও তাহার সঙ্গী যুবকটি জাহাজঘাটের কর্মচারীর হাতে তাহাদের ছাড়পত্র সমর্পণ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। কুলীরা তাহাদের জিনিষপত্র আনিয়া গাদা করিয়া এক জায়গায় রাখিতে লাগিল। ইন্দু এতক্ষণের পরে নিরঞ্জনের প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "না, ডাক্তার মিত্র এর পরের ষ্টীমারে আসছেন, শুক্রবারে এসে পৌছবেন। আমার সঙ্গেই আসছিলেন, তা কলকাতায় খুব জরুরী ডাক এল একটা, তাই আসতে পারলেন না। ভাগ্যে প্রভাস আসছিল, তাই তার সঙ্গে আসতে পারলাম, নইলে আমাকেও আটকে থাকতে হত।"

যুবক অগ্রসর হইয়া আসিয়া নিরঞ্জনকে প্রণাম করিল। নিরঞ্জন এতক্ষণে তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "ও, তুমি প্রভাস? এত বছর আগে তোমায় দেখেছি যে মোটেই চিনতে পারিনি। তা বেশ, তোমায় দেখে খুব খুশী হলাম। মায়া সেরে উঠলে তোমাদের কাজের কথাও হতে পারবে।"

প্রভাস বলিল, "মায়ার অসুখের কোনো কথাই আমি শুনিনি। যখন শুনলাম তখন টিকিট কেটে ফেলেছি, আর দেখলাম, পিসীমাও আসবার লোক পাচ্ছেন না, তাই চ'লেই এলাম। এখন দেখছি পরে এলেও চলত।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "এসেছ, ভালই হয়েছে। লোকের অভাবে ইন্দুর আসতে দেরি হলে আমাকে বড় মুশকিলে পড়তে হত। নার্সের ভরসায় মায়াকে ফেলে আমি বাড়ী থেকে বেরোতেই পারি না। আশা করছি মায়া শীগ্‌গির সেরে উঠবে। চাকর বাকর সবই আছে, কিন্তু কোন্ অবস্থায় কি কি করতে হবে, কিছুই তারা বোঝে না, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থাকে।"

ইন্দু বলিল, "তা ত হবেই। বাঙালী ঝি-চাকর হলেও বা কথা ছিল এরা ত কথাই বোঝে না অর্ধেক। তা চল, গাড়ীতে গিয়ে বসা যাক। এ ভীড়ে অসোয়াস্তি লাগে। প্রভাস যাবে ত আমাদের সঙ্গে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "নিশ্চয়ই। আমার বাড়ী ছাড়া ও আবার কোথা যাবে? ও ত ঘরেরই ছেলে।"

মাদ্রাজী ভৃত্য একটা ট্যাক্সি জোগাড় করিয়া আনিল। তাহাতে জিনিষপত্র সব চাকরের সহিত চালান করিয়া দেওয়া হইল। নিরঞ্জন, ইন্দু ও প্রভাস বাড়ীর গাড়ী করিয়া রওনা হইলেন।

ইন্দু গাড়ী ছাড়িতেই আবার জিজ্ঞাসা করিল, "মায়ার কি অসুখ তা ত ভাল ক'রে লেখনি কিছু চিঠিতেও? টেলিগ্রাম থেকে ত কিছুই বোঝা যায় না। খুব কি ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "না, সেরকম কিছু নয়। মূর্চ্ছা একবারই হয়েছিল, তবে সেটা ভাঙতে কয়েক ঘণ্টা দেরি হয়েছিল। কিন্তু মূর্চ্ছা ভাঙার পর থেকে কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে আছে, কাউকে চিনতে পারছে না, কোনো কথা মনে আনতে পারছে না।"

ইন্দু ভীতস্বরে বলিল, "ও মা, সে কি কথা? তোমারা ত ওসব মান না, কিন্তু গাঁয়ের লোকে শুনলে বলবে ভূতে পেয়েছে। খাচ্ছে, দাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে ত ঠিক মতন?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "খাওয়া-দাওয়া করছে বটে, তবে ঠিক স্বাভাবিক ভাবে নয়। সব কিছু নিয়ে গোলমাল করছে। ঝি-চাকর কারো ছোঁওয়া কিছু খেতে চায় না। কাউকে ঘরে ঢুকতে দিতে চায় না। ঠাকুর একটা আছে, তাই রক্ষে, সেই খাবার টাবার এনে দিচ্ছে। অন্য সব কাজ নিয়েই হয়েছে মুশকিল।"

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে চিনতে পারে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "বাবা ব'লে উল্লেখ ত করে। অন্য লোকে বললেও সেটা মেনেই নেয়। চিনেছে হয়ত। ছোটবেলা আমাকে বিশেষ দেখেনি, তবে বাবা যে একজন আছে তা ত শুনত? হয়ত সেই স্মৃতিটা থেকে গেছে। তবে আমিই যে সেই বাবা, তা বুঝল কি ক'রে জানি না।"

বাড়ী পৌঁছিতে সময় লাগিল। বাগান দেখিয়া ইন্দু বলিল, "বাগানটা খুব বাহারের হয়েছে।"

নিরঞ্জন বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "সব মায়ার নিজের হাতে করা। এরপর অযত্নে নষ্ট হয়ে যাবে যদি মায়া তাড়াতাড়ি না সারে।"

চাকর-বাকর আসিয়া জিনিষপত্র নামাইয়া লইল। নিরঞ্জন ছোক্‌রাকে আদেশ করিলেন প্রভাসের জিনিষপত্র অফিস ঘরের পাশের ঘরে রাখিতে, এবং সেখানে খাট, আলনা, প্রভৃতি আনিয়া দিতে। রান্নাবান্না হইতে এখন

অনেক দেরি হয়, দেখিবার লোক কেহ নাই। চাকর-বাকর ফাঁকি দেয়। প্রভাসকে তখনকার মত ভাল করিয়া চা খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। ইন্দু আজ আর রান্না করিতে রাজী হইল না। বলিল, "সন্ধ্যার পর জলটল খাব এখন। কাল থেকে সব ঠিক মত হবে। গিন্নী একজন না থাকলে কি সংসার চলে?"

নিরঞ্জন বলিলেন "আচ্ছা, প্রভাস এখন একটু বিশ্রাম কর। ইন্দু, চল্, উপরে একবার মায়াকে দেখে আসবি। আমাকে আবার একটু পরে একবার অফিস ঘুরে আসতে হবে।"

ইন্দু বলিল, "ও মা সত্যি, যার জন্তে এলাম, তার সঙ্গে খোঁজ নেই, নীচে দাঁড়িয়ে বাজে বকছি। চল, চল।"

প্রভাস তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে চলিয়া গেল, নিরঞ্জন ইন্দুকে লইয়া মায়ার কাছে চলিলেন।

মায়ার শয়নকক্ষের দরজায় বুড়ী আয়া বসিয়া ছিল। সে কাছে গেলে মায়া এখন চটিয়া ওঠে, কাজেই ঘরের ভিতর সে বড় একটা যায় না। কিন্তু একজন স্ত্রীলোক রোগিনীর কাছাকাছি থাকা দরকার, সুতরাং বেশীর ভাগ সময় সে ঘরের বাহিরে বসিয়া থাকে।

ঘরের সাজসজ্জা প্রায় আগের মতই আছে। তফাতের মধ্যে এককোণে মেঝের উপর একটা সাদাসিধা বিছানা পাতা, তাহার উপরে মায়া শুইয়া আছে।

ইন্দু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ও মা, মাটির উপর শুয়ে কেন? অসুখ শরীরে আবার ঠাণ্ডা টাণ্ডা লেগে একখানা কাণ্ড করুক। খাটে শোওয়াওনি কেন?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কিছুতেই ওকে শোওয়ানো যায় না। কি যে সব বলতে আরম্ভ করে, অর্দ্ধেক কথা বোঝাই যায় না। ওর কোনো কারণে ধারণা হয়েছে, এটা হাসপাতাল, তাই সব-তাতে তার ভয় আর আপত্তি। তুই ব'লে দেখ্ না একবার, যদি কথা শোনে।"

ইন্দু ডাকিল, "মায়া, মায়া।"

মায়া ঘুমায় নাই, এমনিই চোখ বুজিয়া পড়িয়া ছিল। ইন্দুর ডাকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া বলিল, "কে গা? কেন ডাকছ?"

ইন্দু বলিল, "ও মা, আমায় চিনতে পারছিস্ না? পিসীমাকে এর মধ্যে ভুলে গেলি?"

মায়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। ইন্দুকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, "তাই ত, পিসীমাই ত? কি ক'রে এখানে এলে?"

ইন্দু বলিল, "তোর অসুখ শুনে দেশ থেকে এলাম দেখতে। এখন কেমন আছিস্?"

মায়া বলিল, "আছি ত ভালই একরকম। কিন্তু এখানে সব-তাতে বড় অসুবিধে, সব ছোঁওয়া-লেপা ক'রে একাকার ক'রে রাখে, বড় ঘেন্না করে। এত জায়গা থাকতে হাসপাতালে কেন যে আমাকে নিয়ে এল, এখানে কি হিন্দুর মেয়ে টিঁকতে পারে?"

ইন্দু অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এ যেন সেই সাত-আট বৎসরের পূর্ব্বেকার মায়া, যাহাকে লইয়া সে প্রথমে রেঙ্গুনে আসিয়াছিল। সব তাতেই তাহার ভয়, সব তাতেই তাহার বিতৃষ্ণা। জীবনের মাঝখান হইতে আটটা বৎসর তাহার কেমন করিয়া মুছিয়া গিয়াছে। শিক্ষিতা বাক্‌পটু মায়া আর নাই, তাহার স্থলে পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা, কুসংস্কারাপন্ন বালিকা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিরঞ্জন বলিলেন, "সারাক্ষণই এই রকম কথা বলে। কি যে ব্যাপার ভাল ক'রে বুঝতেই পারছি না। এখানকার ডাক্তারেরা কেউ কিছু বলতে পারছে না। ডাক্তার মিত্র এলে যদি কিছু বলতে পারেন।"

নিরঞ্জন যদিও কথাগুলি ইন্দুকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছিলেন, তথাপি মায়া তাহা শুনিতে পাইল। খানিকটা যেন বিরক্ত হইয়া বলিল, "বাবার এক কথা। নিজে দেশ ছেড়ে ধর্ম্ম ছেড়ে সাহেব হয়েছেন ব'লে, সবাই তাই হবে নাকি? আমাকে সুদ্ধ কোথায় এনে তুললেন দেখ না। যত সব ম্লেচ্ছ কারখানা। এ খাটে কত মানুষ শুয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই। আর রাশ রাশ যত মেমসাহেবী কাপড়চোপড়। এসব অন্যের পরা জিনিষ আমি পরব কেন? এতে কি আচার থাকে? কত কষ্টে আমার বাক্সটা খুঁজে বার করেছি জান না। আমার যা কাপড়, আমি তাই পরছি।"

ইন্দু লক্ষ্য করিয়া দেখিল মায়ার কথাই ঠিক। শুধু যে সে মাটিতে বিছানা করিয়া শুইয়া আছে তাহা নয়, কাপড়চোপড় পরিয়াছে পাড়াগাঁয়ের ধরণে। একখানা লালপেড়ে শাড়ী এবং একটা লেস বসানো পুরাতন সেমিজ ভিন্ন তাহার গায়ে আর কিছুই নাই। সেমিজটা তাহার বহুপূর্ব্বের সম্পত্তি, রেঙ্গুন আসিবার সময় সে গ্রামের দোকান হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল।

নিরঞ্জন বলিলেন, "কোন্ কালের এক পুরনো বাক্স ওর ড্রেসিংরুমের কোণে প'ড়ে ছিল, সেটাকে টেনে এনেছে। তার ভিতর যত ছেঁড়া কাপড় ছিল সব বার ক'রে পরছে। তুই পারিস ত ওকে একটু বোঝা, আমি অফিসের কাজটা সেরে আসি।"

ইন্দু মায়ার পাশে বিছানায় বসিয়া বলিল, "মায়া, উঠে তোর খাটে শো দেখি। এটা হাসপাতাল কেন হতে যাবে, এ ত মেজদার বাড়ী? তোর জন্যে এত ক'রে ঘরদোর সাজিয়েছে, এত কাপড়-জামা করিয়েছে, তুই কিছু ব্যবহার করবি না?"

মায়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "আমার প্রবৃত্তি হয় না পিসীমা, কেমন যেন গা ঘিন্ ঘিন্ করতে থাকে। বাবা যে কিছু বোঝেন না। তিনি ধর্ম ছেড়েছেন ব'লে সবাই কি তা ছাড়বে? হিন্দুর মেয়ে আমরা, ধর্মই হল আমাদের আসল জিনিষ।"

ইন্দুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। এ যেন পরলোকগত সাবিত্রীই তাহার কন্যার মুখ দিয়া কথা বলিতেছে। নিরঞ্জন তাঁহাদের একমাত্র সন্তানকে বিদেশী সভ্যতার আদর্শে গড়িয়া তুলিতেছিলেন, সাবিত্রী কি লোকান্তরে থাকিয়াই এমনি করিয়া প্রতিশোধ লইতে বসিল?

বহুকাল পূর্বে সে যেমন করিয়া মায়াকে বুঝাইতে বসিয়াছিল, আজ আবার তেমনি করিয়া বুঝাইতে বসিল। বলিল, "তা ত বটে, তাই ব'লে কি বাপ-ভাইয়ের মনে কষ্ট দিতে আছে? হিন্দুর মেয়ের আসল ধর্ম ভালবাসার ধর্ম। যারা ভালবাসার পাত্র তাদের জন্য সব করতে পারা উচিত। একটু চালচলন বদলালে যদি তোর বাপ খুশী হন, তা কেন তুই পারবি না? এটা সত্যি কিছু হাসপাতাল নয়, এ-সব জিনিষপত্তর তোর জন্যেই তৈরি করা, কেউ আগে ব্যবহার করেনি। এ সব নিলে তোর আচারের কোনো ত্রুটি হবে না। আমি ত হিন্দুর ঘরের বিধবা, আমার চেয়ে ত আচার-বিচারের কথা তুই ভাল বুঝিস্ না? আমি বলছি, তোর কোনো অন্যায় হবে না। তুই খাটে উঠে শো দেখি, আমিও তোর সঙ্গে শোব এখন। খাওয়া-দাওয়া ত তোর বামুনেই জোগাড় ক'রে দিচ্ছে, তবে আর মুশকিলটা কি? আর এ ছেঁড়া কাপড়খানা ছেড়ে ফেল্, আলমারী থেকে ভাল কাপড়-জামা বার ক'রে দিই, প'রে বোস্। চুলগুলো বাঁধ, এমন ক'রে শরীর নষ্ট করিস্ নে। বাপের মনে কষ্ট দিয়ে কোনো লাভ আছে কি?"

মায়া খানিকক্ষণ কি যেন চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, "কি জানি পিসীমা,' ঠিক কিছু বুঝতে পারি না। বাবার মনে কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়, কিন্তু মাকেই কি ভুলে যাওয়া উচিত? তিনি কত দুঃখ পেয়ে গেছেন, স্বামী সুদ্ধ তাঁকে ত্যাগ করলেন, তবু ত তিনি ধর্ম্ম ছাড়েন নি?"

ইন্দু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "থাম্, থাম্, আর ভট্টচায্যির মত বক্তৃতা দিতে হবে না। মা ভারি কীর্ত্তিই করেছেন। আজন্ম স্বামীকে জ্বালানো বুঝি খুব ভাল? হিন্দুর মেয়ে ব'লে বড় যে ফড়ফড়ি করিস্, হিন্দুর ছেলেমেয়ে মা-বাপের জন্যে কি না করেছে? রাজ্য ছেড়েছে, বনে গেছে। রামের গল্প পড়েছিস্, পুরুর গল্প পড়েছিস্? একটু খাটে উঠে শোওয়া, আর একখানা ফরশা কাপড় পরতেই তোদের প্রাণ বেরিয়ে যায়।"

মায়া অশ্রুপূর্ণ চোখে ইন্দুর দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, আমি খাটে উঠে শুচ্ছি। কাপড় ছাড়ছি। কিন্তু ওসব সায়া, জ্যাকেট আমি এখনই পরব না। একটা সেমিজ আর শাড়ী দাও। কিন্তু আমার মায়ের নামে অমন ক'রে ব'লো না। তোমরা তাঁকে দেখতে পারতে না, কিন্তু তিনি আমার মা ত?"

ইন্দু আল্‌মারী খুলিয়া কাপড়-জামা বাহির করিতে করিতে বলিল, "দেখতে পারব না কেন? সে কি আমাদের পর ছিল? তবে অন্যায় দেখলে বলব না? এই নে, এই শাড়ী-জামা তোর পছন্দ হয়?"

মায়া বলিল, "আচ্ছা দাও।" ইন্দুর সাহায্যে কাপড়-চোপড় বদ্‌লাইয়া সে খাটে উঠিয়া শুইল। ইন্দুর আদেশে বুড়ী আয়া মেঝের পাতা বিছানাটা উঠাইয়া লইয়া গেল।

৩৮

প্রভাস রেঙ্গুনে আসিয়া মহা ফাঁফরে পড়িল। যে কাজের জন্য আসিয়াছিল তাহা হওয়া এখন অসম্ভব। এখন পর্য্যন্ত মায়া সারিবার কোনো লক্ষণই দেখায় নাই। ইন্দু একদিন প্রভাসকে উপরে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার নাম শুনিবামাত্র মায়া মুখ লাল করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিল, কিছুতে আর তাহাকে প্রভাসের দিকে ফিরানো গেল না। অগত্যা প্রভাস নামিয়া আসিল, তাহার পর আর মায়ার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করে নাই। নিরঞ্জন

তাহাকে মায়ার গাড়ীখানা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সে খাওয়া-শোওয়া বাদে বাকি সব সময়টাই বেড়াইয়া কাটাইয়া দিত। কিন্তু ইহাও তাহার খুব বেশী ভাল লাগিত না। একলা একলা আর কাঁহাতক ঘোরা যায়?

চলিয়া যাইতেও প্রভাস পারিতেছিল না। কিছু কাছের দেশ নয়, একবার ফিরিয়া গেলে, আবার কবে যে সে আসিতে পারিবে, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। একেবারেই আর আসিতে পারিবে কি না তাহাই বা কে জানে? অথচ মায়ার এই ইচ্ছাটা কার্য্যে পরিণত করার দিকে তাহার সমস্ত মন পড়িয়া ছিল। অন্য অনেক গ্রামে সে এই-সব জনহিতকর অনুষ্ঠান করিয়া বেড়াইয়াছে, নিজেদের গ্রামেই এতদিন অর্থের অভাবে কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। এমন একটা সুযোগ তাই চট্ করিয়া ছাড়িয়া দিতে তাহার মন উঠিতেছিল না। মাস খানিক ছুটি তাহার ছিল, যদিই ইহার মধ্যে মায়া সারিয়া ওঠে, এই ভরসাই সে করিতেছিল।

আজ শুক্রবার, কলিকাতার ডাক্তার আসিবার কথা। নিরঞ্জন চা খাইয়া তাঁহাকে আনিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ইন্দু বসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেছিল। প্রভাস চা খায় না, সে জলযোগ সারিয়া বসিয়া কাগজ পড়িতেছিল।

ছোক্‌রা এমন সময় আসিয়া খবর দিল, "হুজুর, ব্যারিস্টার সাহেব।"

নিরঞ্জন বলিলেন "এ কাম্‌রামে লে আও।"

ইন্দু তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইবার জোগাড় করিতেছে দেখিয়া নিরঞ্জন বলিলেন, "তুই যাস্ নে, ছেলেটি আমাদের আত্মীয় হবার খুব সম্ভাবনা আছে, যদি ভগবান্ দয়া করেন।"

বিবাহের নামে কৌতূহলী না হয় এমন নারী জগতে দুর্লভ। ইন্দু আবার বসিয়া পড়িল। প্রভাস নিরঞ্জনের কথায় খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে তাকাইয়া রহিল। হাঁ, দেখিবার মত চেহারা বটে, রূপে অন্ততঃ মায়ার উপযুক্ত পাত্রই হইবে। দেবকুমার নিকটে আসিতেই নিরঞ্জন বলিলেন, "এই যে। কাল ত সারাদিন এস নি।"

দেবকুমার বলিল, "বড় কাজের চাপ পড়েছিল, সেই জন্যে আসতে পারিনি। বাবার আবার জ্বর এল, তাঁকে দেখবার কেউ ছিল না।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছেন?"

দেবকুমার বলিল, "এখন ত ভালই দেখে এলাম।"

নিরঞ্জন ইন্দুকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই মায়ার পিসী, মঙ্গলবারের স্টীমারে এসেছেন।"

দেবকুমার যদিও সাহেব সাজিয়াই আসিয়াছিল, তবুও তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া অবনত হইয়া ইন্দুকে প্রণাম করিল। ইন্দু তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিল, "বেঁচে থাক বাবা, যেমন রাজপুত্রের মত চেহারা, তেমনই কপাল হোক। তুমি আমাদের আপনার জন হবে শুনে বড় আনন্দ হচ্ছে, এখন ঠাকুরের কৃপায় মেয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে উঠলেই হয়।"

দেবকুমার হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "বিশেষ ভাল আশীর্বাদ করলেন না পিসীমা। আজকার দিনে যা কপাল রাজপুত্রদের, তা বেশী লোভনীয় নয়।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা বটে। আচ্ছা, দেবকুমার বোস, আমি একবার 'হোয়ার্ফ্'এ যাচ্ছি ডাক্তার মিত্রকে আনতে। যদিও কি ক'রে তাঁকে চিনব জানি না, তিনিও আমাকে কখনও দেখেননি।"

দেবকুমার উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। আমি তাঁকে চিনি, বিলেত যাবার আগে বেশ আলাপ ছিল।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা হলে ত ভালই হয়। প্রভাসের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেওয়া হল না ত? প্রভাস, এই আমাদের শিবচরণবাবুর ছেলে দেবকুমার, এখানে প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করেছেন। দেবকুমার, ইনি আমাদের গ্রামের ছেলে, প্রভাস গাঙ্গুলী, সামাজিক কাজে খুব উৎসাহী। এঁর সাহায্যে মায়া গ্রামে একটা স্কুল করবে ঠিক করেছিল, সেই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কইতেই এঁর আসা। মায়া অসুখ ক'রে পড়াতেই মুশকিল হয়েছে।"

দেবকুমার প্রভাসকে নমস্কার করিয়া বলিল, "বিকেলে এসে আপনার সঙ্গে কথা বলব। এই কাজগুলি আমারও খুব ভাল লাগে, যদিও সুবিধার অভাবে কিছু করতে পারিনি। ওদেশে ঘুরে ঘুরে ওদের কাজের ধরণধারণ অনেক দেখে এসেছি।"

প্রভাস প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল, "আমিও তাহ'লে আপনার কাছে অনেক নূতন কথা শুনতে পাব।" বেশী কিছু বলিতে তাহার ইচ্ছা করিল না। অন্য সকলে দেবকুমারকে দেখিয়া যতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক, তাহার নিজের এই বিলাত-ফেরত যুবকটিকে দেখিয়া মোটেই ভাল লাগিল না। রূপবান্ বটে, কিন্তু পুরুষ মানুষের দাম ত রূপের উপর নির্ভর করে না?

নিরঞ্জন দেবকুমারকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। ইন্দু বলিল, "দিব্যি খাশা ছেলেটি, না প্রভাস? ঘর আলো করা জামাই হবে। এখন মেয়ে সারলে বাঁচি। দেখি গিয়ে কি করছে। আমি ধ'রে বেঁধে না খাওয়ালে ত খাবেও না কিছু। তুমি এখন কি বেরুবে?"

প্রভাস বলিল, "দূরে কোথাও যাব না। এই লেকের ধারে একটু ঘুরে আসি।" অকারণেই তাহার মনটা বড় ভার লাগিতেছিল। সে একটা ছড়ি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল। ইন্দু উপরে চলিল।

মায়া মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। ইন্দুর সঙ্গে তাহার নিজের ব্যবহারের যে-সব দেবদেবীর পট, পূজার সামগ্রী প্রভৃতি ছিল, সব এখন মায়া দখল করিয়াছে। ঘরের এক কোণে ঠাকুরের সিংহাসন পাতিয়াছে, সকালে অঞ্জলি, বিকালে আরতি, প্রভৃতি সুরু করিয়াছে। তাহার পুরাকালের যে-সব বাংলা সংস্কৃত বই ছিল সব বাহির করিয়াছে, মাঝে মাঝে সে-সব খুলিয়া বসে। তবে মিনিট পাঁচ-সাতের বেশী মন দিতে পারে না। আবার তুলিয়া রাখে। আলমারীর কাপড়চোপড় এখন পরিতেছে, ছেঁড়া কাপড় আর পরে না। মুখের ভাব আগেরই মত, কিসের আঘাতে যেন তাহার চেতনা অর্দ্ধ-আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

ইন্দু ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি রে, কিছু খাসনি দেখছি, সবই ত প'ড়ে আছে?"

মায়া নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "যা সব নোংরা বাসন-কোসন! ভাল ক'রে মাজে না কিছু না। তেল ব্যাড়্ ব্যাড়্ করছে। ওতে কি মানুষ খেতে পারে?"

ইন্দু জানিত মায়ার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তাহাকে নাওয়াইতে খাওয়াইতে হইলে, তাহার মতে চলিতে হইবে। সুতরাং আর কথা না বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল এবং বাসনের আলমারী খুলিয়া শ্বেত-পাথরের রেকাবী, বাটি, গেলাস সব বাহির করিয়া খাবার গুছাইয়া উপরে লইয়া আসিল। ছোক্‌রা মহানন্দে আগের খাবারগুলি তুলিয়া লইয়া গেল, এগুলি এখন তাহারই ভোগে লাগিবে।

মায়া খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমা, তিনি কি এখনও আছেন নাকি?"

ইন্দু বলিল, "তিনিটা কে আবার? তোর বর?"

মায়া মুখ লাল করিয়া বলিল, "পিসীমা, কি রকম ক'রে যে কথা বল।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "তা কি রকম ক'রে বলতে হবে, তুইই শিখিয়ে দে না? তোদের সব হাল ফ্যাসানের নিয়ম-কামুন ত আমি জানি না।"

মায়া বলিল, "যা তা বল কেন? আমি আবার কবে থেকে হাল ফ্যাসানের হলাম? ও সব শুনলে আমার হাড় জ্বালা করে।"

ইন্দু বলিল, "তা না হয় আর বলব না, তুমি তেকেলে বুড়ীই যখন। তা দেবকুমার এসেছে তা তুই জানলি কি ক'রে? সে ত উপরে মোটেই আসেনি।"

মায়া বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "দেবকুমার কে পিসীমা? কই, আমি ত জানি না কেউ এসেছে ব'লে।"

ইন্দু একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। বলিল, "তবে তুই কার কথা জিজ্ঞেস করছিলি? দেবকুমারের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে তা যেন জানিস্ না? তোর বাবা এখনি আমায় বললেন, আগে ত শুনিও নি। দিব্যি সুন্দর রাজপুত্রের মত চেহারা, আবার পড়াশুনোয়ও তেমনি।"

মায়া উত্তেজিত ভাবে বলিল, "বাবা যদি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে দেন, তাহলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব। হিন্দুর মেয়ে একবার যাকে স্বামী ব'লে জানে, তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারে না।"

ইন্দু এতক্ষণে ব্যাপারটা একটু বুঝিতে পারিল। দারুণ একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতরটা যেন শুকাইয়া উঠিল। ভগবান্ এ কি করিলেন? এমন সুন্দর দুইটি জীবনকে এমনি নির্ম্মম ভাবে ধ্বংস করিতে বসিলেন? মায়া নিজের জীবনের মাঝের কয়েক বৎসরকে কি করিয়া এমন সম্পূর্ণভাবে হারাইয়া ফেলিল? দেবকুমারের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ কে করিয়াছে তাহা ইন্দু ঠিক জানে না। কিন্তু নিরঞ্জনকে যতদূর সে জানে, মায়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহের কোনো সম্বন্ধ নিশ্চয়ই তিনি করেন নাই। বিবাহ দিবার কোনো তাড়া তাঁহার ছিল না। মায়া ও দেবকুমার নিজেরাই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকিবে, তিনি সম্মতি দিয়াছেন মাত্র। কিন্তু এ সকল স্মৃতিই কি মায়ার মন হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে? দেবকুমারের নাম তাহার মনে কোনো পরিচয়ের স্মৃতিই জাগায় না, তাহার প্রতি ভালবাসার কোনো চিহ্নই এই অদ্ভুত তরুণীর ভিতর এখন পাওয়া যায় না। কোথায় এ নিদারুণ সমস্যার সমাধান?

শুধু দেবকুমারকেই যে মায়া ভুলিয়াছে তাহা নয়। কবে কোন্ কৈশোরে যে মানুষটি সম্বন্ধে সামান্ত অনুরাগের অঙ্কুর মায়ার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই মূর্ত্তি এতদিনের পর আবার তাহার জীবনে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া বসিয়াছে। মায়া যে প্রভাসের কথাই এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছিল, সে বিষয়ে ইন্দুর সন্দেহ মাত্র আর রহিল না। সে ভাবিয়া কোনো কূল দেখিতে পাইল না। ভয়ে উদ্বেগে তাহার মাথার ভিতরটা যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। মায়া তখনও মুখ লাল করিয়া বসিয়া আছে। বেশী উত্তেজনায় পাছে তাহার কিছু অনিষ্ট হয়, এই ভয়ে ইন্দু তাড়াতাড়ি বলিল, "আচ্ছা থাক, ও-সব কথা পরে হবে এখন। কিছু কি আর ঠিক হয়েছে? আমি অমনি ঠাট্টা করছিলাম। তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি বিয়ে হতে পারে? মেজদার মত কি তুই জানিস্ না? তুই এত বড় মেয়ে হয়েছিস্, তুই যা বলবি, সেই অনুসারে কাজ হবে।"

মায়া এতক্ষণ খাওয়া ফেলিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া ছিল। ইন্দুর কথায় খানিকটা যেন আশ্বস্ত হইয়া আবার খাইতে আরম্ভ করিল। বলিল, "তাই হলেই ভাল। শুধু শুধু একটা গোলমাল বাধাতে আমিই কি চাই নাকি? তাই ব'লে আমাকে নিয়ে যা তা করলে চলবে কেন? কই, তুমি ত বললে না তিনি আছেন কি না?"

ইন্দু অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিল, "আছে।" মনে মনে ভাবিল 'এমন উৎপাত হবে জানলে কে ও আপদ্‌কে সঙ্গে ক'রে আনত? না হয় দুদিন পরেই আসতাম। আহা, দেবকুমার ছেলেটি চমৎকার। এমন চেহারা লাখে একটা দেখা যায় না। ব্যারিস্টারও হয়েছে। টাকাকড়ি আছে কি না কে জানে? তা মেজদার যা কিছু সবই ত মায়া পাবে। বরের টাকা থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি? এ ছেলের কাছে কি আর প্রভাস লাগে? কোনো টুলো পণ্ডিতের মেয়েকে বিয়ে করবে, সেই ওকে মানাবে। এখন এ পোড়া রোগ সারলে বাঁচি। এমন কাণ্ড জন্মে শুনিনি বাপু।'

মায়ার খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল, "পিসীমা, তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে একবার আমার ঘরে এস, একটু রামায়ণ শুনব।"

ইন্দু বলিল, "দেখি, সময় পাই ত আসব। আজকের জাহাজে কে এক ডাক্তার আসছে তোর জন্যে, মেজদা তাকে আনতে গেল। তাদের সব খাওয়া-দাওয়া হোক, তোকে দেখা হোক, তারপর সময় থাকে ত আসব।"

মায়া বলিল, "কেন যে তোমরা ডাক্তার বদ্যি দেখিয়ে পয়সা নষ্ট করছ তা তোমরাই জান। আমার ত কিছু হয় নি? মাথাটা মাঝে মাঝে একটু ভার লাগে।"

ইন্দু বলিল, "নিজের অসুখ ত সব সময় নিজে বোঝা যায় না? তুই কেমন যেন হয়ে গেছিস্। কি সব আবোল তাবোল বকিস্, তাই ত মেজদা এত ডাক্তার ডাকাডাকি করে।"

মায়া বলিল, "তোমাদের পছন্দমত কথা না হলেই আবোল তাবোল হল? আমি কি ক্ষেপেছি নাকি?"

ইন্দু বলিল, "যাক্ গে সে কথা। তুই এখন কি করবি? আমি ত নীচে যাচ্ছি, ভাঁড়ার দেব, তরকারি কু'টব। তারপর স্নান ক'রে নিজের রান্না চড়াব। ততক্ষণ একলা থাকবি?"

মায়া বলিল, "করবার ত কিছু খুঁজে পাই না। ঘরের কাজ ত সব চাকর-বাকরেই করছে, তার উপর তুমি রয়েছ। আমার যে ক'খানা বই ছিল, তাও প'ড়ে প'ড়ে মুখস্থ হয়ে গেল।"

ইন্দু বলিল, "ও মা, বইয়ের অভাব নাকি ভারি? তোর ওদিক্কার পড়বার ঘরে, নীচে লাইব্রেরী ঘরে বই ঠাশা রয়েছে, এনে পড়্ না? তা'হলে ত সময় বেশ কাটে। চল্ না আমার সঙ্গে, বই নিয়ে আসবি।"

মায়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "আচ্ছা চল।"

ইন্দু তাহাকে সঙ্গে করিয়া পড়িবার ঘরে লইয়া গেল। মায়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব বইয়ের আলমারীগুলি দেখিতে লাগিল। বলিল, "বাবার টাকা যেন কামড়ায়, না পিসীমা? বই কিনেই কত টাকা উড়িয়েছেন দেখ? আমার জন্যে এত বইয়ের কি দরকার ছিল? সাত জন্মেও প'ড়ে শেষ করতে পারব না।"

ইন্দু বলিল, "শেষ করতে পারবি না কেন? এর অনেকগুলোই ত তোর কলেজের বই ব'লে শুনি।"

মায়া খানিকক্ষণ ইন্দুর দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "কিসের বই বললে পিসীমা?"

ইন্দু বলিল, "কলেজের বই, কলেজের বই। কানেও আজকাল কম শুনছিস্ নাকি?"

মায়া বলিল, "কম শুনতে যাব কেন? কিন্তু কি যে তুমি সব বলতে সুরু

করেছ! আমার কলেজের বই মানে কি? আমি আবার কবে কলেজে গেলাম? বাবার কলেজের বই?"

ইন্দু ভীত ভাবে বলিল, "তুই একখানা বই খুলে দেখ্ না, পড়তে ভাল লাগে কি না।"

মায়া আলমারীর দরজা টানিয়া খুলিয়া একখানা বই বাহির করিল। অনেকক্ষণ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, "পিসীমা, তুমি আমার সঙ্গে চালাকি করছ। এ সব ত ইংরিজি বই। আমি কোথা থেকে পড়ব? নীচের ঘরে বাংলা বই যদি কিছু থাকে, তাই চল নিয়ে আসি গে।"

ইন্দু বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। খানিক পরে অনেক কষ্টেই যেন জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু পড়তে পারছিস্ না?"

মায়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "পিসীমা, তুমি কি পাগল হয়েছ? আমি কি বি-এ, এম্-এ পাস যে ইংরিজি পড়ব?"

ইন্দু বিস্ময়বিমূঢ়ের মত কতক্ষণ যে একই জায়গায় দাঁড়াইয়া ছিল, সে সম্বন্ধে তাহার নিজের কোনো জ্ঞান ছিল না। মায়ার অসুখটা যে এ রকম অচিন্তনীয় রকমের দুর্ঘটনা, তাহা সে আগে বুঝিতেই পারে নাই। কয়েকটা বৎসরের ঘটনাবলির স্মৃতিই যে শুধু তাহার নাই, তাহা নয়, সে-সময়কার শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার, সবই তাহার মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে।

বাহিরে গাড়ীর শব্দে, সে যেন তন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। বুঝিল, নিরঞ্জন ডাক্তারকে লইয়া জাহাজঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মায়া তখনও আলমারীগুলির কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথাও বাংলা বই আছে কি না দেখিতেছিল। ইন্দু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ওরে তোর জন্যে ত মেজদা ডাক্তার নিয়ে এল, উপরের ঘরে চল্।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই নিরঞ্জন, দেবকুমার এবং ডাক্তার মিত্র আসিয়া ঠিক লাইব্রেরীর সামনেই দাঁড়াইলেন। ডাক্তারের বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছিই বোধ হয়, শ্যামবর্ণ রং, দীর্ঘ কৃশাকৃতি।

মায়া এত লোকের পায়ের শব্দে চমকিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইল এবং অপরিচিত পুরুষ দুইজন দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া জিভ্ কাটিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। দেবকুমারকে দেখিয়া চিনিবার কোনো লক্ষণ তাহার দৃষ্টির মধ্যে দেখা গেল না।

দেবকুমার এতখানি বিস্মৃতির আশঙ্কা করে নাই। সামনাসামনি আসিয়া

পড়িলে মায়া তাহাকে চিনিতে পারিবে এবং এই পরিচয়ের সূত্র ধরিয়াই আবার নিজের লুপ্ত চেতনাকে ফিরিয়া পাইবে, ইহাই তাহার বিশ্বাস ছিল। দুদিন আগে যে হৃদয়ের অন্তরতম ক্ষেত্রে তাহাকে অধীশ্বর বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল, আজ সেই নারীর জীবনে তাহার বিন্দুমাত্র স্থান কোথাও নাই, এত বড় ভয়াবহ দুর্ঘটনা সে যেন বিশ্বাস করিতেই পারিতেছিল না। এ যে মৃত্যুরও অধিক দুঃখ, ইহাকে সে সহ্য করিবে কি করিয়া? মায়ারই না হয় স্মৃতি লুপ্ত হইয়াছে, হতভাগ্য দেবকুমারের হৃদয়পটে যে তাহাদের প্রেমের চিত্র আগুনের রংএ আঁকা রহিয়াছে, তাহার শাস্তি কোথায়?

দেবকুমারের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ইন্দুর চোখে জল আসিতেছিল। সে তাহার কাছে আসিয়া নীচু গলায় বলিল, "দুঃখ ক'রো না বাবা, মায়া আবার নিশ্চয় সেরে উঠবে। তুমি এমন লক্ষ্মী ছেলে, ভগবান্ তোমায় এত কষ্ট কখনও দেবেন না।"

দেবকুমার হাসিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল, "জগৎটা ত এত সোজা জায়গা নয় পিসীমা। ভাল হলেই যদি সুখী হওয়া যেত, তাহলে ত সংসারে দুঃখ কেউই পেত না। যাক্, আমার সুখদুঃখটা আসল কথা নয়, আসল কথা ওর সেরে ওঠা।"

নিরঞ্জন ডাক্তার মিত্রকে বলিলেন, "ঐ আমার মেয়ে। আপনি একটু বিশ্রাম ক'রে নিন, তারপর উপরে গিয়ে ওকে ভাল ক'রে দেখবেন।"

ডাক্তারকে তিনি তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে লইয়া গেলেন।

দেবকুমার বলিল, "আমি তাহলে এখন আসি পিসীমা, ও বেলা এসে খবর নেব, ডাক্তার কি বলেন।"

দেবকুমার চলিয়া যাইতেই, ইন্দু আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। মায়া নিজের ঘরে বসিয়া একখানা বাংলা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল, ইন্দুকে দেখিয়া বলিল, "পিসীমা, বাবার পাগলামী আর কোনোকালে যাবে না। কেমন মানুষ দুটোকে হট্ ক'রে ঘরের মধ্যে এনে উঠোলেন!"

ইন্দু বলিল, "তা ডাক্তার ঘরে আসবে না ত কোথায় যাবে? তুই ত আর মুসলমানের ঘরের বেগম নয় যে পরদার ওপার থেকে তোকে ডাক্তার দেখবে?"

মায়া বলিল, "হিন্দুর মেয়ের বুঝি আর লজ্জা-সরম থাকতে নেই? আর একজন লোক কে, একজন ত ডাক্তার?"

ইন্দু বলিল, "আর একজন ত দেবকুমার, সত্যি তাকে তুই চিনতে পারলি না?"

মায়া হাসিয়া বলিল, "কবে আমি তাকে দেখলাম যে চিনব?"

ইন্দু আর কিছু বলিবার খুঁজিয়া পাইল না, চুপ করিয়া রহিল। এমন সময় সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল। মায়া বলিল, "ঐ বুঝি বাবা ডাক্তার নিয়ে আসছেন? কি হাড়-জালাতন বাবা, অসুখ নেই, বিসুখ নেই, দিনে পঞ্চাশবার ক'রে ডাক্তার দেখাও।"

ইন্দু বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, তোর অত গিন্নীপনায় কাজ নেই। তোর বাপ তোর চেয়ে কম বোঝেন না। যা দরকার তাই করছেন। ডাক্তার যা জিজ্ঞেস করবে, ঠিক ঠিক উত্তর দিস্ যেন।"

মায়া বলিল, "ঠিক ঠিক উত্তর দেব না ত কি গ'ড়ে গ'ড়ে উত্তর দেব? তোমরা আমায় কি পেয়েছ যেন।"

নিরঞ্জন ডাক্তার মিত্রকে লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। ইন্দু তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া ডাক্তার মায়াকে নানাভাবে পরীক্ষা করিলেন। কোনো কোনো প্রশ্নের সে ভাল করিয়া জবাব দিল, কোনো প্রশ্নের উত্তরে শুধু ঘাড় নাড়িল। মোটের উপর তাহার কয়েক বৎসরের স্মৃতি যে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে কাহারও কোনো সন্দেহ রহিল না।

নিরঞ্জন ডাক্তারকে লইয়া নীচে অফিসের ঘরে চলিয়া গেলেন। দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম বুঝছেন? এ রকমের কেস্ আগে কখনও ট্রিট্ করেছেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "এ ধরণের কেস্ খুবই 'রেয়ার', আমি নিজে কখনও 'ট্রিট্' করিনি। আর যতদূর জানি এর 'ট্রিট্‌মেণ্ট' কিছু নেইও, ভাগ্যের উপর নির্ভর ক'রে থাকা ছাড়া। আপনার মেয়ের 'মেমরি' যেমন হঠাৎ লোপ পেয়েছে, তেমনি হঠাৎ ফিরেও আসতে পারে। এটা হিষ্টিরিয়ার কেস্, একে double personality-র কেস্ বলা যেতে পারে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "ডাক্তারী বইয়ে এরকম কেসের ইতিহাস কিছু পাওয়া যায়?"

ডাক্তার বলিলেন, "তা আছে। তবে অবিকল এরকম হয়ত নয়। এ ধরণের কেসের হিষ্ট্রি কুড়ি পঁচিশটার বেশী পাওয়া যায় না। অবশ্য জগতে

আরো ঘটেনি তা বলতে পারি না, তবে সব কেস্ ত আর বইয়ে ওঠে না? একটা কেস্ আছে তাতে একটি মহিলা হঠাৎ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হন। অনেক ঘণ্টা জাগেননি। যখন জাগলেন তখন দেখা গেল, তাঁর স্মৃতিশক্তি একেবারে লোপ পেয়েছে। তাঁকে আস্তে আস্তে আবার লিখতে পড়তে শেখানো হল, মানুষজনকে চিনতে শিখলেন। কিছুকাল পরে আবার আগের মত ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন জাগলেন তখন তিনি নিজের পূর্বাবস্থা ফিরে পেয়েছেন, কিন্তু মাঝের ঐ দিনগুলির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছেন। এই রকম অবস্থান্তর তাঁর বার বার ঘটতে লাগল, এক অবস্থায় আর এক অবস্থার কথা তাঁর একেবারেই মনে থাকত না।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁর কি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এইভাবেই কেটেছিল?"

ডাক্তার মিত্র বলিলেন "না, বছর পাঁচেক এইভাবে ভুগেছিলেন, তার পর সেরে যান।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "এই ধরণের অসুখে কোনো চিরস্থায়ী অনিষ্ট হয়ে যেতে পারে কি?"

ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "স্নায়বিক অসুখের বিষয় কোনো কিছু ঠিক ক'রে কি বলা যায়? অনিষ্ট হতেও পারে, নাও হতে পারে। সেটা সাময়িকও হতে পারে, চিরস্থায়ীও হতে পারে। প্রথম যে মেয়ের কথা আপনাকে বললাম, তার স্মরণশক্তি হারিয়ে ফেলা ছাড়া আর কোনো অনিষ্ট হয়নি তবে ডাক্তার ওয়ার মিচেলের বইয়ে একটি মেয়ের কথা পড়া যায়, যার আঠারো বছর বয়সে হঠাৎ মূর্চ্ছা হয়। মূর্চ্ছা ভাঙবার পর দেখা গেল যে, সে কালা এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য এ ভাব বেশীদিন থাকেনি। ক্রমে ক্রমে সব শক্তি ফিরে পেল। আবার আর একবার মূর্চ্ছা হয়ে তার স্মৃতি লোপ হল। এ রকম অনেকবার অনেক রকম হল। জীবনের শেষ পঁচিশ বছর ভালই ছিল। তবে সব অবস্থাগুলো মিলে মিশে শেষে খানিকটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল।"

নিরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কি যে হবে, কিছু ত বুঝতে পারছি না। এর কোনো চিকিৎসা নেই, আপনি বলছেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "চিকিৎসা আর কি? সাধারণ স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে, মন যাতে ভাল থাকে তারই চেষ্টা করতে হবে আর কি? তারপর

অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। আশা করা যায় যে আপনার মেয়ে শীগ্‌গিরই ভাল হয়ে উঠবেন।

নিরঞ্জন বলিলেন "সারবার সম্ভাবনা যতখানি, না সারবারও ততখানি যে ?"

ডাক্তার বলিলেন, "তাই যদি হয় তাহলেও একেবারে হাল ছেড়ে দেবার কিছু নেই। যতদূর দেখছি, কয়েক বছরের স্মৃতি এঁর মন থেকে মুছে গেছে। এ ছাড়া বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়ের কোনো হানি হয়নি। তাঁকে আবার লেখাপড়া শেখাতে হবে, আগে যে ভাবে 'ট্রেন্' করা হয়েছিল তাই আবার করতে হবে। মানুষ করা মেয়েকে আবার ফিরে মানুষ করা। কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তবু তাই করতে হবে যদি নিজের থেকে না সারেন। জীবনটা তাঁর কয়েক বছর পিছিয়ে যাবে বটে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "শুধু ত তা নয়, এর থেকে আরো কত সমস্যার সৃষ্টি হবে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ওর বাগ্‌দত্ত স্বামীকেও চিনতে পারল না, দেখলেন ত ? ছেলেটিকে কি যে বোঝাব ভেবে পাই না, মেয়ের জন্যে যত দুঃখ আমার, দেবকুমারের জন্যেও প্রায় ততখানি। ভারি চমৎকার ছেলে, ওর জীবনটা যদি এইভাবে নষ্ট হয়, সেটা প্রায় আমার মেয়ের অসুখের সমানই ট্র্যাজিডি হবে।"

ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "যাক, let's hope for the best! কিছু বেশী-দিন ত হয়নি ? আমি যতগুলো কেসের কথা জানি, সবগুলোই কোনো না কোনো সময়ে সেরে গিয়েছে। অবশ্য relapse'ও মাঝে মাঝে করেছে। আপনার মেয়েও লুপ্ত স্মৃতি ফিরে পাবেন মনে হয়।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তাই আশা করা ছাড়া যখন উপায় নেই, তখন অগত্যা তাই আশা করতে হবে। আচ্ছা আপনি স্নানটান করুন গিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার পর একবার বেরোতে চান কি ?"

ডাক্তার মিত্র উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "তা গেলেও হয়। বৃহস্পতিবারের আগে ত ফিরবার উপায় নেই, এই ক'টা দিন যেমন ক'রে হোক কাটাতেই হবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আপনাকে আমি প্রতি মেলেই ওর অবস্থার কথা লিখব, যদি কিছু করবার থাকে ত জানাবেন। যতদিন কোনো পরিবর্তন না হয় ততদিন কোথাও চেঞ্জে নিয়ে যাব কি ?"

ডাক্তার বলিলেন, "তার দরকার নেই। বরং পরিচিত লোকজনের মধ্যে

কলে উপকার হতে পারে। দেবকুমারকে যদি রোজ তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন, তাতে কিছু উপকার হতে পারে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "গোলমাল ত সব ঐখানেই। এখানে আসবার আগে মায়া খুব গোঁড়া হিন্দু ছিল। আমার স্ত্রীর ইন্‌ফ্লুয়েন্স্‌ আর কি? তারপর এখানে থাকার সঙ্গে সঙ্গে সেটা কেটে গিয়েছিল। এখন আবার সেই গোঁড়াভাব ফিরে এসেছে। দেবকুমারকে দেখলে ত সে উর্দ্ধশ্বাসে পালায়, তা তাকে দেখা করতে ব'লে আর লাভ কি?

ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "এ সব মানসিক ব্যাধি নিয়ে বড় ভুগতে হয়। আচ্ছা, দেখা যাক।"

ডাক্তার মিত্র নিজের ঘরে চলিয়া যাইবার পরও নিরঞ্জন অফিস্‌ ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। কত রকম চিন্তা যে তাঁহার মাথার ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। তাঁহার একমাত্র সন্তান মায়া, বিধাতা তাহারই অদৃষ্টে এ কি নিদারুণ অভিশাপ লিখিয়া দিলেন?

খাওয়ার সময় প্রভাস ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার মিত্র উপস্থিত ছিলেন বলিয়া সে নিরঞ্জনকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পরিল না। কিন্তু তাহার অভিমত জানিবার জন্য তাহার মন ছটফট্‌ করিতে লাগিল। অত বেশী আগ্রহ দেখানও তাহার হয়ত শোভন হইবে না। মায়াকে অবশ্য সে বাল্যকাল হইতে জানে, কিন্তু সে এখন তরুণী, এবং অন্যের বাগ্‌দত্তা বধূ। তাহার বিষয়ে বেশী উৎসাহ প্রকাশ করা প্রভাসের উচিত হইবে না। ইন্দুর কাছে পরে খোঁজ করিবে স্থির করিয়া সে তখনকার মত নীরবেই খাওয়া শেষ করিয়া ফেলিল।

নিরঞ্জন ও ডাক্তার মিত্র উঠিয়া যাইবার পর প্রভাস কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ইন্দুর সন্ধানে চলিল। ভাঁড়ারঘর, রান্নাঘর বা পূজার ঘর, কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না। সে তখন উপরে মায়ার কাছে।

প্রভাস অবশেষে সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া উপরেই চলিল। তাহাকে দেখিয়া মায়া অবশ্য আগেকার মত পিছন ফিরিয়া বসিতে পারে, সে সম্ভাবনা বেশ ছিল। কিন্তু প্রভাসকে সে ভোলে নাই, ইচ্ছা হইলে কথা বলিলেও বলিতে পারে। না হয় ইন্দুর কাছে খোঁজ লইয়াই সে ফিরিয়া আসিবে।

ইন্দু মায়ার ঘরেই ছিল, সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া মায়া বলিল, "পিসীমা,

দেখ ত কে উপরে উঠছে। যে সে যেখানে সেখানে এসে উপস্থিত হয়, এ
বাড়ির এই একটা বড় দোষ। সদর অন্দরের কোনো ভেদ নেই।"

ইন্দু দরজার কাছেই বসিয়া ছিল, গলা বাড়াইয়া তাকাইয়া দেখি
বলিল, "প্রভাস বুঝি হবে।"

মায়ার মুখ লাল হইয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কি চান দেখ গিয়ে।"

মনে মনে প্রভাসের মুণ্ডপাত করিতে করিতে ইন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং
সিঁড়ির কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রভাস, কিছু চাই কি?"

প্রভাস উঠিয়া আসিয়া বলিল, "চাই না বিশেষ কিছু। তবে মায়াকে
দেখে ডাক্তার কি বললেন, তাই একটু জানতে ইচ্ছা করছে।"

ইন্দু বলিল, "মেজদার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা বলবার সময় ত পাইনি
একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাতে শুনলাম বলেছে হিষ্টিরিয়া না কি
নিজের থেকেই সেরে যাবে, ওর কোনো চিকিৎসা নেই।"

প্রভাস জিজ্ঞাসা করিল, "কতদিনে সারতে পারার সম্ভাবনা, সে বিষয়ে
কিছু বলেছেন কি?"

ইন্দু বলিল, "জানি না। বিকেলে চা খাবার সময় জিজ্ঞেস করব।"

প্রভাস অল্পক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমা, আমি
মায়ার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি কি? আমাকে চিনতে পারবেই ব'লে
মনে হয়। গ্রামের সেই স্কুলের বিষয় বুঝিয়ে বললে হয়ত বুঝতে পারবে
আমিও বেশীদিন শুধু শুধু এখানে ব'সে থাকতে পারব না, মায়া যদি
খানিকটা বুঝেও জিনিষটাতে মত দেয়, তাহলে ফিরে গিয়ে আমি কাজ আরম্ভ
করতে পারি। টাকাকড়ির কথা অবশ্য সব কাকাবাবুর সঙ্গেই বলতে হবে।"

ইন্দু কঠিন স্বরে বলিল, "মেজদাকে জিজ্ঞেস না ক'রে দেখা করতে যাওয়া
ঠিক হবে না। যা অবস্থা হয়ে আছে, এতে কখন কিসে কি হয় তার
ঠিকানা নেই। একে ত বিপদ্ রাখবার জায়গা নেই, তার উপর যদি আবার
বেড়ে যায়, তাহলেই গেছি।"

প্রভাস ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "থাক্, তা হলে দরকার নেই।"

নামিয়া যাইবার আগে সে একবার মায়ার ঘরের দরজার দিকে চাহিয়া
দেখিল। মনে হইল কপাটের আড়ালে মায়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার
পরণের লালপেড়ে শাড়ীর একটা অংশ দেখা যাইতেছে। হয়ত উহাদের কথা
শুনিবার জন্তই দাঁড়াইয়া আছে।

ইন্দু পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পাছে প্রভাস কোনো কথা মায়াকে লক্ষ্য করিয়া বলে, বা দেখা করিবার চেষ্টা করে। মায়া পোড়ামুখীর যা মনের ভাব, সে যে তাহা হইলে কি কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে, তাহা কে জানে? তাহা হইতে ইন্দু দিবে না। কিন্তু সে রকম কোনো চেষ্টা না করিয়া প্রভাস নীরবেই নীচে নামিয়া গেল।

৪০

মায়ার মনোজগতে এই সময়টায় কি যে ঘটিতেছিল বা না ঘটিতেছিল তাহা সে নিজে ভিন্ন বড় কেহ একটা বুঝিতে পারিত না। বাহির হইতে যতদূর বুঝা যাইত, সে তাহার পল্লীবাসিনী বালিকার জীবনে আবার ফিরিয়া গিয়াছিল। সেই মতামত, সেই শিক্ষাদীক্ষা, সেই অপরিণত বুদ্ধি। বয়সে সে তরুণী, কিন্তু মনের দিক্ দিয়া তেরো চোদ্দ বৎসরের মেয়ের মতই তাহাকে বোধ হইত।

একটা জিনিষ কিন্তু নিরঞ্জন বা ইন্দু কেহই বুঝিতে পারেন নাই। সেটা মায়ার হৃদয়াবেগের বিকাশ। স্মৃতিলোপ হইবার পূর্বে তাহার জীবনে প্রেমের স্পর্শ ভাল করিয়াই লাগিয়াছিল। দেবকুমারের জন্য সে সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইতেছিল। তাহার ভালবাসা বালিকার চপল ভালবাসা ছিল না, নারীর পরিণত মনের সর্বত্যাগী ভালবাসাই ছিল। দারুণ রোগের কবলে পড়িয়া সে দেবকুমারকে ভুলিল বটে, কিন্তু এই ভালবাসা তাহার মনে থাকিয়াই গেল।

ভালবাসা কখনও অবলম্বনহীন হইয়া থাকিতে পারে না। মায়া যাহাকে ভালবাসিয়া ভালবাসার অর্থ বুঝিতে শিখিয়াছিল, তাহাকে এই বিস্মৃতিসাগরে হারাইয়া ফেলিল, কিন্তু তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। নিজের আত্মীয়স্বজন যাহাদের সে চিনিত, তাহাদের ভালবাসিয়া সে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। নিজের অপরিস্ফুট চেতনার সাহায্যেই সে বুঝিল যে সে কি চায়। কিন্তু কাহাকে চায়, কোথায় সে? ভাগ্যদোষে ধ্রুবতারা তাহার আঁধারে ডুবিয়া গেল, এখন আকুল আগ্রহ লইয়া সে ছুটিল আলেয়ার পশ্চাতে।

প্রভাসকে সে চিনিতে পারিয়াছিল। তাহার মাতা সাবিত্রী বাঁচিয়া থাকিতে মায়ার সঙ্গে যে প্রভাসের বিবাহ দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন,

তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত। বিবাহ হইয়াও যাইত, যদি সাবিত্রী লুকাইয়া বিবাহ দিবার প্রস্তাব না করিতেন।

ইন্দুর অসুখের সময় মায়া আবার যখন গ্রামে ফিরিয়া গেল, তখন বহুবৎসর পরে আবার তাহার প্রভাসের সঙ্গে দেখা হইল। তখন অবশ্য সে প্রভাসকে ভালবাসিয়া বসে নাই, কিন্তু প্রভাস সম্বন্ধে অনেক চিন্তাই করিয়াছে। কাছাকাছি থাকিলে, এবং প্রভাসের দিক্ হইতে সাড়া পাইলে, কালে এই ভাবটাই হয়ত ভালবাসায় পরিণত হইতে পারিত। কিন্তু মায়া অল্পদিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল এবং দেবকুমারের ভালবাসায় একেবারে নিজেকে হারাইয়া বসিল। তাহার পর এই আকস্মিক দুর্ঘটনা।

এখন সে হঠাৎ প্রভাসকেই যেন মনের মধ্যে বরণ করিয়া লইতে চাহিল। এই অর্ধাচ্ছন্ন অবস্থায়ও সে বুঝিতে পারিতেছিল, এ যেন ঠিক সে যাহাকে চায় সে নয়। কিন্তু আর কে কোথায় আছে? ভালবাসে সে, কিন্তু প্রভাস ভিন্ন আর কাহাকেই বা সে ভালবাসিতে পারে? তাহাদের মিলন যদি হয়, তাহা হইলে স্বর্গগতা জননীর আশীর্বাদ সে লাভ করিবে, তাহার আরাধ্য দেবদেবী সকলের প্রসন্নতা সে লাভ করিবে, ধর্মচ্যুতির ভয় আর তাহার থাকিবে না।

সে জানিত, তাহার বাবা এ বিবাহ দিতে চাহিবেন না। পিসীমার কাছে সে শুনিয়াছে, নিরঞ্জন কোন এক বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টারের সহিত তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। পিসীমার মতও সেই দিকেই। সে একলা কেমন করিয়া নিজের বিবাহের ব্যবস্থা করিবে? হিন্দুর মেয়ের এ সকল বিষয়ে চিন্তা করা বা অগ্রসর হওয়া যে অত্যন্ত অন্যায় তাহা মায়ার দৃঢ় ধারণা ছিল। না ভাবিয়া সে পারিত না, কিন্তু কার্যতঃ কিছু করা তাহার সাধ্যায়ত্তও ছিল না এবং উহার চিন্তা মাত্রেই তাহার মন সভয়ে পিছাইয়া যাইত।

কিন্তু সে স্থির হইতেও পারিতেছিল না। পাছে তাহার অমতেই নিরঞ্জন জোর করিয়া অন্য কাহারও সহিত বিবাহ দিয়া বসেন, এই দুর্ভাবনা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। বিবাহ না করিয়া যে হিন্দুর মেয়ের গতি নাই, না হইলে সে বেশ চিরকুমারী থাকিয়া যাইতে পারিত। এমনিতেই তাহার বয়স যেন অনেক হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গ্রামে থাকিলে এতদিনে খোঁটা দিয়া সকলে তাহাদের অস্থির করিয়া তুলিত।

মায়ার খুব ইচ্ছা করিত যে, ইন্দুর সহিত এই সব বিষয়ে আলোচনা করে, কিন্তু লজ্জা আসিয়া বাধা দিত। পিসীমা হয়ত মনে করিবেন যে, মেয়ে

বিবাহের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। অথচ কোনোদিক্ হইতে কোনো সাড়াশব্দ না পাইয়া সে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল।

সেদিন সকালে প্রভাসকে উপরে উঠিতে দেখিয়া সত্যই সে দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল, কি কথা হয় শুনিবার জন্য। ইন্দু যে প্রভাসকে কোনোমতে বিদায় করিয়া দিতে ব্যস্ত, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল। মনে মনে পিসীর উপর বেশ খানিকটা চটিয়া উঠিতেছিল। এ বাড়ীতে সবাই যেন মায়ার শত্রু, সে নিজে যাহা চায়, তাহার উল্টা পথে জোর লইয়া যাইতে সকলেই ব্যস্ত। কে এখানে মায়াকে একটু সাহায্য করিবে? প্রভাস যখন এত ব্যস্ত হইয়া তাহার খবর লইতেছে, তখন নিশ্চয় মায়ার প্রতি তাহার খানিকটা মনের টান আছে, এবং বিবাহের প্রস্তাব করিলে সে নিশ্চয়ই রাজী হয়। কিন্তু কেই বা সে ভাবনা ভাবিতে বসিয়াছে?

প্রভাস নামিয়া যাইতেই ইন্দু আবার মায়ার ঘরে ফিরিয়া আসিল। দেখিল, মায়া অপ্রসন্ন মুখে এক কোণে বসিয়া আছে। ইন্দু তখন তাহার বিরক্তির কারণ ততটা বুঝিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, অতটা মুখ হাঁড়ি ক'রে বসলি যে?"

মায়া বলিল, "মুখ হাঁড়ি আবার কোথায় করলাম?"

ইন্দু বলিল, "মনে হচ্ছে যেন ভয়ানক চ'টে গিয়েছিস। হয়েছে কি?"

মায়া কি যেন বলিতে গিয়া থামিয়া গেল, তাহার পর বলিল, "মাথাটা যেন কেমন ভার ভার লাগছে।"

ইন্দু বলিল, "শুয়ে থাক খানিকক্ষণ, রোদটা প'ড়ে গেলে বাগানে বেড়িয়ে আসিস্।"

মায়া বলিল "যা চারদিকে তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের ঘটা, কোথাও কি এক পা বাড়াবার জো আছে?"

ইন্দু তাহার ঝাঁঝ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "আমাদের বন্ধুবান্ধব আবার কোথায়? তোমারই বন্ধু বরং দুচারজন আসে।"

মায়া বলিল, "হ্যা, আমার বন্ধুতে ত ঘর ভ'রে উঠেছে। যা বা দুই-একজন আছে, তোমরা পারলে ত তাদের ঝাঁটা মেরে বিদায় ক'রে দাও।"

ইন্দু এতক্ষণে ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিল। প্রভাসের সঙ্গে হয়ত মায়ার কথাবার্তা বলিতে ইচ্ছা করে। তাহার সমস্ত মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল, না,

ইহা হইতে দেওয়া যায় না। প্রভাস এখান হইতে চলিয়া গেলে সত্যই যেন আপদ্ বিদায় হয়। মায়াকে এখন কি যে এক সর্বনাশের নেশা পাইয়া বসিয়াছে, সে তাহার ঝোঁকে হয়ত এমন কিছু করিয়া বসিবে, যাহার আর কোনো প্রতিকার সম্ভব হইবে না।

খানিক ভাবিয়া ইন্দু বলিল, "ঝাঁটা আবার কাকে আমরা মারতে গেলাম? সবাইকেই ত আদরযত্ন করছি। প্রভাস আর ক'দিনই বা আছে? দেশে তার মা তার বিয়ের জন্যে উঠেপ'ড়ে লেগেছে, সে কি আর ছেলেকে চিরকাল এখানেই বসিয়ে রাখবে?"

মায়া যেন সামলাইতে না পারিয়াই বলিয়া উঠিল, "কেন? বিয়ে কি আর দেশ ছাড়া কোথাও হতে পারে না?"

ইন্দু বিরক্ত হইয়া বলিল, "পারবে না কেন? তা তারা যদি দেশেই দিতে চায়, অন্য কোথাও না দিতে চায়?"

মায়ার মুখ আঁধার হইয়া গেল, বলিল, "তা অবিশ্যি, তবে ছেলে কোথায় বিয়ে করতে চায় তাও ত তাদেব একটু দেখা উচিত?"

ইন্দু বলিল, "হিন্দু সমাজের ছেলে, বাপ-মায়ে যেখানে দেবে সেখানে বিয়ে করবে। তাদের আবার মতামত কি? এই যে প্রভাসের ছোট ভাই সুভাষের বিয়ে হল, কে তার মত নিতে গিয়েছিল?"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "সুভাষের বৌ কেমন হয়েছে পিসীমা?"

ইন্দু বলিল, "হয়েছে মন্দ নয়, মেয়ের রং একটু কালো। তা দিয়েছে থুয়েছে বেশ।"

মায়া আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। ইন্দু একটু গড়াইয়া লইবার জন্য নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

বিকালবেলা আবার মায়ার খোঁজ লইতে গিয়া দেখিল, সে উহারই মধ্যে সাজিয়াগুজিয়া, চুল বাঁধিয়া বসিয়া আছে। পিসীকে দেখিয়া বলিল, "বাগানে না বেড়াতে যাবে বলেছিলে, চল না এইবেলা?"

ভাইঝির উৎসাহ দেখিয়া ইন্দু আর উচ্চবাচ্য না করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রায় একতলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে এমন সময় কলেজ ফেরত অজয় আসিয়া উপস্থিত হইল। মায়া তাহাকে দেখিয়া বলিল, "দেখেছ পিসীমা, অজয় কি রকম হঠাৎ লম্বা হয়ে গেল? ক'মাস আগে ত মাথায় আমার চেয়েও ছোট ছিল।"

অজয় বলিল, "ক'মাসই বটে, বেশ কয়েক মাস না? চৌষট্টি বা আশি মাস হবে বোধহয়।"

মায়া বলিল, "কেমন ক'রে যে কথা বলে। চল্ না, আমাদের সঙ্গে একটু বাগানে বেড়িয়ে আসবি?"

অজয় বলিল, "আচ্ছা বেশ, বই-খাতাগুলো রেখে আসি তাহলে।"

মায়া এবং ইন্দু অগ্রসর হইয়া চলিল। বাগানের ভিতর আসিয়া পড়িয়া মায়া বলিল, "কলকাতার ডাক্তার আমায় দেখে কি বলল পিসীমা?"

ইন্দু বলিল, "বিশেষ কিছু হয়নি বলেছে, এই নাইতে খেতে যাবে আর কি।"

মায়া বলিল, "তবে যে তুমি ওর কাছে বলছিলে যে হিষ্টিরিয়া না কি হয়েছে? ছাই জানে তোমাদের ডাক্তার। কক্ষনো আমার হিষ্টিরিয়া হয়নি। হিষ্টিরিয়া হলে ত হাত পা ছোঁড়ে, দাঁতে দাঁতে লাগিয়ে প'ড়ে থাকে। আমি কি তাই করি নাকি?"

ইন্দু বলিল, "ডাক্তারের চেয়ে কি তুই বেশী বুঝিস্? হিষ্টিরিয়া কত রকম হয়।"

এমন সময় অজয় আসিয়া জুটিল। বলিল, 'বাগানটার আজ বড় সৌভাগ্য, তোমার শুভাগমন হয়েছে।"

মায়া বলিল, "আর তোমার শুভাগমন বুঝি খুব ঘন ঘন হয়? এতদিন যে এসেছি, তা ছেলে বাড়ীতে আছে কি নেই, তাই জানি না।"

অজয় বলিল, "তা জানবে কি ক'রে? তোমার গাড়ীখানার সদ্ব্যবহার করতে ব্যস্ত ছিলাম যে? এখন ডাক্তার মিত্র সেখানা নিয়ে স'রে পড়াতে অগত্যা তোমাদের সঙ্গদান করতে এসেছি।"

মায়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার আবার গাড়ী আছে নাকি? কি গাড়ী?"

অজয়ের সব সময় মনে থাকিত না যে মায়া আর সে মায়া নাই। এই প্রশ্নে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "মোটর গাড়ী গো, মোটর-গাড়ী। তুমি ত ঘর ছেড়ে বেরোও না, তাই আমি সেটাকে কাজে লাগাই। এই যে প্রভাসদাটা বেরোচ্ছে। প্রভাসদা, প্রভাসদা!"

ইন্দু দেখিল, মহা মুশকিল। অজয় এইভাবে ডাকাডাকি করার পর সে আর প্রভাসকে বাধা দিতে পারিবে না। তাহা অত্যন্ত বেশী অভদ্রতা হইবে।

যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর চারা নাই, সুতরাং সে নীরবে প্রভাসের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

প্রভাস বেশ বুঝিয়াছিল, ইন্দু তাহাকে মায়ার নিকটে যাইতে দিতে চায় না। কারণটা ঠিক না বুঝিলেও ইহাতে সে মনে আঘাত পাইয়াছিল। সে মায়ার বাল্যবন্ধু, তাহাকে দিয়া উঁহারা কি মায়ার অনিষ্ট আশঙ্কা করেন? তাহা হইলে প্রভাসের এ বাড়ীতে বাস করাই উচিত নয়। মায়ার অনিষ্ট হোক বা না-ই হোক, প্রভাসের নিজের ক্ষতি কিছু কিছু হইতেছিল। অকারণ নিজেকে দুঃখ পাওয়ার পথে দাঁড় করাইয়া লাভ কি?

অজয় ডাকাডাকি করায় সে একটু বিপদে পড়িয়া গেল। না যাইলে অজয় এবং মায়া কি মনে করিবে, এবং যাইলে ইন্দু কি মনে করিবে? একটুখানি অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি, মহা চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছ যে?"

অজয় বলিল, "আসুন না একটু, আমাদের সঙ্গে কয়েক পাক ঘুরে যান। মায়াদির বাগান বোধহয় আপনি ভাল ক'রে দেখেনই নি।"

প্রভাস আর একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, বাগানটা খুবই সুন্দর বটে। প্রথম এসেই ওটা আমি লক্ষ্য করেছি। সবটাই মায়ার তৈরি নাকি?"

মায়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাগানটা তাহার মানে কি? যাহা হউক, প্রভাস যে কাছে আসিয়া কথা বলিতেছে, ইহাতেই সে সুখী হইয়াছিল। এখন পিসীমা তাহাকে সাত তাড়াতাড়ি বিদায় না করিয়া দিলেই হয়।

মায়া সম্বন্ধে প্রভাসের মনোভাবটা এখনও সুপরিস্ফুট হয় নাই, তবু অনেকখানি আগ্রহ যে তাহার ভিতর ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এত কাছে আসিয়া, একটু কথা বলার লোভ সে সংবরণ করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "ছোট বেলা গ্রামের বাড়ীতেও তুমি খুব বাগান করতে, না মায়া?"

মায়ার মুখখানা একেবারে লাল হইয়া উঠিল। সে কি কথার উত্তর দিবে? আবার না দিলে প্রভাস যদি রাগ করিয়া চলিয়া যায়?

সে নতমুখে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, মনে আছে।"

প্রভাস বলিল, "এখন আর সে সব গাছ একটাও নেই, সব ছাগল গরুতে শেষ করেছে।"

ইন্দু বলিল, "বাড়ীঘরই কে দেখে তার ঠিক নেই, ত ফুলের গাছ। আমি মরবার পর ঘরদোর প'ড়ে গেলেও কেউ চেয়ে দেখবে না।"

মায়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "আমায় যদি বাবা যেতে দেন ত আমি গিয়ে থাকি। এখানে আমার একটুও ভাল লাগে না।"

ইন্দু তাড়া দিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তুমি না থাকলে যত খড়ের ঘর, শাক, বেগুন আগ্‌লাবে কে? আর ত সংসারে লোক নেই? মেয়ের যত অনাসৃষ্টি কথা।"

প্রভাস বলিল, "আচ্ছা, আমি তবে একটু ঘুরে আসি।"

এমন সময় হর্ন বাজাইয়া একটা মোটর গেটের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। গাড়ী হইতে নামিল, দেবকুমার। সে বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছিল এমন সময় বাগানের দিকে চোখ পড়ায় সকলকে দেখিতে পাইল। ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। যতই নিকটে আসিতে লাগিল, ততই মুখের ভাব কঠোর ও চোখের দৃষ্টি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। মায়ার আরক্তমুখ, তাহার লজ্জানত দৃষ্টি, এসব কাহার জন্য? শুধু তাহাকে ভুলিয়াই কি যথেষ্ট হয় নাই? আবার একজনকে তাহারই আসনে ইহারই মধ্যে বরণ করিয়া লইতে হইবে? তাহার হৃদয়ে যেন বিষের তীর ফুটিয়া গেল।

দেবকুমার কাছে আসিতেই মায়া চকিত হইয়া ইন্দুর পিছনে গিয়া লুকাইল। অজয় হাসিয়া বলিল, "মায়াদি কত তামাসাই যে দেখাবে? একটা ঘোমটা টেনে দাও।"

মায়া তাহার কথার উত্তর না দিয়া ইন্দুকে বলিল, "পিসীমা, চল আমরা উপরে যাই।"

দেবকুমার কঠিনস্বরে বলিল, "আমিই যাচ্ছি, আর কাউকে যেতে হবে না। আজয়বাবু, আপনার কাকাবাবু কি ফিরেছেন?"

অজয় বলিল, "হ্যাঁ, এই খানিক আগে এসেছেন।"

দেবকুমার হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার আগে প্রভাসের দিকে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, প্রভাস তাহা লক্ষ্য না করিয়াই পারিল না। ভাবিল, "এরপর পাত্‌তাড়ি গুটোতেই হয়, যে রকম বন্ধু দেখছি চারদিকে।"

দেবকুমারের মনে তখন দাবানল জ্বলিতেছিল। পারিলে সে আদিম মানবের মত তখনই প্রভাসের গলা টিপিয়া ধরিত। কিন্তু সভ্যতা যেমন আমাদের অনেক জিনিষ দান করিয়াছে, তেমনই অনেক জিনিষ অপহরণও করিয়াছে। সুতরাং মনের উগ্র হিংস্রতাকে যথাসাধ্য দমন করিয়া দেবকুমার নিরঞ্জনের সন্ধানে চলিয়া গেল।

নিরঞ্জন বেশীর ভাগ সময় নিজের অফিসঘরেই কাটাইয়া দিতেন। ইন্দু না আসা পর্যন্ত অবশ্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনেকটা সময় মেয়ের ঘরে কাটাইতে হইত, কিন্তু এখন আর পারতপক্ষে দোতলায় তিনি যাইতে চাহিতেন না। মায়ার অর্থহীন দৃষ্টি, পরিবর্তিত মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহার বুকের ভিতর যেন জ্বলিয়া যাইত। এ যেন তাঁহার কন্যা নয়, কন্যার মুখোস পরিয়া কে সঙ্ সাজিয়া আসিয়াছে। সারাক্ষণই তাহার খবর লইতেন, প্রত্যেকবার আশা করিতেন সুখবর একটু কিছু শুনিবেন, প্রতিবারেই তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইত। মায়া একই ভাবে আছে শুনিয়াই তাঁহার মনে হইত, দিনের আলো যেন কালো হইয়া গেল। কিন্তু সংসারে আশাই অবিনাশী, আবার দেখিতে দেখিতে মনের কোণে আশার অঙ্কুর জাগিয়া উঠিত। এখনও সময় যায় নাই, হয়ত আর কিছুদিন পরেই পরিবর্তন দেখা দিবে। ডাক্তার মিত্র বলিয়াছিলেন, এরূপ ঘটনার যত ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, তাহার ভিতর সকলেই কোনো না কোনো সময় লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছিল। মায়াই কি একমাত্র পাইবে না? এত বড় দুর্বিষহ দুঃখের জন্য ভগবান্ কি নিরঞ্জনকেই বাছিয়া রাখিয়াছেন?

দেবকুমারের কথা মনে হইলে নিরঞ্জন সত্যই যেন বেদনায় অধীর হইয়া পড়িতেন। তাঁহার নিজের পুত্রসন্তান ছিল না, ভ্রাতার পুত্রদের সাহায্য তিনি যথেষ্টই করিতেন, কিন্তু হৃদয়ের সম্পর্ক তাহাদের সঙ্গে তাঁহার অল্পই ছিল। অজয় বাড়ীতে থাকিত বটে, কিন্তু মাসে একদিনও নিরঞ্জনের সঙ্গে তাহার দেখা হইত কিনা সন্দেহ। দেবকুমারকে জামাতা রূপে পাইবেন, ইহা জানিবার পর, তাহার প্রতি নিরঞ্জনের এমন একটা স্নেহ জন্মিয়া গিয়াছিল যে, নিজেই তিনি ইহার আতিশয্যে বিস্মিত হইয়া যাইতেন। চিরদিনের রুদ্ধ পুত্রস্নেহ এক নিমেষেই এই সুদর্শন যুবককে তিনি নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

মায়ার এই অভাবনীয় রোগ যেন নিরঞ্জনের সন্তান-স্নেহের দুটি অধিকারীকেই সমানভাবে আঘাত করিল। দেবকুমারকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন তিনি ভাবিয়া পাইতেন না। তাহার দুঃখ যে কতখানি, তাহা অন্তত

বুদ্ধির দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিতেন। যৌবনে প্রণয়িনীর প্রেমলাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই, কিন্তু পুরুষের মনে কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা যে এই জিনিষটির জন্য থাকে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। হতভাগা দেবকুমার যে এই অমৃতের স্বাদ পাইবামাত্র চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইতে বসিল ইহার আঘাত যে কতখানি হইয়া তাহার বুকে বাজিতেছে, তাহা নিরঞ্জন ঠিকই উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

শহর হইতে ফিরিয়া তিনি নিজের ঘরে বসিয়া কাগজ উল্টাইতেছিলেন। কাজ করিবার প্রয়োজন যথেষ্ট ছিল, কিন্তু কাজে মন বসাইতে পারিতেছিলেন না। হঠাৎ পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দেবকুমার ঘরে ঢুকিতেছে। তাহার মুখ অস্বাভাবিক রকম উত্তেজিত। নিরঞ্জন একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেবকুমার, আমাকে কিছু বলবে?"

দেবকুমার একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কথা বলিবার শক্তিই যেন তাহার ছিল না। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভাসবাবু কি আপনাদের আত্মীয়?"

নিরঞ্জন একটু উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ প্রশ্ন করছ কেন? না, সে আত্মীয় নয় ঠিক, তবে আমাদের গ্রামের ছেলে, খানিকটা আত্মীয়েরই মত।"

দেবকুমার বলিল, "দেখুন, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি হয়ত অনধিকারচর্চা করছি। কিন্তু প্রভাসবাবুকে আর বেশীদিন এ বাড়ীতে থাকতে দিলে, তাঁকে দিয়ে মায়ার অনিষ্ট হবে।"

নিরঞ্জন ত আকাশ হইতে পড়িলেন। প্রভাসকে তিনি বাল্যকাল হইতে জানেন, অতি সচ্চরিত্র ছেলে সে, তাহাকে দিয়া মায়ার কি অনিষ্ট হইতে পারে? এ পর্য্যন্ত বিবাহও যে করে নাই, দেশের ও দশের কাজ করিবে বলিয়া, তাহার সম্বন্ধে দেবকুমারের এ রকম ধারণা কেন হইল?

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন তোমার এমন কথা মনে হল বল ত? অনধিকারচর্চা নিশ্চয়ই আমি মনে করব না, মায়ার ইষ্ট-অনিষ্ট এখন ত তোমারই সকলের চেয়ে বেশী দেখবার কথা।"

দেবকুমার খানিক কি যেন ভাবিয়া লইল, তাহার পরে বলিল, "আমার মনে হচ্ছে, মায়া নিজের অপ্রকৃতিস্থ মনের একটা খেয়ালে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, এবং তিনি জেনে শুনে সেটার প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তিনি জানেন, অসুখে পড়বার আগে মায়া আমার সঙ্গে 'এন্‌গেজ্‌ড্' হয়েছিল। এখন যদি সেটা সে

ভুলেই গিয়ে থাকে, তাহলেও কোনো ভদ্রলোকের উচিত নয় এর সুবিধা নেওয়া।"

নিরঞ্জন কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। সত্যই যদি এইরূপ ব্যাপার কিছু ঘটিতেছে, তাহা হইলে প্রভাসকে আর এক দণ্ডও এখানে রাখা উচিত নয়। অবস্থাটা এমনিতেই যথেষ্ট জটিল, বাহিরের লোক মাঝে পড়িয়া সেটাকে জটিলতর করিয়া না তুলিলেই ভাল। কিন্তু দেবকুমারের এখন যা মনের অবস্থা, তাহার কথা কি অখণ্ড সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়? ঈর্ষার উগ্ররঙের ভিতর দিয়া এখন সে সমস্ত ব্যাপারটাকে দেখিতেছে, সামান্য কথাবার্তাকে প্রেমালাপ ভাবিয়া বসা তাহার পক্ষে কিছুই বিস্ময়কর নয়। তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া কি প্রভাসকে কিছু বলা চলে?

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে এখনই খবর নিচ্ছি। সত্যি যদি এরকম কিছু ঘ'টে থাকে, তা হলে প্রভাসকে বিদায় করতেই হবে। তবে তাকে আমি অনেকদিন থেকেই জানি, সে এরকম নীচ ব্যবহার করবে ব'লে মনে হচ্ছে না। কিন্তু এসব বিষয়ে ঠিক ক'রে কিছু বলা শক্ত।"

দেবকুমার বলিল, "আপনি পিসীমা আর অজয়বাবুকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখতে পারেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তাই করব। তুমি এ নিয়ে মন খারাপ ক'রো না, যদিই এ ধরণের কোনো মনোভাব মায়ার মনে এসে থাকে তা হলেও অসুখ সারবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা তার মন থেকে চ'লে যাবে।"

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "সেদিন ডাক্তার ওকে দেখে কি বললেন?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তিনিও হিষ্টিরিয়ার কেস্ বলছেন। এরকম কতগুলো কেসের হিষ্ট্রি বললেন, অবশ্য ঠিক ওর মত একটাও নয়।"

দেবকুমার বলিল, "সারবার সম্ভাবনা আছে কিছু বললেন?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আছে ব'লেই ত বলছেন। কিন্তু এসব রোগে চিকিৎসা ত কিছু নেই, সেই হয়েছে মুশকিল। সবই 'নেচারে'র উপর ছেড়ে রাখতে হয়। তিনি বললেন, স্মৃতি যেমন হঠাৎ চ'লে গিয়েছে, তেমনি হঠাৎ ফিরেও আসতে পারে।"

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তবু কিছুই কি করবার নেই? মানুষে তার জন্যে কিছুই করতে পারে না?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আমি যতদূর তাঁর কথা থেকে বুঝলাম, করবার কিছু নেই। তার স্বাস্থ্য ভাল রাখা, তার মন ভাল রাখা, এ সবের চেষ্টা অবশ্য করতে বললেন। তা করাও হচ্ছে যথাসাধ্য। তবে তার মনের এখন যা অবস্থা, তাতে কি তার ভাল লাগে, কি ভাল লাগে না, কিছু বোঝাও যায় না।"

দেবকুমার বলিল, "অন্য কোথাও নিয়ে গেলে হয় না?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "সেটা বারণ করছেন। পরিচিত লোকজনের মধ্যেই সারবার সম্ভাবনা বেশী। তোমাকে যদি অল্পও মনে রাখত, তাহলে ঢের তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারত। ডাক্তার সেই কথা বলছিলেন।"

দেবকুমার চুপ করিয়া রহিল। মায়া যে তাহাকে কিরূপ সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়াছে, তাহা সে অল্প আগেই দেখিয়া আসিয়াছে, সেই জানার তীব্র বেদনায় তখনও তাহার বুকের ভিতরটা টন্‌টন্ করিতেছিল।

খানিক পরে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি আসি তাহলে। আমি এখানে ঘন ঘন এলে যদি কোনো লাভ হয়, তাহলে রোজই আসব। না হলে মায়াকে শুধু শুধু বিরক্ত করতে চাই না। মনে করতে না পারুক, আবার যদি আমার সঙ্গে আলাপ করতে রাজী হয়, তাতেও খানিকটা লাভ আছে।"

নিরঞ্জনের সম্মুখে সে বলিতে পারিল না, কিন্তু মনে মনে তাহার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল। মায়াকে সে হারাইতে পারিবে না, দৈব তাহাকে এমন করিয়া বঞ্চনা কখনও করিতে পারিবে না। প্রয়োজন হয়, আবার সে মায়াকে জয় করিয়া লইবে। তাহার পথে যে দাঁড়াইবে, তাহাকে নির্বিচারে পদদলিত করিতে তাহার কিছুতেই বাধিবে না।

নিরঞ্জন বলিলেন, "ইন্দুকে দিয়ে মায়াকে জানাব এ কথা। তার মত হবে না বোধ হয়, তবু চেষ্টা করা ভাল। প্রভাসের কথাটাও সেই সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

দেবকুমার উঠিয়া গেল। বাহির হইয়া যাইবার সময় মায়া বা প্রভাস কাহাকেও বাগানে দেখিল না।

নিরঞ্জন চিন্তিতভাবে উঠিয়া উপরে চলিলেন। দেবকুমারের অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি কি করিবেন? প্রভাসকে সোজাসুজি বিদায়ই বা করিয়া দেওয়া যায় কি প্রকারে? অথচ পিতা হইয়া কন্যার আসক্তির বিষয়ই বা তিনি একজন যুবকের সহিত কি করিয়া আলোচনা

করিবেন ? ইন্দুকে বলিতে পারেন বটে, কিন্তু সে কি প্রভাসকে ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারিবে ? চিরদিন পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ ঘরে কাটাইয়াছে, এসব ব্যাপারে তাহারা একেবারেই অনভ্যস্ত।

তবু কিছু না করিয়া উপায় নাই। মায়ার ঘর হইতে তখনও অস্ফুট কথার স্বর শোনা যাইতেছিল। নিরঞ্জন বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "ইন্দু আছিস্ নাকি ?"

ইন্দু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "আমাকে ডাকছ মেজদা ?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "একবার নীচে চল্, তোর সঙ্গে কথা আছে একটা।"

মায়া উঁকি মারিয়া দেখিল, মুখে চোখে তাহার একটা অত্যুগ্র কৌতূহলের চিহ্ন। সদা সর্বদা তাহার সন্দেহ যে, বাড়ীর সকলে মিলিয়া তাহার সম্বন্ধে কি একটা ষড়যন্ত্র করিতেছে। বাপের সম্বন্ধে তাহার পল্লীজীবনের সঙ্কোচ আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল, পারতপক্ষে নিরঞ্জনের কাছে সে ঘেঁষিত না। সুতরাং তাহার নামে কি কথা হয় তাহা জানিবার অত্যন্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাহাকে বাধ্য হইয়া নিজের ঘরের ভিতরেই বসিয়া থাকিতে হইল।

ইন্দুকে নীচের লাইব্রেরী ঘরে লইয়া গিয়া নিরঞ্জন বলিলেন, "দেখ্ ইন্দু, তোকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, ভাল ক'রে ভেবে উত্তর দিস্। আজ দেবকুমার আমার কাছে এসে বলল, প্রভাসের ব্যবহার তার মোটেই ভাল বোধ হয় না। তাকে বেশীদিন এখানে থাকতে দিলে মায়ার অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। এরকম কথা কি তোর কোনোদিন মনে হয়েছে ?"

ইন্দু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমিই তোমায় বলব ভাবছিলাম মেজদা, তুমিই জিজ্ঞেস করলে ভালই হল। প্রভাসের মনে কি আছে না আছে জানি না, চালচলন তার ভালই বলতে হবে। কিন্তু মায়ার মাথায় সর্বনেশে খেয়াল চড়েছে, তার মন যেন সারাক্ষণ ওরই দিকে ঝুঁকে আছে মনে হয়। প্রভাস যে সেটা বোঝে না, তাও মনে হয় না। তার উচিত এখনি এখান থেকে স'রে যাওয়া, কারণ তার সঙ্গে মায়ার বিয়ে কোনোদিনই তোমরা দেবে না। কিসের আশায় যে সে ব'সে আছে, সে-ই জানে। মায়ার জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে এলে সে কি আর দেবকুমার ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে যাবে ? আমাদের পরিবারের মেয়ে কখনও তা করবে না।"

নিরঞ্জনের মুখের ভাব কঠিন হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "মায়ার ভাবগতিক বুঝেও যদি প্রভাস ব'সে আছে, তাহলে তার ব্যবহার ভাল বলতে

পারি না। যাক, এ বিষয়ে যা করবার তা আমি করব। মায়া যেন তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করবার কোনো সুবিধা না পায়, সেটা দেখিস্।"

ইন্দু বলিল, "সতর্ক ত সারাক্ষণই আছি। পাঁচজন মাঝে প'ড়ে গোলমাল বাধায়। আজও অজয়টা প্রভাসকে ডাকাডাকি না করলে ও কাছে আসত না। যাক, এরপর ভদ্রতার ধারও ধারব না, কাছে আসতেই দেব না।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "অভদ্রতা করার কিছু দরকার নেই। আমি আজ রাত্রেই তার সঙ্গে কথা বলব। পরের স্টীমারেই যাতে বিদায় হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। মাঝের দুটো দিন সাবধানে থেকো।"

ইন্দু আবার উপরে চলিয়া গেল। মায়ার ঘরের কাছে আসিতেই সে উত্তেজিতভাবে ছুটিয়া আসিয়া ইন্দুর হাত চাপিয়া ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে কি সব মতলব তোমরা আঁটছ শুনি?"

নিরঞ্জনের কথা শুনিয়া অবধি ইন্দুর মনটা উষ্ণ হইয়া ছিল। মায়া যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল। ঠেলা মারিয়া মায়াকে সরাইয়া দিয়া সে তীব্র ভৎর্সনার সুরে বলিয়া উঠিল, "যা যা, সব কথায় তোর দরকার কি? লোকের হাড় জ্বালিয়ে খাচ্ছিস্, আবার তাদেরই দুষছিস্?"

বকুনি শোনা বহুকাল মায়ার অভ্যাস ছিল না। সে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া খানিকটা পিছাইয়া গেল। তাহার পর নিজেও খানিকটা তীব্রকণ্ঠে বলিল, "আমি আবার কার হাড় জ্বালালাম? কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। আমারও কথাতে লোক না থাকলেই পারে।"

সে আর ইন্দুর কাছে দাঁড়াইল না। ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। ইন্দু নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। মনে করিয়াছিল, খানিক পরে সে মায়ার ঘরে উঠিয়া যাইবে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

প্রভাস সেদিন কোকাইন লেকের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক রাত করিয়া ফেলিল। কিছুতেই তাহার আর ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। নিরঞ্জনের বাড়ীর কেহই যে আর তাহাকে ভাল চক্ষে দেখিতেছে না, তাহা সে বুঝিতে পারে। তাহা হইলে আর এখানে থাকার কি প্রয়োজন? কিন্তু যাইবার কথা মনে করিলেই, মন বিমুখ হইয়া যায় কেন? তবে কি মায়ার কাছেই তাহার হৃদয় এতদিন পরে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিল? তাহাও ত স্বীকার করিতে পারে না। অন্যের বাগ্‌দত্তা বধূর প্রতি তাহার অনুরাগ

জন্মিয়াছে মনে করিতে অনুশোচনায় তাহার মন ভরিয়া ওঠে। কিন্তু মায়া কি তাহার হৃদয়-জগতে কোনই বিপ্লব ঘটায় নাই? মায়াকে পুনর্বার দেখিবার আগে সে যেমন ছিল, এখনও কি তাই আছে? তাহাই বা সে স্বীকার করিতে পারে কই?

ভাবিতে ভাবিতে সে বাড়ী আসিয়া পৌছিল। আশা করিয়াছিল, সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গেটের ভিতর ঢুকিবামাত্র তাহার চোখ পড়িল দোতলায় মায়ার ঘরের জানালার উপর। মায়া জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে। কি দেখিতেছে সে? কাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে? নিজেকে আর উত্তেজিত করিতে তাহার ইচ্ছা করিল না, সে ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

নিরঞ্জনের ঘরের দরজা খোলা, তিনি তখনও শুইতে যান নাই। প্রভাসের পায়ের শব্দে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "অনেক রাত হয়ে গেছে, খেয়ে নাও। তোমার সঙ্গে তারপর একটু কথা আছে।"

প্রভাস মনে মনে বলিল, "কি কথা তা ত বুঝতেই পারছি।" সে ঘরে ঢুকিয়া চাদর ছড়ি রাখিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

খাওয়া শেষ হইতে না হইতেই নিরঞ্জন তাহার ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলেন, "তোমাকে আজ যা বলব তাতে 'অফেন্স' নিয়ো না। অবস্থার গতিকে প'ড়ে মানুষকে নানারকম ব্যবহার করতে হয়। আমার মেয়ের অবস্থা ত দেখছ, তার খুব তাড়াতাড়ি সারবার কোনো সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হয় না। তবে যে স্কুল করতে চাইছ মায়ার মায়ের নামে, তা করতে পার। টাকা যা লাগে তা আমি দেব। মায়া সেরে উঠে সব বিষয় পরামর্শ করবে, এর আশায় ব'সে থাকা একান্তই নিরর্থক এখন।"

নিরঞ্জন তাহাকে বিদায় হইতেই বলিতেছেন, প্রভাস তাহা বুঝিল। সে বলিল, "আচ্ছা, কালই তাহলে শহরে গিয়ে টিকিট করবার চেষ্টা করব।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "সাধারণ সময় হলে, তোমাকে ধ'রে রাখতেই চাইতাম। এখন কিন্তু অবস্থা এমন হয়েছে, যে বাধ্য হয়ে আমাকে অভদ্রতাই করতে হল। তুমি আশা করি কিছু মনে করবে না।"

প্রভাস মুখে বলিল, "না, না, কি আবার মনে করব? এ অবস্থায় যা দরকার তা ত আপনি করবেনই।" মনটা কিন্তু তাহার অত্যন্ত মুষড়াইয়া

পড়িল। অনেকখানি যে জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা এই বিদায়ের কথা উঠিবামাত্র বুঝিতে লাগিল।

নিরঞ্জন উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। প্রভাস একবার বাহির হইয়া আসিল, ভাবিল. বাগানে দু-একপাক ঘুরিয়া আসা যাক। ঘুম আসিতেছে না।

বাহির হইবামাত্র সে চমকিয়া উঠিল। সিঁড়ির পাশে কে যেন লুকাইয়াছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া গেল। হলঘরের আলোয় প্রভাস দেখিল, সে মায়া।

৪২

পরদিন সকালে উঠিয়াই প্রভাস শহরে চলিয়া আসিল। সারাদিনের মধ্যে তাহার আর ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না। জাহাজে বার্থ ঠিক করা হইয়া গেলে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দিনটা কাটাইয়া দিবে, হোটেলে কিছু খাইয়া লইবে ইহাই স্থির করিয়াছিল। রাত্রে মায়াকে নীচে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অবধি তাহার মনটা বিকল হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত বাড়ীর হাওয়া যেন রহস্যে আবিল হইয়া উঠিয়াছে। ঐ অপ্রকৃতিস্থা তরুণী কি চায়, কাহাকে চায়? প্রভাসের প্রতি তাহার একটা তীব্র আকর্ষণ আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারে না। বুঝিবার কোনো উপায়ও নাই। প্রভাসের চোখের আড়ালে মায়াকে রাখিবার জন্য সবাই যেন বদ্ধপরিকর। এত ভয় কেন তাহাকে? সত্যই এত ভয়ের কারণ কিছু কি ঘটিয়াছে? প্রভাস নিজের কাছে এখন অস্বীকার করিতে পারে না যে, সে মায়াকে অনেকখানি ভালবাসে। তাহার আশা একেবারেই নাই, তাই জোর করিয়া নিজেকে সে সংযত করিয়া রাখে, না হইলে সমগ্র হৃদয় দিয়াই সে ভালবাসিত। এ ভালবাসা পাগলিনী মায়াকে নয়, যে মায়াকে দেখিয়া সে নারী সম্বন্ধে প্রথম সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মায়াকেই। কিন্তু এখন সে স্মৃতি হারাইয়াছে, বুদ্ধি হারাইয়াছে, তবু প্রভাসের অন্তরে তাহার আসন একই ভাবে বিরাজ করিতেছে।

প্রভাস জানিত, মায়াকে পাইবার কোনো আশাই তাহার সত্য সত্য নাই। এখন কোনো কারণে মায়া হয়ত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু স্মৃতি,

বুদ্ধি ফিরিয়া আসিবামাত্র দেবকুমারের প্রেম তাহাকে গ্রাস করিবে, প্রভাসের অস্তিত্বও সে ভুলিয়া যাইবে। এখনকার যে ভালবাসা তাহা পাগলের প্রলাপ, নিদ্রিতার স্বপ্নের মতই অর্থহীন। তবু এইটুকুই ত জগৎটাকে রঙীন করিয়া তুলিয়াছে। মায়া তাহার কথা ভাবে, তাহাকে স্বামীরূপে চায় এই কথা মনে হইবামাত্র প্রভাসের সমস্ত চেতনা যেন আনন্দে প্লাবিত হইয়া যায়। বাস্তব জগতের জিনিষ এ নয়, ইহার আশ্রয়ে দাঁড়াইবার কল্পনাও সে করিতে পারে না। তবু এক মুহূর্তও সে ইহাকে ভুলিতে পারে না। মায়া বলিতে আজ যাহাকে সে চোখের সম্মুখে দেখিতেছে, কালই সে নিশাশেষের স্বপ্নের মত শূন্যে মিলাইয়া যাইতে পারে, পৃথিবীতে তাহার আর কোনো চিহ্নই থাকিবে না। কিন্তু এই মিথ্যা মায়া বাঁচিয়া থাক, ইহাই কি প্রভাস চায়? ছি, ছি, এত স্বার্থপর সে নয়। মায়ার ঘোরতর অমঙ্গলকে সে নিজের তৃপ্তির জন্য কখনই চায় না। ঈশ্বর তাহাকে যেভাবে জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি দিয়াছিলেন, তাহা অক্ষুণ্ণভাবে আবার ফিরিয়া আসুক, প্রভাসের যা দুঃখ তাহা সে পুরুষের মত বহন করিবে।

নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে সে সারা শহর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল জাহাজে বার্থ সহজেই পাইল, একজনের জায়গা পাইতে প্রায় কোনো কষ্ট হয় না। একবার নিরঞ্জনের অফিসে গিয়া খবরটা তাঁহাকে দিয়া আসিবে মনে করিল। কিন্তু তিনি হয়ত তাহাকে দেখিয়া বিরক্ত হইবেন, ভাবিয়া আর গেল না। দুই-চারিটা ছোটখাট জিনিষ কিনিবার ছিল, বাড়ীর লোকদের জন্য। কোথায় কি পাওয়া যায়, তাহা সে একেবারেই জানিত না। আধঘণ্টায় যাহা পাওয়া যাইত, তাহা কিনিতে তাহার চার পাঁচ ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

বিকাল বেলায় আর কিছু করিবার না পাইয়া সে একটা চীনা হোটেলে ঢুকিয়া ভাল করিয়া খাইয়া লইল। তাহার পর কাছেই একটা সিনেমা হাউস দেখিয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। ছবিখানা ভালই ছিল, দেখিতে দেখিতে নিজের হৃদয়ের ভার অনেকখানিই কমিয়া গেল।

ইন্টারভ্যালের সময় হঠাৎ দেখিতে পাইল, তাহার অনতিদূরেই দেবকুমার বসিয়া আছে। প্রভাসকেও সে দেখিতে পাইল, কিন্তু কথা বলিবার বা কাছে আসিবার কোনো চেষ্টা করিল না। দূর হইতে শুধু একটা নমস্কার করিল। প্রভাসের মনটা আবার যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। চারিদিকে

এত বেদনা কেন? কাহারও শান্তি নাই, সুখ নাই। দেবকুমারের মুখ দেখিয়া মনে হয়, নিরন্তর তাহার বুকে দাবানল জ্বলিতেছে। প্রভাসকে সে নিজের সর্বপ্রধান শত্রু মনে করে, কিন্তু প্রভাসও ত গভীর দুঃখের বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছে। যে এই সকল দুঃখ-বেদনার মূলে, সেই মায়ারই বা সুখ কোথায়? সেও ত আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছে। ভগবান্ এ কি অবস্থার সৃষ্টি করিলেন?

সন্ধ্যার পর নিতান্তই আর কিছু করিবার খুঁজিয়া না পাইয়া সে ফিরিয়া চলিল। আর একটা দিন মাত্র মাঝে। তাহার পর এদেশ আর জীবনে সে দেখিবে না এই মানুষগুলিকেও সম্ভবতঃ আর দেখিবে না। জীবনের একটা অঙ্কের এইখানে যবনিকা-পতন। ইহার পরের জীবন তাহার কেমন হইবে কে জানে?

বাড়ীটা বড়ই নিস্তব্ধ বোধ হইল। নিরঞ্জন তখনও ফেরেন নাই। অজয় আজকাল বেশ রাত করিয়া ফেরে। ইন্দু আর মায়া সম্ভবতঃ উপরের ঘরেই আছে। প্রভাস নিজের ঘরে ঢুকিয়া, বাতি নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। নিরঞ্জনের গাড়ী ফিরিবার শব্দ শুইয়া শুইয়াই শুনিল। খাইবার জন্য একবার তাহার ডাক পড়িল, কিন্তু ক্ষুধা নাই বলিয়া প্রভাস চাকরকে ফিরাইয়া দিল। রাত্রে আর কেহ তাহার বিশ্রাম ভঙ্গ করিল না।

সকালে চায়ের টেবিলে নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাতে খেলে না যে? শরীর ভাল ছিল ত?"

প্রভাস বলিল, "শরীর ভালই ছিল, রাত্রে অনেকগুলো খেয়ে এসেছিলাম ব'লে আর খেলাম না। শেষে জাহাজে চ'ড়ে অসুখ বিসুখ করবে।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বার্থ পেয়েছ?"

প্রভাস বলিল, "পেয়েছি।"

আর বিশেষ কিছু কথা হইল না। ইন্দু চা না খাইলেও রোজ চায়ের টেবিলে আসিয়া বসিত। সে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "কালকেই যাচ্ছ নাকি প্রভাস?"

ইন্দুর উপর প্রভাসের মনে অনেকখানি রাগ জমা হইয়াছিল, সে সংক্ষেপে বলিল, "হ্যাঁ।"

সমস্ত দিন করিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। তাহার জিনিষপত্র অতি সামান্য, আধঘণ্টার মধ্যেই গোছানো হইয়া গেল। স্থির করিল লেকের ধারে

খানিক ঘুরিয়া আসিবে। এখন বেলা সাড়ে তিনটা, সন্ধ্যার পর ফিরিলেই চলিবে, এখানে কিছু করিবার নাই।

একটা চাকরকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, আমি বেড়াতে যাচ্ছি। চা খাব না। আমার জন্তে কেউ যেন ব'সে না থাকে।" বলিয়া সে ছড়ি হাতে বাহির হইয়া গেল।

প্রথমে খুব দ্রুতগতিতে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু ক্রমেই তাহার গতি মন্থর হইয়া আসিতে লাগিল। বিদায়ের মুখে কত যে অসম্ভব চিন্তাই তাহাকে পাইয়া বসিতে লাগিল, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। মায়া যদি আর কোনদিন স্মৃতি ফিরিয়া না পায়, তাহা হইলে কি হয়? তাহার বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট হয় নাই, ইন্দ্রিয়গুলিও বিকল হয় নাই, চেষ্টা করিলে আবার তাহাকে সব শেখানো যায়। আর কিছু না শিখিলেই বা কি? সাধারণ হিন্দু গৃহস্থঘরে যতখানি শিক্ষাদীক্ষা হয়, তাহা মায়ার আছে। স্মৃতি ফিরিয়া না পাইলে মায়া কখনই দেবকুমারকে বিবাহ করিবে না, কারণ সে কায়স্থ এবং বিলাত-ফেরত। তখন কি মায়ার পিতা তাহাকে চিরকুমারী করিয়া রাখিবেন? প্রভাস যদি এ অবস্থায় মায়ার পাণিপ্রার্থী হয়, তাহার প্রার্থনা কি পূর্ণ হইবে না? তাহার সহিত বিবাহ হইলে মায়া কি সুখী হইবে না? সাবিত্রী যদি অকালে পরলোক গমন না করিতেন এবং প্রভাসের পিতামাতা যদি নিরঞ্জনকে লুকাইয়া বিবাহ দিতে রাজী থাকিতেন, তখন কি প্রভাসেরই সঙ্গে মায়ার বিবাহ হইয়া যাইত না? সেটাকে মায়ার পক্ষে অমঙ্গল মনে করিবার কি কারণ আছে? যে ধারায় তাহার জীবন প্রবাহিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, নিতান্ত দৈবগতিকে যেখান হইতে সে বিচ্যুত হইয়াছিল, সেই স্থানেই যদি আবার ফিরিয়া আসে, মন্দ কি? কয়েক বৎসরের স্মৃতি না-হয় না-ই রহিল? পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা খানিকটা মন হইতে মুছিয়াই গেল না-হয়? দেবকুমারের ভালবাসা না-হয় তাহার জীবন হইতে লুপ্তই হইল? সেটা কি এতবড় ক্ষতি? প্রভাস কি দেবকুমারের সমান অন্ততঃ মায়াকে ভালবাসিতে পারিবে না?

প্রভাস ভাবিতে ভাবিতে কোথায় যে চলিতেছিল, তাহার যেন ঠিক ছিল না। যাহা অন্যায়, যাহা স্বার্থ-প্রণোদিত, তাহাই যে স্বাভাবিক, স্নেহ-প্রণোদিত, ইহাই সে নিজের কাছে প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চাহিতেছিল। অবশ্য নিজের কাছে প্রমাণ করিতে পারিলেই যে কিছু লাভ হইবে না তাহা

সে জানিত, তবু নিজের বিবেককে শান্ত করিবার চেষ্টার তাহার অন্ত ছিল না।

এতক্ষণ সে পথ ধরিয়া চলিতেছিল, মধ্যে মধ্যে এক-একটা মোটরকার তাহার পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। মানুষের সঙ্গ প্রভাসের এতটুকুও ভাল লাগিল না, সে পথ ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল এবং হ্রদের ধারে গিয়া ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার চিন্তার ধারা অবাধে বহিয়া চলিল।

কতক্ষণ যে সে বসিয়াছিল, তাহার ঠিকানা নাই। দিনের আলো ম্লান হইতে হইতে কখন তিমির-প্লাবনে ডুবিয়া গেল, কখন আকাশের ঘন নিকষের কোলে তারা ফুটিয়া উঠিল, তাহাও সে খেয়াল করে নাই। নিজের মনের চিন্তাস্রোতে সে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দে চমকিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইল। তাহার বুকের রক্ত যেন তাণ্ডব নৃত্য করিয়া উঠিল, তাহার পর হিম শীতল হইয়া আসিল। মায়া তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীভরা লোকের চোখ এড়াইয়া সে কি করিয়া পলায়ন করিয়াছে, তাহা প্রভাস ভাবিয়াই পাইল না। মায়াকে কি বলিবে, কি করিয়া তাহাকে ফিরাইবে, তাহা কিছুই সে স্থির করিতে পারিল না। এতক্ষণ যত প্রকার মনগড়া যুক্তি দ্বারা নিজেকে সে বুঝাইতেছিল, সমস্তই মায়ার আকস্মিক আবির্ভাবে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

মায়াই প্রথমে কথা বলিল, "আপনি নাকি কালই চ'লে যাচ্ছেন?"

প্রভাস মূঢ়ের মত বলিল, "হ্যাঁ।"

মায়া বলিল, "আমাকে ফেলে যাবেন এই ম্লেচ্ছদের মধ্যে? এখানে আমাকে বাঁচাবার কেউ নেই, বাবা সুদ্ধ আমার শত্রু।"

প্রভাস উঠিয়া পড়িল, বিচলিত ভাবে বলিল, "মায়া, অসুখের ঝোঁকে তুমি কি বলছ, কি করছ তা নিজেই বুঝতে পারছ না। তোমার বাবা কখনও তোমার শত্রু হতে পারেন? তিনি তোমার সকলের চেয়ে বড় বন্ধু, তিনি যা কিছু করছেন, তোমার মঙ্গলের জন্যে করছেন।"

মায়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একটু তীব্রভাবে বলিল, "সবাই খালি বলে অসুখ! কি অসুখ হয়েছে আমার? কই, আমি ত কিছু বুঝি না? বাবা আমার বন্ধু বলছেন? হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে আমি, আমাকে একটা অন্য জাতের বিলাত-ফেরত ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছেন,

এই কি বাপের মত কাজ হচ্ছে? পিসীমা সুদ্ধ এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে। কিন্তু আমার প্রাণ থাকতে তা হতে দেব না, বরং এই জলে ডুবে মরব।"

প্রভাস একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এরকম নিদারুণ অবস্থা সে কোনোদিন স্বপ্নের মধ্যেও কল্পনা করিতে পারে নাই। বাঙালী গৃহস্থঘরের ছেলে, বেশীর ভাগ দিন সে পল্লীগ্রামে কাটাইয়াছে, এ ধরণের জিনিষ নাটক নভেল বা বায়োস্কোপের ছবিতেই মাত্র সে পাইতে পারে। নিজের জীবনে এরকম অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য সে কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিল না। আর এক বিপদ্ এই যে, এ ব্যাপারের জন্য যদিও মায়াই সম্পূর্ণরূপে দায়ী, ধরা পড়িলে সমস্ত দায় ঘাড়ে করিতে হইবে প্রভাসকে। কেহই বিশ্বাস করিবে না যে, মায়া নিজে পলাইয়া আসিয়াছে। কি বিষম অপরাধের বোঝা যে তাহার স্কন্ধে আসিয়া পড়িবে, মনে করিতেই প্রভাসের মুখ কালো হইয়া উঠিল। মায়াকে ভালবাসিয়াছে, ইহাই মাত্র তাহার অপরাধ, কিন্তু মানুষে বিশ্বাস করিবে, সে অপ্রকৃতিস্থা তরুণীকে ভুলাইয়া লইয়া আসিয়াছে, নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য। ভগবান্ তাহাকে এ কি বিপদে ফেলিলেন? কি করিবে সে?

মায়া বলিল, "আপনি যে কিছুই বলছেন না?"

প্রভাস বলিল, "কি বলব আমি বল? তোমার বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কি করতে পারি? তিনি তোমার অভিভাবক, তোমার উচিত তাঁর কথামত চলা। হিন্দুর মেয়ে কখনও স্বাধীন নয় তা ত জান? বাবা, না হয় স্বামী, একজনের অধীন হয়ে তাকে থাকতেই হয়। তোমার এভাবে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসা খুব অন্যায় হয়েছে।" ঠিক এই কথাগুলি তাহার মনের কথা নয়, কিন্তু মায়াকে আর কি সে বলিতে পারে?

মায়া বলিল, "বাবার কথা শুনব? হিন্দুর ছেলে হয়ে আপনি আমাকে জাত-ধর্ম সব খোয়াতে বলেন? এর চেয়ে বিপদ্ আর আমার কি হতে পারে? সাধে কি বেহায়ার মত বেরিয়ে এসেছি?"

প্রভাস চুপ করিয়া রহিল। ভয়ে এবং অস্বস্তিতে তাহার নিঃশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছিল। কি করিয়া ইহাকে ফিরানো যায়?

মায়াকে ভালবাসিয়া শেষে সে-ই কি তাহার নামে একটা মিথ্যা কলঙ্কের সৃষ্টি করিবে? এখানে বাঙালী সমাজ কিরূপ তাহা সে জানে না, কিন্তু দেশের সমাজ সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা উত্তম রকমই ছিল। সেখানে এই ধরণের কথা প্রচার হইলে, তাহার যে কি অর্থ দাঁড়াইবে, তাহাও সে জানে।

খানিক ভাবিয়া বলিল, "তুমি বাড়ী ফিরে যাও মায়া। এমন সময়ে এখানে আসা তোমার উচিত হয় নি। লোকে শুনলে নিন্দে করবে।"

মায়া বলিল, "করুক গে। আপনি কথা দিন, আমাকে ঐ ব্যারিস্টারের হাত থেকে বাঁচাবেন, তা না হলে আমি যাব না।"

প্রভাস অনুনয়ের স্বরে বলিল, "আমাকে কেন এর ভিতর জড়াচ্ছ মায়া? আমি ত কাল চ'লে যাচ্ছি। আমায় যেতে দাও, মিথ্যা তোমার নামে একটা অপবাদ সৃষ্টি করতে দিও না মানুষকে।"

মায়া কাঁদিয়া ফেলিল। ঘাসের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি যাব না, আমি কিছুতেই যাব না।"

দূরে এই সময় মোটরের হর্ন তীব্র স্বরে বাজিয়া উঠিল। দুইখানা গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতেছে, দেখা গেল। একটি অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল, আর একটা মায়া এবং প্রভাসের খানিক দূরে পথের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল।

মায়া বলিল, "ঐ আমাকে ধরতে আসছে। আমি কি করব?"

প্রভাস হতাশভাবে বলিল, "করবার কিছুই নেই, ওদের সঙ্গে যাও। আমার যা করবার তা আমি করব।"

গাড়ী হইতে নামিয়া একজন লোক দ্রুতপদে তাহাদের দিকে আসিতেছে দেখা গেল। প্রভাস চিনিল, দেবকুমার। পৃথিবীর আর যে কোনো মানুষকে দেখিলে এই সময় প্রভাসের কিছু কম অপ্রতিভ লাগিত, কিন্তু দেবকুমারকে দেখিয়া তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল যে, হ্রদের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। দেবকুমার তাহাকে কি যে ভাবিতেছে, তাহা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। সে নিজে হইলেই কি অন্য কিছু মনে করিত? একমাত্র ভগবানের চোখে সে নির্দোষ, কিন্তু মানুষের কাছে সে নির্দোষিতা সে কিছুতেই প্রমাণ করিতে পারিবে না।

দেবকুমার নিকটে আসিয়া তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিল, "বেশ জমিয়ে তুলছিলেন, কিন্তু আমার কথাটা বোধহয় ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি, তাই প্লটটা মাটি হয়ে গেল।"

প্রভাস কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু তাহার গলা দিয়া স্বর বাহির হইল না। দেবকুমার বলিয়া চলিল, "আইনতঃ আমি এখনও আপনাকে শাস্তি দিতে পারি না। যদিও 'ময়ালি' আমার অধিকার স্বামীর অধিকারেরই

সমান। কিন্তু মায়ার সামনে কিছু করতে চাই না, পরে আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে। এস মায়া।"

দেবকুমারকে দেখিয়াই মায়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে ডাকিবা-মাত্র সে চীৎকার করিয়া লেকের দিকে ছুটিয়া গেল এবং মুহূর্ত মাত্রের মধ্যেই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

প্রভাস ও দেবকুমার দুজনেই জলে নামিয়া পড়িল। মিনিটখানিক পরে, মায়ার অচেতন দেহ বহন করিয়া দেবকুমার উঠিয়া আসিল। তারার আলোয় ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার মুখ দেখিবার চেষ্টা করিল, ব্যাকুলভাবে ডাকিল, "মায়া, মায়া।"

মায়া সম্পূর্ণ অচেতন, দেবকুমারের ডাকে কোনো সাড়া দিল না। নিজের বলিষ্ঠ বাহুতে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া দেবকুমার দ্রুতপদে মোটরের দিকে চলিয়া গেল। প্রভাসের দিকে আর ফিরিয়াও চাহিল না।

প্রভাস কিছুক্ষণ অন্ধকারে একলা দাঁড়াইয়া রহিল। অপমান ও বেদনায় তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। অন্ধকারে কোথায় যে সে মিশিয়া গেল, তাহাকে আর দেখা গেল না।

৪৩

মায়াকে লইয়া দেবকুমার ফিরিয়া আসিবামাত্র বাড়ীতে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। নিরঞ্জন অন্য একটা গাড়ীতে কন্যার সন্ধানে বাহির হইয়া-ছিলেন, তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ এই গাড়ীটা ছুটিল।

ইন্দু, আয়া, চাকরবাকর সকলে দরজার কাছে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। দেবকুমার অচেতন মায়াকে লইয়া নামিয়া পড়িল, ইন্দুকে সামনে দেখিয়া বলিল, "পিসীমা, মায়া ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, এখনি উপরে নিয়ে যেতে হবে।"

ইন্দু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "এ যে ভিজে চুব্ চুব্ করছে। জলে পড়ল কি ক'রে?"

দেবকুমার একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিল, "সবই বলছি, আগে উপরে নিয়ে যেতে দিন। না হলে ঠাণ্ডা লেগে শেষে নিউমোনিয়া হয়ে দাঁড়াবে।"

ইন্দু এবং আয়া তাড়াতাড়ি উপরে ছুটিয়া গেল মায়ার বিছানা ও কাপড়-চোপড় ঠিক করিতে। দেবকুমার মায়াকে লইয়া উপরেই চলিল। উত্তেজনায় তাহার নিজের শরীর কাঁপিতেছিল কিন্তু মনের জোরেই সে দেহটাকে চালাইয়া লইয়া গেল। মায়ার জন্য যাহা দরকার তাহাতে ত্রুটি না হয়। এই কয়েকটা দিনের মধ্যে তাহার জীবনের উপর দিয়া এমন প্রলয় ঝড় বহিয়া গিয়াছে যে, পৃথিবীর উপরেই তাহার বিতৃষ্ণা ধরিয়া গিয়াছে। তবু কুহকিনী আশা তাহাকে বিশ্রাম দেয় না। হয়ত সে আলেয়ার পিছনে ছুটিতেছে, কিন্তু থামিবার উপায় তাহার নাই।

মায়ার মুখ তখনও তাহার বক্ষে সংলগ্ন রহিয়াছে। ক্ষণিকের দুর্বলতা একবার তাহাকে অভিভূত করিল, কিন্তু তখনই সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। মায়াই বটে, কিন্তু এ কি তাহার প্রেয়সী, তাহার প্রেমময়ী মায়া? সে কি আর এ জগতে আছে? আর কোনো দিন কি সে ফিরিবে? না, ইহার পর এই মায়ার রূপধারিণী মরীচিকাই তাহাকে অসহ্য জ্বালায় উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিবে?

সে মায়ার ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে শয্যায় শোওয়াইয়া বলিল, "পিসীমা, তাড়াতাড়ি এর ভিজে কাপড় সব ছাড়িয়ে দিন। আমি নীচে গিয়ে ডাক্তারকে আসবার জন্যে টেলিফোন করছি। আপনার মেজদাও এখান এসে পড়বেন, তাঁকে ডাকতে লোক গিয়েছে।"

অনেক কথাই ইন্দুর ঠোটের ডগায় আসিয়া জমা হইতেছিল। কিন্তু দেবকুমার তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ না দিয়াই তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেল। ইন্দু এবং আয়া মিলিয়া তখন অচেতন মায়ার শুশ্রূষায় লাগিল। কিন্তু জ্ঞান ফিরিয়া আসার কোনো লক্ষণই মায়ার মধ্যে দেখা গেল না।

ইন্দু একবার ভীতভাবে বলিল, "হ্যাঁ রে আয়া, মেয়ে ত একেবারে চোখ চায় না? ডাক্তার এলে যে বাঁচি।"

আয়া ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলিল, "ডরো না পিসীমা, আচ্ছা হয়ে যাবে। আগেও ঐরকম হল।"

এমন সময় নীচে অনেক লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল। মিনিট দুই পরে নিরঞ্জন উপরে উঠিয়া আসিলেন। দেবকুমারও উপরে আসিল, তবে সে মায়ার ঘরে ঢুকিল না।

নিরঞ্জন আসিয়া মায়ার পাশে বসিলেন। তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "একবারও চোখ চায়নি নাকি?"

ইন্দু বলিল, "না মেজদা। এইভাবেই আছে। ডাক্তার এখনি কি আসবে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আসতে ত ব'লে দিয়েছি। যাক, ভয় পাস্‌নে। সেবারেও অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল। অন্য কোনো ক্ষতি না হয়ে থাকে, তাহলেই ঢের। আচ্ছা, বোস্ এখানে, আমার একটু কথা আছে দেবকুমারের সঙ্গে।"

দেবকুমারকে নিজের শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া নিরঞ্জন বলিলেন, "তুমি কাপড় ছেড়ে নাও, আমি অফিস ঘরে আছি।"

কয়েক মিনিট পরে দেবকুমার আসিয়া অফিস ঘরে ঢুকিল। নিরঞ্জন বলিলেন, "বোস। মায়াকে তুমি কোথায় পেলে?"

দেবকুমার বলিল, "লেকের ধারে।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল কেন কিছু বুঝতে পারলে? বেশীক্ষণ জলে ছিল না ত?"

দেবকুমার বলিল, "না, বেশীক্ষণ ছিলেন না। পড়বামাত্র তুলতে পেরেছিলাম। কেন যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তা জানি না। বোধ হয় আমি ডাকাতে ভয় পেয়েছিলেন।"

নিরঞ্জন একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভাস সেখানে ছিল?"

দেবকুমার সংক্ষেপে বলিল, "হ্যাঁ।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথায় গেল?"

দেবকুমার বলিল, "তা বলতে পারি না, আমি তখন মায়াকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম।"

নিরঞ্জন চুপ করিয়া রহিলেন। দেবকুমার বলিল, "আমায় একটু পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে, আপনার ড্রাইভারকে ব'লে দেবেন। এত রাত্রে ট্যাক্সি বা বাস্ কিছুই হয়ত পাওয়া যাবে না।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আজ আর নাই বা গেলে? আমি তোমার বাবাকে ফোন ক'রে দিচ্ছি। ডাক্তার আসুক, সে আবার কি বলে দেখি। যা অস্বাভাবিক অসুখ, কখন কি 'টার্ন' নেবে তার ঠিকানাই নেই। হয়ত রাত্রেই জ্ঞান হবে, তখন তোমার দরকার হতে পারে।"

দেবকুমার বলিল, "বেশ, আমি তাহলে বাবাকে ফোন ক'রে দিই," বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিরঞ্জন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন নানাকথা। প্রভাসের চিন্তাও একবার মাথায় আসিল। কি করা যায়? সে যাহাই করিয়া থাকুক, সে তাঁহার গৃহে অতিথি, এক গ্রামের মানুষ। সে কোনো অপরাধ করিয়াছে বলিয়াও নিশ্চিত প্রমাণ নাই। তাঁহার কন্যাকে সে ভালবাসে, অন্যের বাগ্‌দত্তা জানিয়াও ভালবাসে, ইহাই তাহার অপরাধ। কিন্তু এই ধরণের অপরাধ অনেক মানুষেই করে এবং শাস্তি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পায় না।

কিন্তু দেবকুমারকে তিনি কিঞ্চিৎ ভয় করিতেন। সে যে-প্রকৃতির ছেলে, তাহাতে এখন প্রভাসকে তাহার সামনে আসিতে দেওয়া সুবিবেচনার কাজ হইবে না। বাড়ীতে একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেলে সেটা অত্যন্তই অশোভন ব্যাপার হইবে। দেবকুমারের দৃঢ়বিশ্বাস যে প্রভাস অপরাধী। সে যে অপরাধী নয় তাহা একমাত্র প্রমাণ করিতে পারে যে, ভগবান্ তাহার জ্ঞান হরণ করিয়া লইয়াছেন। কোনোদিন সে জ্ঞান পূর্ণভাবে ফিরিবে কি না কেহই বলিতে পারে না।

অনেক ভাবিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন এবং নিজের ড্রাইভারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাকে আবার গাড়ী লইয়া লেকের ধারে যাইতে বলিলেন। প্রভাসকে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে তাঁহার শহরের অফিসগৃহে পৌঁছাইয়া দিতে বলিলেন। তাঁহার জিনিষপত্র সকালে সেখানে পাঠাইয়া দিলেই হইবে। ড্রাইভার গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল। দেবকুমার এই সময় টেলিফোন করিয়া ফিরিয়া আসিল, বলিল, "ডাক্তারের ত এতক্ষণে আসা উচিত ছিল।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "এসে পড়বে, দূর ত কম নয়? সেবারেও মায়া অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল, ভয় পাবার কোনো দরকার নেই।" দেবকুমার চুপ করিয়া রহিল। সেই অসহনীয় পুলকময় রাত্রি, তাহার পর সেই অসহ্য যন্ত্রণাময় প্রভাতের স্মৃতি তাহার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। পৃথিবীর মানুষ হইয়া সে সেদিন অমরাবতীর স্বাদ পাইয়াছিল, নরক-যন্ত্রণা কাহাকে বলে তাহাও জানিয়াছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ দিনটার স্মৃতি তাহার মনে থাকিয়া যাইবে।

বাহিরে মোটরের হর্নের শব্দে নিরঞ্জন উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন,

"এল বোধ হয়, দেখি।" দেবকুমারও তাঁহার পিছন পিছন বাহির হইয়া আসিল।

ডাক্তার নামিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল আবার? কোনো নূতন 'টার্ন' নিল নাকি?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "একটা accident হয়ে আবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে, এখন পর্যন্ত জ্ঞান হয়নি।"

ডাক্তার বলিলেন, "চলুন, দেখি উপরে।" নিরঞ্জন বলিলেন, "চলুন, দেবকুমার তুমিও এস।"

দেবকুমার মনে মনে নিরঞ্জনের সুবিবেচনার অনেক প্রশংসা করিয়া উপরে চলিল। মায়ার শয়নকক্ষে ঢুকিতে তাহার কেমন যেন সঙ্কোচবোধ হইল। সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার মায়াকে খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "এখনও ঘুমিয়ে আছেন মনে হচ্ছে। একবারও কি তাকাননি?"

ইন্দু বলিল, 'একবার মাত্র তাকিয়েছিল, কিন্তু তখনি আবার চোখ বুজে ফেলল।"

ডাক্তার বলিলেন, "থাক, এখন ঘুমোতেই দিন। আমার ত মনে হচ্ছে না যে ভয়ের কোনো কারণ আছে। সকালে খবর নেব, ভালই থাকবেন বোধ হয়।"

দেবকুমার কথাটা শুনিতে পাইল, কিন্তু আশা করিতেও তাহার ভয় করিতেছিল। এতখানি দুঃখের অবসান কি অত সহজে হইতে পারে?

ডাক্তার নামিয়া চলিলেন। ইন্দু বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "রাত ত এক প্রহর হতে চলল, এখন অবধি কারো খাওয়া-দাওয়া নেই। মেজদা চল, দেবকুমার তুমিও এস। মায়ার কাছে আয়া খানিক বসুক, আমি তোমাদের খাইয়ে আসি।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তুই কিছু খাবি না?"

ইন্দু বলিল, "রাতে খাওয়া ত অভ্যাস নেই? জোর ক'রে খেলে সারারাত অস্বোয়াস্তিতে আর ঘুমোতে পারব না।"

সকলে নীচে খাইবার ঘরে গিয়া বসিলেন। ছোকরা এবং ঠাকুর মিলিয়া পরিবেশন করিতে লাগিল। সমস্ত দিনের উত্তেজনার পর কথা বলিতে কাহারও বিশেষ ইচ্ছা করিতেছিল না। দেবকুমার একবার খালি জিজ্ঞাসা করিল, "আমি হঠাৎ এসে জুটলাম, কম পড়বে না ত?"

নিরঞ্জন শুধু বলিলেন, "না না, কম কেন পড়বে? খাবার ত দুতিন জনের মত রয়েছে।"

একরকম নীরবেই সকলে আহার শেষ করিল। নিরঞ্জন চাকরকে ডাকিয়া দেবকুমারের শুইবার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন। তাহার পর ইন্দুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমি শুতে যাচ্ছি, বড় বেশী ক্লান্ত লাগছে। আজ তুই মায়ার ঘরেই থাকিস্। কিছু দরকার হলে তখনি আমাকে খবর দিস্, ঘুমিয়ে আছি ব'লে যেন ব'সে থাকিস্ না।"

ইন্দু বলিল, "তা ডাকব বৈ কি? অসুখ-বিসুখের সময় কি আর অত বিচার করলে চলে?" সে উপরে উঠিয়া গেল।

দেবকুমার তাহার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া খাটের উপর বসিয়া রহিল। ঘুম তাহার একেবারেই আসিতেছিল না। উপরের তলা হইতে কোনো সাড়া পাওয়া যায় কিনা, তাহারই আশায় নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন সে উৎকর্ণ হইয়া ছিল। কি যে সে আশা করিতেছিল, তাহা নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। কিন্তু উপরতলা হইতে কোনই সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া ক্লান্ত হইয়া, দেবকুমার অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

নিরঞ্জন তাঁহার গাড়ী না ফেরা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেও পারিতেছিলেন না। প্রভাসের জন্য একটা দুশ্চিন্তা তাঁহার লাগিয়াই ছিল। গাড়ী যখন ফিরিল, তখন রাত প্রায় একটা। নিরঞ্জন তখনও জাগিয়া ছিলেন। গাড়ীর শব্দ শুনিয়াই তিনি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ড্রাইভারের কাছে যে খবর পাইলেন, তাহা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। সে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করিয়াও প্রভাসের কোনো চিহ্ন দেখিতে পায় নাই। গাড়ী রাখিয়া মাঠের মধ্যে নামিয়াও দেখিয়াছে। কিন্তু কোথাও খোঁজ পায় নাই। তবে ফিরিয়া আসার মুখে একটা চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, সে অনেক রাত্রে শহর হইতে মদ খাইয়া ফিরিতেছিল। তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছে, একজন বাঙালীকে সে শহরের দিকে যাইতে দেখিয়াছে। ড্রাইভার খানিক দূর গাড়ী লইয়া গিয়াও কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পায় নাই।

নিরঞ্জন অগত্যা তাহাকে তখন বিদায় করিয়া দিলেন। রাত্রির ভিতরে আর কিছু করিবারও উপায় নাই। মায়া যদি ভাল থাকে, তাহা হইলে

সকালে স্টীমার ঘাটে একবার খোঁজ করিবেন। জিনিষপত্রও তাহার জাহাজ-ঘাটে পাঠাইয়া দিবেন।

ঘুমাইবার আগে একবার উপরে গিয়া মায়াকে দেখিয়া আসিলেন। সে তখনও গভীর নিদ্রায় অভিভূত। ইন্দু নীচে বিছানা পাতিয়া শুইয়া আছে, তাহারও চোখে ঘুম নাই। একখানা ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া বুড়ী আয়া প্রবল নাসিকাধ্বনি সহকারে নিদ্রা যাইতেছে।

নিরঞ্জন কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেলেন।

৪৪

ইন্দু অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকিয়া পরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মস্তিষ্ক অত্যন্ত উত্তেজিত থাকায় তাহার নিদ্রা গভীর হইতে পারে নাই। ঘুমের মধ্যে সে ক্রমাগত ছটফট করিতেছিল, নানা ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিতেছিল।

একবার স্বপ্ন দেখিল, বাড়ীতে সে আর মায়া ভিন্ন কেহই নাই। মায়া প্রাণপণে জানলা দিয়া লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে, ইন্দু তাহাকে টানিয়া রাখিবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতেছে। ইন্দুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, "যাক, ওটা স্বপ্নই, কিন্তু যা পাগল নিয়ে কারবার, সত্যি হতেই বা কতক্ষণ? জানলাগুলো বন্ধ ক'রেই দি বাপু।"

সে উঠিয়া জানলাগুলি বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল। একটা জানলা বন্ধ করিতেই বড় বেশী শব্দ হইল। "ইস্, মেয়েটা না উঠে পড়ে", বলিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই সে দেখিল মায়া সত্য সত্যই উঠিয়া পড়িয়াছে। শুধু ঘুমই যে তাহার ভাঙিয়াছে তাহা নয়, সে যেন অত্যন্ত ভীত ও চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

ইন্দু তাড়াতাড়ি মায়ার কাছে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে রে? ভয় পেয়েছিস নাকি?"

মায়া কেমন একভাবে ইন্দুর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমা, তুমি এখানে কি ক'রে এলে?"

ইন্দু একটু অবাক্ হইয়া বলিল, "আমি ত এখানেই আজ শুয়েছিলাম। তুই তখন ঘুমিয়ে ছিলি, তাই জানতে পারিসনি।"

মায়া কেমন একভাবে ইন্দুর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি রেঙ্গুনে এসে জুটলে কি ক'রে? কাল অবধি ত তোমার আসার কোনো খবর পাইনি?"

ইন্দু এতক্ষণে ব্যাপারটা একটু বুঝিতে পারিল। মায়ার আবার একটা কিছু মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এতদিন যে ইন্দু এখানে আছে, রোজই তাহার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হইতেছে, তাহা মায়া মনে করিতে পারিতেছে না। কিন্তু কি করিয়া সে একথা মায়াকে বুঝাইবে? বুঝাইতে গেলে আরও কিছু বিপদ্ ঘটিবে না ত? ইন্দু কি বলিবে বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মায়া ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল, হঠাৎ বলিল, "ঘরটা কেমন যেন অগোছাল আর নোংরা লাগছে। কি যে একটা হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না। পিসীমা, দেখ ত মায়ের ছবিটার পিছনের ফিতে ঢিলে হয়ে গিয়েছে কি না?"

ইন্দু আগাইয়া আসিয়া বলিল, "কই, না ত? ফিতে ত ঠিকই আছে। ফিতে আলগা হলে ত ছবিখানা ঝুলে পড়ত।"

মায়া বলিল, "আমার সব যেন কেমন অদ্ভুত লাগছে। আয়া কোথায়, তাকে ডাক ত?"

ইন্দু তাড়াতাড়ি গিয়া আয়াকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। সে ছুটিয়া আসিতেই মায়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "দিন দিন তুই কি হচ্ছিস্ বল্ দেখি? ঘরদোরের কি ছিরি হয়েছে? আমি একদিন যদি না দেখি, অমনি সব লণ্ডভণ্ড। তোকে দিয়ে কাজ চালানো দেখছি দায় হয়েছে।"

আয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। হঠাৎ কোথাও কিছু নাই, দিদিমণি তাহাকে এমন বকিতে আরম্ভ করিল কেন? কিন্তু সে বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার মানুষ নয়। কাংসকণ্ঠে বকিতে আরম্ভ করিল, "আরে হাম্ ক্যা করনা? তুম্হি ত ঘরমে ঘুষনে নহি দেতা তো কৈসে ঘর সাফ্ করনা?"

মায়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "যা, যা, ষাঁড়ের মত চীৎকার করতে হবে না। আর তুই সুদ্ধ এখানে এসে শুয়েছিস কেন? বাড়ীসুদ্ধর কি আর শোবার জায়গা ছিল না?"

ইন্দু দেখিল ব্যাপারটা ক্রমেই ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। মায়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, এবং তাহাতে বেশী করিয়া বিরক্ত হইতেছে। সে

নিজে যখন ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিবে না, তখন অন্ত কাহাকেও ডাকা উচিত। নিরঞ্জনকে ডাকিবার জন্ত বাহির হইতে যাইবে, এমন সময় মায়া বলিল, "আচ্ছা পিসীমা, কি ক'রে তুমি হঠাৎ এসে জুটলে বল না? কাল ত স্টীমার আসবার দিন ছিল না?"

ইন্দু বলিল, "আমি সব ভাল ক'রে গুছিয়ে বলতে পারব না বাছা, আমি তোর বাবাকে ডেকে আনছি, সেই সব গুছিয়ে বলবে।"

মায়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল, বলিল, "বাবাকে ডাকবে? আচ্ছা ডাক।" আয়ার দিকে ফিরিয়া বলিল, "এই, আমার ব্লাউস, শাড়ী আর পেটিকোট দে ত? ঘুম আর হবে না, একেবারে কাপড় ছেড়ে নিই। চারটে বেজে গেছে, না?"

আয়া বলিল, "পিসীমা, চাভি দেও ত?"

মায়া তাড়া দিয়া বলিল, "চাবি কি হবে? কাল বিকেলে যে শাড়ী পরেছিলাম, সেটা কি হল? আর এমন চমৎকার শাড়ীখানাই বা আমার অঙ্গে উঠল কখন? সবই কি অদ্ভুত!"

ইন্দু বলিল, "তোকে কি ক'রে যে কি বোঝাব জানি না। তুই ভাবছিস কাল শুতে গিয়েছিলি, মাঝরাতে জেগে উঠেছিস্, তা মোটেই নয়। মাঝে অনেক কাণ্ড ঘ'টে গিয়েছে। আমি গুছিয়ে বলতে পারব না ব'লেই না মেজদাকে ডাকতে চাইছিলাম?"

মায়া খাট ছাড়িয়া নামিয়া পড়িল। আলনার কাছে গিয়া যে সব কাপড় চোপড় সেখানে দেখিল, তাহাতে তাহার বিস্ময় আরো বাড়িয়া গেল। বলিল, "তা হবে, একটা কিছু গোলমাল হয়েছে তা বুঝতেই পারছি। তুমি বাবাকেই ডাক পিসীমা, আমার বড় অসোয়াস্তি লাগছে।"

ইন্দু বাহির হইয়া গেল। মায়া চাবি লইয়া আলমারী হইতে নিজের প্রয়োজন মত কাপড় বাহির করিতে লাগিল। আয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যারে, কি সব গণ্ডগোল পেকে উঠেছে বল্ ত? কি হয়েছিল?"

আয়া গুছাইয়া কিছু বলিতে পারিল না। শুধু বলিল, "বেমার গির গিয়া, আম্মা।"

মায়া আর কিছু না বলিয়া কাপড় লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। মুখ হাত ধুইয়া, কাপড় বদলাইয়া ফিরিয়া দেখিল নিরঞ্জন ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন।

. কম্পস্বরে তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বল দেখি বাবা? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। আয়া বলছে আমার অসুখ করেছিল, কই আমার ত কিছু মনে পড়ছে না?"

নিরঞ্জন কন্যাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছি মা। বেশী উত্তেজিত হ'য়ো না, বেশী মনও খারাপ ক'রো না। ভগবানের কৃপায় আমাদের দুঃখের দিন হয়ত শেষ হয়ে গেল। তুমি বোস।"

মায়া গিয়া চেয়ারে বসিল। নিরঞ্জন বলিলেন, "যেদিন অসুখ হয়, সেই রাত্রে শুতে যাবার আগের কোনো ঘটনা কি মনে পড়ে?"

মায়ার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস ঘনাইয়া উঠিল, তাহার পর মুখখানা একেবারে সাদা হইয়া গেল। বলিল, "মনে পড়ে বাবা। 'এক্সেলসিয়ার' থেকে ফিরে এসে খাটের উপরেই অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে ছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল মায়ের ছবির ফ্রেমের ভিতর থেকে ছবিখানা যেন বেরিয়ে নেমে আসছে, তারপর আর কিছুই মনে পড়ে না।"

নিরঞ্জন দেখিলেন, মায়ার হাত কাঁপিতেছে, গলার স্বরও কাঁপিয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "ভয় পেয়ো না মা, জগতে অনেক জিনিষ ঘটে যার মানে আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু ভয়ের কি আছে? তোমার মা সংসারে এক তোমাকেই ভালবাসতেন, তাঁকে দিয়ে তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না।" মায়ার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিরঞ্জন কি যে বলিবেন, ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। মায়াকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে দেওয়া উচিত, কিন্তু বুঝাইতে গেলে সে কি বেশী ব্যথা পাইবে? যাহা হউক, তাহাকে এই সংশয়ের দোলায় দুলিতে দেওয়া ঠিক হইবে না। তিনি মনস্থির করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঐটা দেখার পরই তুমি অজ্ঞান হয়ে যাও, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তোমার জ্ঞান হয়নি। যখন জ্ঞান হল তখন দেখা গেল, তোমার 'মেমরি' অনেকখানি ঝাপসা হয়ে গিয়েছে, রেঙ্গুনে যে কয়েক বৎসর কাটিয়েছ, তার কোনো স্মৃতি তোমার নেই।"

মায়া তড়িৎস্পৃষ্টের মত চমকাইয়া সোজা হইয়া বসিল। দারুণ বিস্ময়ে ও উত্তেজনায় তাহার মুখের চেহারাই অন্যরকম হইয়া গেল। কম্পিতকণ্ঠে

জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি বাবা, কিছু মনে ছিল না? আমাকে নিয়ে তাহলে চলত কি ক'রে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কি ক'রে আর চলবে মা? খুবই মুশকিল হত। তোমার ধারণা হয়েছিল, তোমার মায়ের মৃত্যুর পরে সবে তুমি এখানে এসেছ, সেই ভাবেই তুমি চলতে, কথা বলতে। তোমাকে দেখবার লোক ছিল না ব'লে তখন ইন্দুকে আনালাম।"

মায়া কিছু বলিল না, নিরঞ্জন একটু থামিয়া বলিলেন, "তার সঙ্গে প্রভাসও এসেছিল।"

মায়া নিরুৎসাহভাবে বলিল, "প্রভাসদা আসবে বলেছিল বটে স্কুলের বিষয় আলোচনা করতে।" প্রভাসের বিষয় সে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না।

খানিকক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়া মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, এখানকার কাউকেই কি আমি চিনতে পারতাম না?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "না মা।"

মায়া মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার ভাবান্তরের কারণ নিরঞ্জন ঠিকই বুঝিতে পারিলেন। অন্য কথা পাড়িলেন। ইন্দুকে বলিলেন, "আর ত রাত নেই, এরপর একটু চা-টা খাওয়ার ব্যবস্থা করলে হয়।"

ইন্দু বলিল, "আচ্ছা, চাকর-বাকরগুলো উঠেছে বোধ হয়, না উঠে থাকে ত তুলে দিচ্ছি," বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

ইন্দু বাহির হইয়া যাইতেই মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, এই রকম অবস্থায় আমার কতদিন গিয়েছে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "দুমাস প্রায় হতে চলল।"

মায়া আর কিছু বলিল না। কি যেন বলিবার ইচ্ছায় তাহার ঠোঁট বারবার কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু পিতার সম্মুখে সঙ্কোচ বোধ হইল বলিয়াই হয়ত শেষ পর্যন্ত কিছু বলিতে পারিল না।

পূর্বের আকাশ ক্রমে স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছিল, এখন তাহাতে প্রথম অরুণরেখা দেখা দিল। নিরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আমি তাহলে নীচে যাই মা, তুমি ঘুমোতে চাও কি? না, তোমারও চা দিতে বলব?"

মায়া বলিল, "আমার ঘুম আর হবে না বাবা। তুমি যাও, আমি একটু পরে গিয়েই চা খাব।"

দেবকুমার যে এখানে আছে, তাহা মায়াকে বলা উচিত কি না নিরঞ্জন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিছু পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিবেন স্থির করিয়া তিনি নীচে নামিয়া গেলেন।

মায়া অনেকক্ষণ একই ভাবে বসিয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল। চারিদিক্ নীরব, নিস্তব্ধ। ফিরিয়া আসিয়া সাবিত্রীর ছবির নীচে দাঁড়াইল। ছবি এখন ছবি মাত্র। সত্যই কি মায়া কিছু দেখিয়াছিল, না সকলই তাহার কল্পনা, তাহার চোখের ভ্রম? পরলোকবাসিনীর কাছে সে যে প্রার্থনা জানাইয়াছিল, তাহার উত্তর কি এই ভীষণ আঘাতের ভিতর দিয়া পাইল? এরপর মায়া কোন্ পথে যাইবে?

কিন্তু যাইবার পথ স্থির করিবার ভার কি আর তাহার হাতে আছে? নিয়তিই কি পথনির্দেশ করিয়া দেয় নাই? দুই মাসের ভিতর সে দেবকুমারকে চিনিতে পারে নাই, তাহাকে সামনে দেখিয়া কি বলিয়াছে, কি করিয়াছে, কিছুই তাহার মনে নাই। এমন কিছু করিয়া থাকিতে পারে, যাহার আর প্রতিকার নাই। এমন কিছু বলিয়া থাকিতে পারে, যাহার জন্য দেবকুমার আর তাহাকে ক্ষমা করিবে না। দেবকুমার কোথায় এখন তাহা সে জানে না। পিসীমা দেবকুমারকে চেনেন কিনা তাহা মায়া জানে না, কি করিয়া সে তাঁহার কাছে খোঁজ করিবে? পিতার কাছে জিজ্ঞাসা করা যায়। দেবকুমারের সঙ্গে মায়ার কি সম্বন্ধ তাহা কি তিনি জানেন? দেবকুমারকে মায়া বলিতে বারণ করিয়াছিল মনে আছে। এক্ষেত্রে পিতা হয়ত বিস্মিত হইবেন, কন্যা দেবকুমারের খবর জানিতে চাহিলে।

কিন্তু আর কাহারও কাছে খবর পাওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন নিরঞ্জনের কাছেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। না জানিয়া যে মায়ার উপায় নাই?

ঘর হইতে বাহির হইয়া সে নীচে চলিল। সিঁড়ির শেষে আসিয়া একবার দাঁড়াইল। তাহার পিতা সম্ভবত নিজের শয়নকক্ষেই আছেন। খাবারঘর পার হইয়া সে ধীরে ধীরে নিরঞ্জনের শয়নকক্ষের দিকে চলিল।

এমন সময় অফিস ঘরের পাশের ঘরখানার দরজা খুলিয়া গেল। মায়া তাকাইল, কে একজন বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে দেবকুমার। কোনোমতে দেওয়াল ধরিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মায়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া গেল।

মায়ার ঘুম ভাঙার কথা, বা স্মৃতি ফিরিয়া পাওয়ার কথা, নিরঞ্জন

দেবকুমারকে বলেন নাই। সে তখন ঘুমাইতেছিল। জাগিবার পর বলিলেই চলিবে ভাবিয়া তিনি নিজের ঘরে চলিয়া গিয়াছিলেন। দেবকুমার হঠাৎ যেন চারিদিকে জাগরণের উত্তেজনার একটা সাড়া পাইয়া আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ এই রাত্রিশেষের আধ আলো, আধ অন্ধকারের মধ্যে একাকিনী মায়াকে দেখিয়া সেও বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কি তাহার করা উচিত ঠিক বুঝিতে পারিল না। একবার নাম ধরিয়া ডাকিয়া ত এক বিপর্যয় ঘটিল, আবার কি মায়াকে ডাকা উচিত?

মায়ার পায়ের নীচের মাটি যেন টলিতে আরম্ভ করিল। এতদিন পরে, এত ভয়াবহ বিচ্ছেদের পরে আজ তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু মায়াকে সে একটা কথাও বলিল না? এই কি তাহাদের ভালবাসার পরিণাম? ইহারই বেদনা ভোগ করিবার জন্য কি বিধাতা তাহাকে বিস্মৃতির সাগর হইতে টানিয়া তুলিলেন?

দেবকুমার চাহিয়া দেখিল, মায়ার শরীর কাঁপিতেছে, প্রাণপণ শক্তিতে সে দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। দেবকুমার আর দ্বিধা না করিয়া মায়ার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু সে মায়াকে স্পর্শ করিবার আগেই মায়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। মৃদু অথচ কাতর যন্ত্রণাময় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "একটা কথা বললে না? একেবারে ভুলে গেলে?" বলিতে বলিতে দেবকুমারের হাত ছাড়িয়া দিয়া মাটিতেই বসিয়া পড়িল।

একটা অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস দেবকুমারের বক্ষ হইতে উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। দীর্ঘদিনের অসহনীয় যন্ত্রণার পাষাণভার অশ্রু হইয়া ঝরিয়া পড়িল। মায়াকে কোনমতে ধরিয়া তুলিয়া সে ঘরের ভিতর লইয়া গেল। খাটের উপর তাহাকে বসাইয়া নিজে তাহার পাশে বসিয়া পড়িল। অবরুদ্ধ কণ্ঠেই বলিল, "ভুলেই গেছি বটে। দু' মাসের ভিতর দুটো ঘণ্টাও যদি ভুলতে পারতাম, তাহলে সেইটুকু সময় নরকযন্ত্রণার থেকে নিষ্কৃতি পেতাম। ভুলে তুমিই গিয়েছিলে মায়া। সামনে পড়লে চেয়ে দেখনি, মুখ ফিরিয়ে স'রে গেছ।"

দেবকুমারের চোখে জল দেখিয়া মায়া একেবারেই ভাঙিয়া পড়িল। তাহার কোলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বলিল, "ভগবান্ কি অপরাধে আমাকে এত বড় শাস্তি দিলেন? আমি তোমাকে ভুলে গিয়ে বেঁচে রইলাম কি ক'রে? তুমিই ত আমার প্রাণ ছিলে? তোমাকে যদি বিধাতা মুছে দিলেন আমার মন থেকে, ত আমার জীবনটা শেষ ক'রে দিলেন না কেন তখনই?"

দেবকুমার নিজের চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মায়াকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বলিল, "মায়া চুপ কর, ও রকম ক'রে কেঁদো না। আবার অসুখ করতে পারে। তুমি তাকাও একটু আমার দিকে। আর যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারব না। দুঃখ ত তোমার হতেই পারে, কিন্তু আনন্দেরও কারণ আছে ত? দুজনে যে দুজনকে ফিরে পেলাম, এটা কি তোমার কাছে ছোট জিনিষ?"

মায়া মাথা তুলিল, চোখের জল মুছিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কান্না তখনও তাহার শেষ হয় নাই। দেবকুমারের বুকের উপর পড়িয়াই সে কাঁদিতে লাগিল।

দেবকুমার বলিল, "তুমি পারবে না এখন থামতে। চল দেখি, আমরা বাগানে গিয়ে বসি। সেখানে ঢের সুবিধা হবে কথা বলার। এখানে ত এখনি লোকজনের চলাচল সুরু হবে। কিন্তু এখন খানিকক্ষণ তুমি আমার কাছেই থাক, নইলে শান্ত হতে পারবে না, সুস্থ হতে পারবে না।"

দেবকুমারের হাত ধরিয়া মায়া কম্পিতপদে হলের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বাগানের পথ ধরিল। নিরঞ্জন তখন হাত মুখ ধুইয়া, খাইবার ঘরে যাইবার জন্য বাহিরে আসিতেছিলেন। মায়া এবং দেবকুমারকে দেখিয়া তিনি আবার পিছাইয়া গেলেন। ভাবিলেন, "এই সব চেয়ে ভাল হল। দেবকুমারের মুখে শুনলেই সে সব চেয়ে কম আঘাত পাবে।"

বাগানের এক নিভৃত কোণে আসিয়া দুইজনে একটা লোহার বেঞ্চে বসিল। মায়াকে দেবকুমার এবার গাঢ় আলিঙ্গনে টানিয়া লইল। তাহার অশ্রুসিক্ত মুখ বারবার চুম্বন করিয়া বলিল, "কষ্ট আমি কম পাইনি মায়া, কিন্তু সেটা এরই মধ্যে ভুলে যেতে পারছি। দেখি তোমার মুখটা ভাল ক'রে। এতক্ষণে ত চোখের দৃষ্টি ফিরে দিলেন ভগবান্। তুমি তেমনই সুন্দর আছ। কিন্তু তোমার মন ত এখনও হাল্‌কা হল না? আর কত কাঁদবে? বলছিলে আমিই তোমার প্রাণ ছিলাম। প্রাণ ফিরে পেলে, এজন্যেও অন্ততঃ ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দাও।"

মায়া মাথা তুলিয়া বলিল, "ভগবানের বিরুদ্ধে কার কাছে নালিশ করা যায় বল ত? তিনি এতবড় শাস্তি আমাকে কেন দিলেন? আর সব আমি ভুলতে পারব, সহ্য করতেও পারব, কিন্তু তোমাকে এতবড় দুঃখ দিলাম, এ আমি কি ক'রে সহ্য করব?"

দেবকুমার বলিল "ভগবানের বিরুদ্ধে নালিশ আর কে শুনবে মায়া? এক তিনি যদি নিজে শোনেন। তুমি পারবে না এই দুঃখের ক্ষতিপূরণ করতে, পারবে না আমাকে সব দুঃখ ভুলিয়ে দিতে?"

মায়া বলিল, "কিসে হবে ক্ষতিপূরণ বল? চিরজন্মের একাগ্র ভালবাসায় হবে কি? চিরদিন যদি শুধু তোমার সেবা ক'রে কাটাই, তাতে হবে?"

দেবকুমার বলিল, "ক্ষতির চেয়ে ক্ষতিপূরণ অনেক বেশী হয়ে যাবে যে মায়া? এতটা কি আমি দাবী করতে পারি?"

মায়া বলিল, "তুমি সব দাবী করতে পার আমার কাছে। এই জীবনের শুধু নয়, জন্মান্তর যদি থাকে, তাহলে যতবার পৃথিবীতে আসব, ততবার যেন প্রাণের সমস্ত ভালবাসা তোমাকেই দিতে পারি। কিন্তু নেবার সাহস আর তোমার হবে কি?"

দেবকুমার বলিল, "না-নেবার সাহস আর কোনও জন্মে হবে না মায়া। একবার যা শিক্ষা হল, তাতে আর তোমাকে বাদ দিয়ে বাঁচার কল্পনা আমি করতে পারব না। কিন্তু আমার সাহস হবে না কেন ভাবছ?"

মায়া মুখটা ফিরাইবার চেষ্টা করিল। দেবকুমার দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "না, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল, কি বলতে চাও।"

মায়া বলিল, "আমাকে তোমার জীবনে আবার নেবে? যদি ফের এই রকম হয়? আবার যদি ভুলি?"

দেবকুমার বলিল, "এই কথা? বললামই ত, না নিয়ে আমার উপায় নেই। বেঁচে থাকতে আমার হাত থেকে তোমার আর মুক্তি নেই। যদি আবার অসুখ করে, করবে। জীবনে একবারও অসুখ করে না, এমন স্ত্রী ক'জনের আছে বল? ব'সে থাকব তোমার ভাল হবার অপেক্ষায়। কিন্তু আমার কাছেই থাকবে, দূরে যেতে পাবে না।"

মায়া বলিল, "আমাকে তুমি বলবে এই দিনগুলোর কথা? তুমি কি এখানেই ছিলে?"

দেবকুমার বলিল, "এখানে ছিলাম না, তবে রোজই এসেছি। তখনকার যত বাজে কথা শুনে আরো মন খারাপ ক'রে কি লাভ? নিজেকে কষ্ট দিয়ে কি হবে মায়া? নাই বা শুনলে?"

মায়া অনুনয় করিয়া বলিল "না, তুমি বল। আমি সত্যি জানতে চাই কতখানি অপরাধ আমি করেছি তোমার কাছে। খুব বীভৎস, খুব অস্বাভাবিক কিছু করেছি?"

দেবকুমার তাহার মুখে ও মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, "না, না। অনর্থক কেন নিজেকে এমন উৎপীড়ন করছ? কিছু বীভৎস করনি। অস্বাভাবিকের ভিতর আমায় ভুলে গিয়েছিলে, দেখলে পালিয়ে যেতে। বয়সের তুলনায় কথাবার্ত্তা অনেক ছেলেমানুষের মত হয়ে গিয়েছিল।

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার সঙ্গে কিছু খারাপ ব্যবহার করেছি?"

দেবকুমার বলিল, "যতদূর জানি, কোনো খারাপ ব্যবহার করনি। তাঁকে বেশ স্বীকার ক'রেই নিয়েছিলে, যদিও এখানে আসার আগে তুমি তাঁকে কিই বা চিনতে? কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কে তোমায় ডাকছে। পিসীমা হয়ত চা খেতে ডাকছেন। দেখ, এখন লোকের সামনে বেরোতে পারবে ত? এত কেঁদেছ যে তার চিহ্ন সহজে মুখ থেকে যাবে না।"

"না গেলে আর কি করব? যেতেই হবে এখন", বলিয়া মায়া উঠিয়া পড়িল। দুজনে ফিরিয়া চলিল।

৪৫

চায়ের সব ব্যবস্থা করিয়া ইন্দু ফিরিয়া আসিতেছিল। হলঘরে নিরঞ্জনকে দেখিয়া বলিল, "মেজদা, চায়ের জল এনেছে। তুমি যাও খাবার ঘরে, আমি মায়াকে জিজ্ঞেস ক'রে আসি, সে নীচে এসে খাবে, না উপরে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "মায়া ত উপরে নেই, বাগানে বেড়াচ্ছে।"

ইন্দু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ও মা, একলা আবার বাগানে কেন গেল? যা ত মেয়ের শরীর।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "একলা যায়নি; দেবকুমার তার সঙ্গে গিয়েছে।"

ইন্দু একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে ডাকব না তাদের এখন?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা ডাক্, একটু চা-টা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিক। ছেলেটার ত দিনেও ঘুম নেই, রাত্তেও ঘুম নেই। দেবকুমার এখন যেন চ'লে না যায়, তাকে দুপুরে এখানেই খেতে বলিস্।"

ইন্দু বলিল, "আচ্ছা।" সে আস্তে আস্তে বাগানের দিকে চলিল। যাক, মায়ার জ্ঞানবুদ্ধি যে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এখন মানে মানে বিবাহাদি হইয়া আপদ্ চুকিয়া যায়, তাহা হইলেই ভাল। যা সৃষ্টিছাড়া অসুখ, কখন কি যে হয় তাহার ঠিকানা নাই।

মায়াকে একবার ডাকিল। উত্তর না পাইয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল, মায়া এবং দেবকুমার আসিতেছে। ইন্দুকে দেখিয়া দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কি পিসীমা, আমাদের খোঁজে আসছেন না কি?" মায়ার মুখ বিষণ্ণ, সে কোনো কথা বলিল না।

ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ, চা খেতে ডাকতে আসছিলাম। আর দেখ বাবা, তুমি দুপুরেও এখানে খাবে, মেজদা আমাকে বিশেষ ক'রে বলতে ব'লে দিলেন।"

দেবকুমার বলিল, "আচ্ছা, তাহলে চা খেয়ে একবার শহর ঘুরে আসতে হবে, না হলে বাবা আবার বেশী ভাববেন। মায়ার খবরটাও তাঁকে একটু দেওয়া উচিত।"

মায়ার বিষণ্ণ মুখে একটু যেন হাসির আভাস দেখা দিল! সে উপরে যাইবার সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "তোমরা যাও ডাইনিং রুমে, আমি উপর থেকে একটু হাত মুখ ধুয়ে আসি।"

মায়া উপরে উঠিয়া যাইতেই ইন্দু দেবকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, "মায়ার সব কথা মনে পড়েছে ত বাবা?"

দেবকুমার বলিল, "হ্যাঁ, তা পড়েছে, তবে যতদিন অসুস্থ ছিলেন, সে অবস্থায় কি বলেছেন, কি করেছেন, ভেবে বড় দুঃখ পাচ্ছেন।"

ইন্দু খাইবার ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিল, "সব কথা ওকে না বললেই হল।"

দেবকুমার বলিল, "না শুনে যে ছাড়েন না, সেই ত হয়েছে মুশকিল। যদি বলতে না চাই, তাহলে সত্যি যা ঘটেছে তার দশগুণ কল্পনা ক'রে নিয়ে আরো বেশী ঘাবড়ে যান।"

মায়া উপরে গিয়া, হাত মুখ ধুইয়া, চুল বাঁধিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। হলে আসিয়া দেখিল একতলার একটা ঘর হইতে বাক্স, বিছানা, প্রভৃতি বাহির

করা হইতেছে। কাহার জিনিষ বুঝিতে না পারিয়া চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কার জিনিষ রে?"

চাকর বলিল, "সেই যে প্রভাসবাবু ছিলেন, তাঁর।"

প্রভাসের কথা মায়া এতক্ষণ ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাই ত, প্রভাস যে এখানে আছে; কিন্তু তাহাকে ত একবারও দেখা গেল না? একটু বিস্মিত হইয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু তার জিনিষপত্র বার ক'রে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস্?"

চাকর বলিল, "সাহেব সব মাল জাহাজঘাটে পৌঁছে দিতে বললেন।"

স্মৃতিলোপ হওয়ার পর প্রভাস ও মায়ার ভিতর কি যে ঘটিয়াছিল, তাহা দেবকুমার মায়াকে কিছুই বলে নাই। শুনিয়া মায়া অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখ পাইবে, মনে করিয়াই বলে নাই। সুতরাং এইভাবে প্রভাসের চলিয়া যাওয়ার কোনো অর্থই মায়া বুঝিতে পারিল না। প্রভাস ত আসিয়াছিল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের পরামর্শ করিতে। এতদিন মায়ার অসুখের জন্য কোনো কথা হইতে পারে নাই, কিন্তু যেই মায়া জ্ঞান ও স্মৃতি ফিরিয়া পাইল অমনি সে এমন অদ্ভুতভাবে পলায়ন করিতেছে কেন? চাকরকে ত এ সব জিজ্ঞাসা করা যায় না, সুতরাং সে খাইবার ঘরে গিয়াই ঢুকিল।

নিরঞ্জন এবং দেবকুমার বসিয়া ছিলেন তাহারই অপেক্ষায়। ইন্দু চায়ের পেয়ালায় চিনি দিতেছিল। মায়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "পিসীমা, তুমি যাও, স্নান পূজো কর গিয়ে, নইলে ত জল মুখে দেবে না। আমি চা দিচ্ছি।"

ইন্দু চলিয়া গেল। মায়া নিপুণ অভ্যস্ত হাতে চা পরিবেশন করিতে লাগিয়া গেল। নিরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন, "আজ আমার মায়ের 'অনারে' দু পেয়ালা চা খাব।"

মায়া বলিল, "তা খাও, আমারও নিজের 'অনারে' অনেক বেশী পেয়ালা খাওয়া উচিত। মাস দুয়েক ত খাইনি শুনছি।"

দেবকুমার হাসিয়া বলিল, "শুধু যে নিজে খাওনি তা নয়, অন্যদেরও খাওয়া ঘুচিয়ে দিয়েছিলে।"

মায়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, প্রভাসদার জিনিষপত্র জাহাজঘাটে নিয়ে যাচ্ছে কেন? তিনি রাতারাতি গেলেন কোথায়?"

নিরঞ্জন একটু বিপদে পড়িয়া গেলেন। প্রভাস সম্বন্ধে সব কথা তিনি অন্ততঃ মায়াকে খুলিয়া বলিতে পারেন না। অথচ সব পরিষ্কার করিয়া না

বুঝিলে মায়ার মনে একটা সংশয় অশান্তি থাকিয়াই যাইবে। কি বলিবেন ভাবিয়া না পাইয়া শুধু বলিলেন, "তাকে হঠাৎ চ'লে যেতে হল, জিনিষ নিয়ে যেতে পারেনি। তাই সেগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল "এত হঠাৎ যেতে হল যে জিনিষও নিয়ে যেতে পারলেন না? কেন বাবা?"

নিরঞ্জন বিব্রতভাবে দেবকুমারের মুখের দিকে তাকাইলেন। তাহার পর বলিলেন, "বোস মা, আমি চাকরটাকে আগে সব ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে আসি, তারপর তোমার কথার উত্তর দেব," বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

দেবকুমার নিজের চেয়ার ছাড়িয়া আসিয়া মায়ার পাশের চেয়ারে বসিল। তাহার একখানা হাতের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তোমার বাবাকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস ক'রো না লক্ষ্মী, আমি তোমায় সব বুঝিয়ে বলব। নইলে ওঁকে শুধু শুধু অপ্রস্তুত করা হবে, উনি ত তোমায় সব খুলে বলতে পারবেন না?"

মায়া ভীতভাবে বলিল, "এর ভিতরেও আমার কিছু লজ্জা পাবার মত কথা আছে নাকি?"

দেবকুমার তাহার ভয় দেখিয়া সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মায়ার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "চল, লাইব্রেরীতে গিয়ে বসা যাক। অমনি ভয়ে আধমরা হয়ে গেলে? মানুষের জীবনে ভালমন্দ কত রকম জিনিষ আসে যায়। অত ভয় পেলে কি চলে?"

মায়া বলিল, "সাধারণ নিয়মগুলো কি খাটে আমার বেলা? এ ব্যাপারের সবই যে অসাধারণ।"

দেবকুমার উত্তর না দিয়া লাইব্রেরীর দিকে চলিল। মায়াও তাহাকে অনুসরণ করিল। দেবকুমার তখন টেলিফোন করিতে ব্যস্ত, ইঙ্গিতে মায়াকে বসিতে বলিল।

মায়া একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া কাগজ উল্টাইতে লাগিল। 'কনেক্‌শন্' পাইতে দেরি হইতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ফোন্ করছ?"

দেবকুমার বলিল, "বাবার কাছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, একবার গিয়ে সব ব'লে আসব। কিন্তু তোমায় একলা রেখে যেতে আর ভরসা হচ্ছে না। ভয়টয় পেয়ে এক কাণ্ড ক'রে রাখবে।"

মায়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "ভয় পাওয়া অদৃষ্টে থাকলে কি আর তুমি আট্‌কাতে পারবে?"

দেবকুমার টেলিফোনে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কাজেই তাহার কথার উত্তর দিল না। বাহিরে গাড়ীর শব্দ শোনা গেল, মায়া বুঝিল, প্রভাসের জিনিষপত্র রওনা হইয়া গেল। প্রভাসকে লইয়া না-জানি আবার কি জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল।

দেবকুমার কাজ সারিয়া আসিয়া মায়ার চেয়ারের হাতের উপর বসিল। বলিল, "নাও, এখন কি বলতে চাও, কি শুনতে চাও? কিন্তু প্রথমেই ব'লে রাখছি, কিছু নিয়েই মন খারাপ ক'রো না। দুঃখ করবার মত ব্যাপার অনেক ঘটেছে অবশ্য, তবু যে আনন্দ আবার জীবনে এল, তাকে আমি মূল্য দিচ্ছি অনেক বেশী।"

মায়া বলিল, "ভালই করছ। আমার দুর্বল মন, ভয় বেশী, আমি নিরানন্দটাকে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছি না।"

মায়ার চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে দেবকুমার বলিল, "চেষ্টাও ত করছ না।"

মায়া তাহার হাতের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, "করছি চেষ্টা, কিন্তু মনটা এত মুষড়ে রয়েছে যে ফল বেশী হচ্ছে না। যা আমি জানতে চাই, তা আমায় পরিষ্কার ক'রে বল, আমার মন খারাপ হতে পারে ব'লে কিছু লুকিও না।"

দেবকুমার বলিল, "সব জানা এমনই কি দরকার? দারুণ দুঃখের পর, দুজনে দুজনকে ফিরে পেলাম, এর আনন্দেই ত মন ভ'রে থাকা উচিত ছিল? আজকের দিনটাকে তুমি নষ্ট করতে চাও যত দুঃখকষ্ট আর সংশয়ের কাহিনী শুনেই?"

মায়ার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, দেবকুমার তাহার মাথাটা কাছে টানিয়া আনিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিল। বলিল, "খালি কান্না আর কান্না। আমাকে মনে না পড়লেই ভাল ছিল, না? যেন মহা একটা দুঃখের বিষয় হয়ে গেছে। আমার মুখের দিকে তাকাতেও ত তোমার বেশী ইচ্ছে করছে না দেখছি।"

চোখের জলের ভিতর দিয়াই মায়ার হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "কোনো অবস্থায় তুমি 'সিরিয়াস' হতে জান না? এই রকম একটা

ভয়ানক ব্যাপারকে তুমি হেসে উড়িয়ে দিতে চাও? এ বিষয়ে ভাববার কিছু নেই?”

দেবকুমার বলিল, “ভাববার সময় ত চ’লে যাচ্ছে না, আজই সব ভাবনা ভেবে শেষ করতে হবে?”

মায়া অনুনয়ের সুরে বলিল, “না লক্ষ্মীটি, তুমি রাগ ক’রো না। সব ভাল ক’রে না শুনলে আমার মনে কিছুতেই শান্তি আসছে না। আমার এতখানি আনন্দের মধ্যেও একটা কালো ছায়া প’ড়ে রয়েছে।”

দেবকুমার উঠিয়া ঘরের ভিতর ঘুরিতে লাগিল। বলিল, “আচ্ছা, আমি বলছি। তোমাকে বলাই ভাল। সত্যি যা হয়েছে, তার দশগুণ ভেবে ব’সে থাকবে তা না হলে। প্রভাসের এখান থেকে চ’লে যাওয়ারই কথা ছিল, জাহাজের টিকিটও কেনা হয়েছিল বোধ হয়। কিন্তু কাল রাত্রে একটা গোলমাল হওয়ায়, সে কাউকে কিছু না ব’লে কোথায় চ’লে গিয়েছে। তোমার বাবা আন্দাজ করছেন যে, সে স্টীমার ধরতেই গেছে, তাই তার জিনিষপত্র জাহাজঘাটেই পাঠিয়ে দিচ্ছেন।”

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, “কাল রাত্রে কি গোলমাল হয়েছিল? আমাকে নিয়ে ত?”

দেবকুমার একটু ভাবিয়া বলিল, “বলতে হলে সবটাই বলতে হয়। তোমাকে আগেই বলেছি যে, লেকের ধার থেকে অজ্ঞান অবস্থায় তোমাকে আমি নিয়ে আসি। কিন্তু সেখানে তুমি একলা ছিলে না। প্রভাসও ছিল।”

মায়ার মুখ শাদা হইয়া উঠিল। সে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “দুজনেই আমরা লেকের ধারে গেলাম কি ক’রে? আমাকে না সারাক্ষণ আটকে রাখা হত?”

দেবকুমার বলিল, “একটু কোনো ফাঁকে ছাড়া পেয়েছিল বোধ হয়। প্রভাসের সঙ্গে দেখা করতে তোমার বড় বেশী আগ্রহ ছিল, সেইজন্যে তাকে তোমার বাবা চ’লে যেতে বলেছিলেন। আমি অবশ্য তাঁকে এ বিষয়ে আগে কয়েকটা কথা বলেছিলাম।”

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি বলেছিলে? আমি সব ভাল ক’রে বুঝতে পারছি না।”

দেবকুমার আবার আসিয়া মায়ার চেয়ারের হাতের উপর বসিল, বলিল, “ডিলিরিয়মের অবস্থায় ত মানুষ খুনও করতে পারে। তুমি তখন যা বলেছ,

যা করেছ, সেগুলোকে পাগলের প্রলাপের চেয়ে বেশী মূল্য দেবার কোনো দরকার নেই। প্রভাস হয়ত গোড়ার থেকেই তোমাকে ভালবাসত, কিন্তু তুমি তা জানতে না। এখানে অসুস্থতার মধ্যে, তোমার মন খানিকটা তার দিকে গিয়েছিল ব'লে বোধ হত। সে সেটার advantage নিচ্ছে মনে হওয়াতে আমি তোমার বাবাকে সে কথা বলেছিলাম। তাতেই তিনি প্রভাসকে চ'লে যেতে hint দেন। ও কি মায়া, কেন ?"

মায়া দেবকুমারের হাতের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। দেবকুমার জোর করিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "একেবারে অশ্রুসাগর উথলে উঠেছে তোমার আজ। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে কেন এত দুঃখ পাচ্ছ, লক্ষ্মী আমার ? প্রভাস ত চ'লেই গেছে, তার কাছে তোমার লজ্জা পেতে হবে না।"

মায়া বলিল, "নিজের আত্মার আর কত অপমান আমি করেছি জানি না। আমার ত নিজের উপর ঘৃণা ধ'রে গেছে, তোমার মনে কি কোনো দাগ পড়ে নি ?"

দেবকুমার মায়ার গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "আমি কি তোমার মত পাগল ? সেই তুমি আর এই তুমি কি এক ? তখন না হয় তের বছরের মেয়ে হয়ে গিয়েছিলে, এখন ত আর তা নেই ? এমন কথা মনে এল কেন ? আমি তোমায় কোনো অবস্থায়ই কি ঘৃণা করতে পারি ? এতখানি ভালবাসার সঙ্গে ঘৃণা থাকে কখনও ?"

মায়া বলিল, "আমি যদি কোনোদিন একেবারে ভাল হই ত তোমার দয়ায় হব। এতখানি আশ্বাস আর আমায় কে দেবে ?"

দেবকুমার বলিল, "যতখানি দয়া চাও, যতখানি আশ্বাস চাও সব দিতে রাজী আছি। তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হও। শরীর বা মন কিছুর উপরে এখন আর বেশী ভার চাপিও না।"

মায়া বলিল, "সুস্থ হতে পারছি কই ? এ রকম দুর্ভাগ্য পৃথিবীতে ক'টা মানুষের হয় ? প্রভাসদা ছেলে ভালই ছিল, জেনে শুনে পাপ করবে মনে হয় না। আমাকে ভালবাসে এমন সন্দেহ কখনও করিনি। কিন্তু আমি নিজে ত তখন মানুষ ছিলাম না ? কি বলেছি, কি করেছি, এক ভগবান্ই জানেন।"

দেবকুমার বলিল, "তবে তাঁর হাতেই বিচারের ভার ছেড়ে দাও না ? মানুষে তোমায় দোষী করবে না, করবার অধিকার তাদের নেই। বিশেষ

কিছু বলবার বা করবার কোনো সুবিধাও তুমি পাওনি। সে থাকত নীচে, তুমি থাকতে উপরে, এবং তোমায় সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখা হত। দু একটা কথা যা বলেছ, তাও অন্যদের সামনে।"

মায়া বলিল, "লেকের ধারে আমি একলাই গিয়েছিলাম ত?"

দেবকুমার বলিল, "তা অবশ্য গিয়েছিলে, কিন্তু সেও ক' মিনিটের জন্যে বা? তুমি বাড়ীতে নেই জানবামাত্র মোটরে ক'রে তোমাকে খুঁজতে বেরোনো হয়, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোমাকে পাওয়া যায়। আমার ডাক শুনে তুমি ভয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লে। তোমাকে আমি তুললাম, কিন্তু প্রভাসের খোঁজ আর রাখতে পারি নি। রাগের মাথায় তাকে দুচার কথা বলেছিলাম, এখন তা মনে ক'রে কষ্ট হচ্ছে।"

মায়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "শাস্তি পেল ত অনেকগুলি মানুষ, কিন্তু অপরাধটা কার?"

দেবকুমার বলিল, "অপরাধ কারো নয়। নির্ব্বুদ্ধিতা যদি অপরাধ হয়, তাহলে প্রভাসের অপরাধ আছে; jealousy যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমারও অপরাধ আছে। কিন্তু রোগ যেটা সেটা ত অপরাধ হতে পারে না? সুতরাং তুমি কেন মন খারাপ করছ?"

মায়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, জগতের বিচিত্র নিয়ম। এখানে একের দোষে অন্যে দণ্ড পায়। খানিক শাস্তি ত পাওয়া হয়ে গেল, আরো হয়ত অনেকটা বাকি আছে।"

দেবকুমার বলিল, "মায়া তুমি কি মনে কর, ভালবাসার কোনো শক্তিই নেই? তোমাকে আর বেশী শাস্তি পেতে দেব কেন আমি?"

মায়া তাহার একটা হাত দুই হাতে ধরিয়া বলিল, "আত্মহত্যা ত মানুষে করে? আমি যে নিজের দুর্ভাগ্য নিজে ডেকে আনব না তা কে বলতে পারে?"

দেবকুমার বলিল, "দেখ, গোড়ার থেকেই সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত চেহারা নিচ্ছে। এই কয়েকটা ঘণ্টা আগে আমি ভাবতে পারিনি যে তুমি যদি আমায় চিনতে পার, তাহলে আমার কামনা করবার আর কিছু থাকবে। চিনতে পারলে ঠিকই, যতটা ভালবাসা নিয়ে আমার জীবনে দুমাস আগে এসেছিলে, সেটাও হারিয়ে যায় নি। অথচ দেখ, মাঝখানে কত বাধা এসে দাঁড়াল। আবার যে ফিরে পেলাম, সে আনন্দের কোনো অনুভূতি

তোমার মনে নেই। যত অবাস্তর কথা নিয়েই মন একেবারে অন্ধকার ক'রে ব'সে আছ।"

মায়া তাহার হাতে চুম্বন করিয়া বলিল, "রাগ ক'রো না। তুমি যেটা ছ'মাস ধ'রে অল্পে অল্পে সহ্য করেছ, সেটা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার মাথার উপর ভেঙে পড়েছে। আমি যেন কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। একটু সময় দাও আমাকে। আমার ভালবাসাতেও কি তোমার সন্দেহ আসছে?"

দেবকুমার তাহার মুখে ও পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল, বলিল "না, না, সে সন্দেহ আমি একবারও করি না। ওখানে আমার ভুল হয় নি। কিন্তু অভিমান ত হয় একটু? যা সব চেয়ে বড় হওয়া উচিত ছিল তোমার কাছে, তাকে তুমি কোথায় নামিয়ে দিচ্ছ?"

মায়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দেবকুমারের বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, "কোথাও নামাইনি, আমার বুক ভ'রে আছে, আমার জীবন জুড়ে আছে। যা বলছি তা ভয় আমাকে বলাচ্ছে। যা সব চেয়ে বড় তাকে হারানোর ভয়ও যে বড়, সর্ব্বনেশে বড়। একটু ক্ষমা ক'রে চল।"

দেবকুমার তাহার চুলের উপর চুম্বন করিয়া বলিল, "আমার স্বভাবটা বড় অসহিষ্ণু, কোনো কিছুই আমি ধৈর্য্য ধ'রে সহ্য করতে পারি না। সত্যিই এত অস্থির আমার হওয়া উচিত নয়। যত সময় তোমার লাগে লাগুক, আমি অপেক্ষা ক'রেই থাকব। ক'টা ঘণ্টাই বা কেটেছে? এরই মধ্যে সব কালো আলো হয়ে যেতে পারে না।"

৪৬

তিন চারটা দিন একইভাবে কাটিয়া গেল। বাড়ীর আর সকলেই আনন্দে দিশাহারা, কিন্তু মায়ার মনে নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে। আনন্দ করিবার মত জোর সে মনের ভিতর কিছুতেই পাইতেছিল না। ভবিষ্যতের দিকে যতই সে তাকাইত, মনে হইত দারুণ একটা বিভীষিকা তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একবার তাহার কবল হইতে মায়া মুক্তি পাইয়াছে, কিন্তু সেই মহাভয় যেন তাহার জীবনপথে ব্যাঘ্রীর মত ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, সুবিধা পাইলেই আবার অতর্কিতে আক্রমণ করিবে। ইহার করাল কবল হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেন মায়ার নিষ্কৃতি নাই।

প্রভাসের জিনিষপত্র সেদিন ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার কোনো খোঁজ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ইহাতে মায়া আরো মুষড়াইয়া পড়িয়াছে নিজের অজ্ঞাতসারে সে একজন মানুষের জীবনের সব সুখ শান্তি যে অপহরণ করিয়াছে, ইহা সে কোনোমতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। ইহার চেয়েও অধিক অনিষ্ট তাহার দ্বারা ঘটিয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্ত তাহার মন অস্থির হইয়া থাকিত। এই সকল বিষয়ে দেবকুমার ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে আলোচনা চলিত না, কিন্তু তাহাকে ক্ষুন্ন করিয়া তোলার ভয়ও মায়ার ছিল। বেশী কথা তাই সে বলিতেও পারিত না। নিজের মনেই বেশীর ভাগ চাপিয়া রাখিত। ইন্দু মাঝে মাঝে দেশে ফিরিবার কথা তুলিত, কিন্তু নিরঞ্জন আমল দিতেন না। বলিতেন, "আমার মা লক্ষ্মীর বিয়ের আগে আর কোথাও নড়তে পারছ না। মেয়ে সামলাতে গিয়ে আমার কাজকর্ম সব রসাতলে যেতে বসেছে। দেবকুমারের হাতে আগে ওকে সঁপে দিই, তারপর যার যেখানে খুশি যেও।"

সেদিন সকালে মায়া লাইব্রেরীতে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিল। এই ঘরটি সব চেয়ে নিরিবিলি, সুতরাং এইটিই তাহার প্রিয় ছিল সবচেয়ে। দেবকুমার আসিলেই সোজা এই ঘরে আসিয়া ঢুকিত।

ইন্দু ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে, বাণীর আইবুড় ভাতের নিমন্ত্রণে যাবি নাকি?"

মায়া বলিল, "না বাপু, কোথাও যাবার মত মন বা শরীর কিছুই আমার নেই।"

ইন্দু বলিল, "শোন কথা, একবার অসুখ করেছিল ব'লে এজন্মে আর তুই বাইরে মুখ দেখাবি না?"

মায়া বলিল, "নাই বা দেখালাম? আমার মুখ না দেখলেও জগতের লোকের বেশ চ'লে যাবে।"

ইন্দু কি যেন বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় পিছনে পায়ের শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল, দেবকুমার। একটু হাসিয়া দেবকুমারকে সম্ভাষণ করিয়া সে চলিয়া গেল।

দেবকুমার আসিয়া মায়ার সামনের টেবিলটার উপর চড়িয়া বসিল। বলিল, "জগতের অন্ত লোকদের কথা বলতে পারি না। তবে একজনের কথা বলতে পারি তোমার মুখ না দেখলে যার কিছুতেই দিন কাটতে চায় না।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "তা তাঁকে দেখা দেবার জন্তে ত আমাকে তাঁর বাড়ী যেতে হয় না, তিনিই এসে দেখা দিয়ে যান।"

দেবকুমার মায়ার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "চিরকাল তাঁকেই আসতে হবে? আপনি তাঁর ঘর আলো করতে কোনোদিনই কি যাবেন না?"

মায়া একটু গম্ভীর হইয়া গেল। কথা ঘুরাইবার জন্তই যেন জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভাসদার কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না, না?"

দেবকুমার বলিল, "আমাকে দেখলেই বুঝি তোমার প্রভাসের কথা মনে হয়? আমাকে ত বেশ পরিষ্কার ভুলে যেতে পেরেছিলে, তাকে কি কিছুতেই ভুলতে পার না? সেই দেখছি আমার চেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান্।"

মায়া মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেবকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন এরকম ঠাট্টা কর? সে বেচারা বেঁচে আছে কি না তাও জানা গেল না, তার জন্তে ভাবনা কি হয় না?"

দেবকুমার বলিল, "তুমি ত আর আমার ভাদ্রবৌ নয় যে ঠাট্টা একেবারে করা যাবে না? আচ্ছা, আচ্ছা, মুখ ভার ক'রো না। খবর কিঞ্চিৎ পাওয়া গেছে, তাই ত তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম।"

মায়া উৎসুকভাবে বলিল, "কি খবর বল না? ভাল খবর ত? সে কোথায় আছে?"

দেবকুমার টেবিল হইতে নামিয়া পড়িল, বলিল, "রোস, রোস। এক সঙ্গে কত কথার উত্তর দেব? খবর ভালই, সে বেঁচে আছে এবং আকিয়াবে আছে।"

মায়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "হঠাৎ আকিয়াবে গিয়ে উঠল কি করতে?"

দেবকুমার বলিল, "তারও বোধ হয় তোমার মত পরিচিত জগতে মুখ দেখাতে ইচ্ছা করেনি, তাই কলকাতার জাহাজে না চ'ড়ে চাটগাঁয়ের জাহাজে গিয়ে উঠেছিল। সেখান থেকে আমায় একখানা চিঠি লিখেছে। আজ সকালে পেয়েছি।"

মায়া বলিল, "তোমাকে কেন, এত লোক থাকতে?"

দেবকুমার বলিল, "একজন ব্যর্থ প্রেমিকের মনোবেদনা, আর একজন ব্যর্থ প্রেমিকই ভাল বুঝবে, ভেবেছিল।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "ব্যর্থ প্রেমিক হতে যাবে তুমি, কোন্ দুঃখে?"

দেবকুমার বলিল, "কোন্ দুঃখে তা ত জানি না, তবে ব্যর্থই হয়ত হব শেষ পর্যন্ত।"

মায়ার মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। অন্তদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "চিঠিতে ও কি লিখেছে?"

দেবকুমার বলিল, "আমার চিঠিতে যা খবর আছে, তা ত দিলাম। সে আকিয়াবে আছে সম্প্রতি এবং সেখানেই কিছুকাল থাকবে বোধ হয়। তবে আর একখানা চিঠি খামটার মধ্যে ছিল, সেটা শ্রীমতী মায়ার নামে। তুমি যদি সুস্থ থাক, এবং আমি যদি ভাল মনে করি, তাহলে সেটা তোমায় দিতে বলেছে। একবার ভেবেছিলাম চিঠিটা দেব না, তারপর দিয়েই দিচ্ছি। তোমার জিনিষের উপর আমার অধিকারই বা কি?"

মায়া উত্তর না দিয়া খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ বিষাদের কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। প্রভাস লিখিয়াছে—

মায়া,

তুমি আগে যেমন ছিলে, আবার তাই হতে পেরেছ, এই আশা নিয়ে আমি চিঠি লিখছি। দুর্ভাগ্য তোমাকে আর আমাকে কাছাকাছি টেনে এনেছিল, যদি ভগবানের কৃপায় সে দুর্ভাগ্যের অবসান ঘ'টে গিয়ে থাকে, তাহলে তোমার জীবনে আমার আর কোনো স্থান নেই। পৃথিবীতে আমার পরমতম সৌভাগ্যকে একদিন তোমার কঠিনতম দুঃখের মূল্যে পেতে চেয়েছিলাম। আজ সেই পাপের শাস্তি ভোগ করছি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ শাস্তি আমার চলবে, এই মনে ক'রে আমাকে ক্ষমা ক'রো। দেশ বন্ধু, আত্মীয়স্বজন সব আমি ছাড়লাম, এই প্রায়শ্চিত্তের জন্য। রাহুর মত অল্পদিনের জন্য আমি তোমার কাছে এসেছিলাম। আমি স'রে গেলাম। তোমার অদৃষ্ট সকল দিক্ দিয়ে সুপ্রসন্ন হোক, এই আশীর্বাদ করি।

প্রভাস।

মায়া চিঠিখানা দেবকুমারের হাতে দিয়া বলিল, "প'ড়ে দেখ।"

দেবকুমার পড়িল, বলিল, "আমাকে খুব কঠোর-হৃদয় ভাবতে পার, কিন্তু আমি বলতে বাধ্য, ছেলেটি অত্যন্ত 'নিউরটিক'। একটু স্বাভাবিকভাবে জিনিষটাকে দেখতে ত পারত? একেবারে সব ছেড়ে-ছুড়ে পালাবার কি দরকার ছিল? মানুষের জীবনে কত কিছু ঘটে, সেগুলো তারা ক্রমে ভুলেও যায়।"

মায়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্তকণ্ঠে বলিল, "এমন জিনিষও ঘটে, যা কোনোদিন ভোলা যায় না।"

অন্যদিন হইলে দেবকুমার তাহার কাছে আসিয়া, আদর করিয়া সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত। আজ একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল, "পাগলামি ক'রো না। কেন ভুলতে পারবে না? যা কোনোদিন ভোলা যায় না, সে পর্যায়ের জিনিষ এ নয়। এ ত একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র।"

মায়া উত্তর দিল না। যেমন বসিয়া ছিল, বসিয়াই রহিল।

দেবকুমার ঘরের ভিতর মিনিট দুয়েক পায়চারি করিয়া বেড়াইল, তাহার পর মায়ার কাছে আসিয়া বলিল, "একটা কথা বলি মায়া। যদি অনুরোধ রাখতে পার, দুজনেরই মঙ্গল তাতে।"

মায়া বলিল, "বল কি কথা। রাখতে চেষ্টা করব।"

দেবকুমার বলিল, "অনর্থক দেরি করতে আর ইচ্ছা করি না। একেবারে নিজের ব'লে তোমাকে আমি পেতে চাই। আমার ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা খুব বেশী নয়। আর এই যে ক্রমাগত দেরি হচ্ছে, এতে তুমি দুর্ভাবনা ভাববার বড় বেশী সময় পাচ্ছ। একবার ধরা যদি দাও, তাহলে এসব ভাবনা ভাববার জন্যে কোনো সময় আর তুমি পাবে না। বল ত, তোমার বাবাকে আজ আমি বলতে পারি।"

মায়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কাল সকালে এর উত্তর দেব। একটা দিন আমাকে ভাববার সময় দাও।"

দেবকুমার বলিল, "এত কি ভাববার আছে মায়া? এ ত সোজা প্রশ্ন। একটা মানুষকে স্বামী ব'লে গ্রহণ করবার মত ভালবাসা তোমার আছে কি না, এটা এখনও ভেবে পেলে না? অন্য সব প্রশ্নগুলো ত একেবারে বাইরের জিনিষ, আমাদের জীবনকে সেগুলো স্পর্শ ই করে না।"

মায়া আবার বলিল, "কালই বলব।"

দেবকুমার উঠিয়া পড়িল। বলিল, "চলি তবে আজ এখন। কালই আসব। তোমায় আজ মন খুলে আদর করতে পারলাম না মায়া। মনে হচ্ছে তুমি আমার কাছ থেকে স'রে যেতে আরম্ভ করেছ। যতদিন না নিজের অধিকারটা ভালভাবে বুঝতে পারছি, ততদিন তোমায় স্পর্শ ক'রে অপমান ক'রে কি করব?" মায়ার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে চলিয়া গেল।

মায়া উপরে উঠিয়া গেল। নিজের ঘরে ঢুকিয়া প্রভাসের চিঠিখানা আর একবার ভাল করিয়া পড়িল। তাহার পর সাবিত্রীর ছবির দিকে চাহিয়া

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "না, তোমার আশীর্বাদ পাইনি, তা এখনেই [illegible]
সে নির্জীবের মত বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সেদিন তাহার স্নানাহার কিছুই হইল না। ইন্দু আসিয়া ডাকাডাকি করিল, তাহার বাবা আসিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু মায়া উঠিলও না, খাইলও না। সন্ধ্যা হইতে বাগানে গিয়া বসিয়া রহিল, অনেক রাত্রে ঘরে আসিয়া শুইল।

সকাল হইতেই দেবকুমার আসিয়া উপস্থিত হইল। সোজা লাইব্রেরীতে ঢুকিয়া দেখিল, মায়া সেখানে নাই। তাহাকে ডাকিয়া দিবার জন্য চাকরকে আদেশ করিতে যাইবে, এমন সময় ইন্দু আসিয়া জুটিল। দেবকুমারকে দেখিয়া বলিল, "তুমি একটু বোঝাও ত বাবা মায়াকে, আমরা ত হার মেনে গেলাম। কাল বিকেল থেকে নাওয়া খাওয়া কিছু করছে না, মুখ ভার ক'রে ব'সে আছে।"

দেবকুমারের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় আছেন?"

ইন্দু বলিল, "ওপরেই আছে শোবার ঘরে। তুমি যাও না।"

দেবকুমার উপরে উঠিয়া গেল। মায়ার ঘরের দরজা খোলাই ছিল। ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল মায়া খাটের উপর কয়েকটা বালিশ ঠেশ দিয়া বসিয়া আছে। বেশভূষার কোনো পারিপাট্য নাই, মুখ মলিন, দুই চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত।

দেবকুমার আরো যেন গম্ভীর হইয়া গেল। কাছে গিয়া বলিল, "মায়া তোমার ইচ্ছাটা কি? আবার কোনো কঠিন রোগে এসে ধরুক, এই কি চাইছ?"

দেবকুমারকে দেখিয়াই মায়ার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু সান্ত্বনা পাইল না তাহার কাছে। সে যেন আজ পাথরের মূর্ত্তির মত কঠিন ও কঠোর হইয়া আসিয়াছে। একটা চেয়ার টানিয়া বিছানার কাছে বসিয়া আবার প্রশ্ন করিল, "কি উত্তর আজ দেবে আমার প্রার্থনার? বুঝতেই যেন পারছি মনে হচ্ছে।"

মায়া মাথা তুলিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার হবার মত সৌভাগ্য নিয়ে জন্মাইনি।"

দেবকুমার বলিল, "আমি যদি না ছাড়ি? আমার হাত ছাড়িয়ে তুমি যেতে পারবে?"

মায়া বলিল, "পারতে হবে। একজনের জীবন নষ্ট করেছি সেই যথেষ্ট হয়েছে। নিজের লোভের কাছে তোমাকে আর বলি দেব না।"

দেবকুমার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। মায়ার ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, "আমাকে ত্যাগ ক'রে তুমি আমার উপকার করবে, এই তুমি মন থেকে বলতে পারছ? আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে পার?"

মায়া তাহার মুখের দিকে তাকাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু চোখের দৃষ্টি অবনত হইয়া পড়িল। দেবকুমারের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "তাই বলতে চেষ্টা করছি। কাল সমস্ত দিন, সমস্ত রাত ভেবেছি। আমার অভিশপ্ত জীবন নিয়ে আমি তোমার জীবনকে ভারাক্রান্ত করব না। যা একবার ঘ'টে গেল, তা কি আবার ঘটতে পারে না?"

দেবকুমার ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে মায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাকে এমনি অপদার্থ মনে করছ যে তোমার একটু অসুখ করলেই আমি গলায় দড়ি দিতে দৌড়ব?"

মায়া বলিল, "না তা একেবারেই মনে করি না। তোমার অবহেলাকে আমি কোনো ভয় করি না, ভয় করি তোমার ভালবাসাকে। এত বেশী ভালবাসা ক'টা মেয়ে পায়? কিন্তু এত ভালবাসছ ব'লেই যে যন্ত্রণাও পাবে বড় বেশী।"

দেবকুমার মায়ার হাত ছাড়াইয়া সরিয়া গেল। তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া অনেকক্ষণ জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মায়ার দিকে ফিরিয়া বলিল, "আমার যন্ত্রণার জন্যে কোনো দুঃখ তোমার আছে? তা থাকলে কি আর একটা অনিশ্চিত দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় আমাকে এমনি ক'রে বলি দিতে পারতে? এই তোমার ভালবাসা মায়া? আমি হলে নিজের প্রাণ দিয়েও যে তোমার যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করতাম।"

মায়া কাঁদিয়া বলিল, "আমিও কি তাই করতে যাচ্ছি না? তোমাকে ছেড়ে আমিই কি বাঁচব?"

দেবকুমার বলিল, "বাঁচবেই না বোধহয়। আমাকে তোমার প্রাণ ব'লে স্বীকার করেছিলে। সেই প্রাণও তুমি ধ্বংস করতে চলেছ, দুজনেই একসঙ্গে শেষ হওয়া যাবে।"

মায়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেই লাগিল, অস্ফুটস্বরে বলিল, "কাল

বলেছিলে যে মানুষ দুঃখ ভুলে যেতে পারে। এ দুঃখ তুমিও কি কোনোদিন ভুলে যেতে পারবে না?"

দেবকুমার বলিল "তুমি কি বলছ মায়া? সত্যিই তুমি পাগল ত নয়। প্রভাসের আর আমার অবস্থা তোমার সমান মনে হচ্ছে? অসুস্থ মস্তিষ্কের প্রলাপকে সে যদি সত্য ব'লে ভেবে কষ্ট পায়, সে কষ্ট ক'দিন থাকে? দুঃস্বপ্ন থেকে মানুষ জেগেই ওঠে, তারপর নিজের জীবনের কাজে চ'লে যায়। কিন্তু আমি ত স্বপ্ন দেখিনি মায়া? কে আমাকে এই প্রেমের স্বর্গে টেনে এনেছিল? সে তুমি নয়? আজ আমাকে এক অন্ধ-তামস নরকে ফেলে নিজে স'রে যেতে চাইছ? আমি এর পর মানুষের মত ক'রে বাঁচব এই আশা কর? আমাকে ছাড় যদি, ত আমাকে হত্যাই তুমি করলে জেনে রেখো। স্বভাব ত আমার শান্ত সংযত নয়? যে উন্মত্ত আগ্রহ নিয়ে আজ তোমার দিকে ছুটছি, তোমাকে না পেলে তাই আমাকে নিয়ে যাবে অধঃপতনের শেষ সীমায়। দেহটা বেঁচে থাকলেও, আসল আমি যে সে ধ্বংসই হয়ে যাবে।"

মায়া কথা বলে না দেখিয়া আবার বলিল, "ভোলা কত সহজ সেটা আগাগোড়া ভেবে দেখেছ? আমি যদি অনুরোধ করি তোমাকে গিয়ে প্রভাসকে বিয়ে করতে, পারবে তুমি? তাকে স্বামীর সব অধিকার দিতে পারবে, তার সন্তানের জননী হতে পারবে, সুখে সংসার করতে পারবে? মাঝে মাঝে এই হতভাগার মুখটা মনে ক'রে বুকের মধ্যে হুল ফুটবে না?"

মায়া এবারে আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। বলিল, "ব'লো না, আর ব'লো না। আমাকে একেবারে মেরে ফেলতে চাও কি?" তাহার অস্ফুট হাহাকারে ঘর যেন ভরিয়া উঠিল।

তবু দেবকুমার যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনি দাঁড়াইয়াই রহিল। বলিল, "আমাকেও যে মেরে ফেলছ, তা কি বুঝতে পারছ না?"

খানিক পরে মায়া হাত বাড়াইয়া ডাকিল, "এস, আমার মাথার কাছে এসে একটু বোস।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া দেবকুমার তাহার বিছানায় আসিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলবে?"

মায়া দুই হাত বাড়াইয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। বলিল, "সব অপরাধ আমার ক্ষমা কর।"

দেবকুমার পা ছাড়াইয়া লইল, মায়ার হাত ধরিয়া বলিল, "ক্ষমা করলাম সর্বান্তঃকরণে। এতে কোন শাস্তি হয় তোমার হোক। আর কিছু আছে যা তোমার জন্যে করতে পারি?"

মায়া তাহার কোলের উপর নিজের মাথা তুলিয়া দিল। বলিল, "তুমি নাও আমাকে, বাঁচাও আমাকে। তোমার শেষের কথাগুলো বিষাক্ত তীরের মত আমার বুকে এসে ফুটেছে। কিন্তু ভাল করেছ ব'লে। এই যন্ত্রণারই আমার দরকার ছিল। তা না হলে আমি কি আর নিজেকে চিনতে পারতাম? আমার কি সাধ্য আছে যে তোমাকে ছেড়ে বেঁচে থাকি?"

দেবকুমার তাহাকে নিজের বাহুবন্ধনে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিল। মায়া বাধা দিয়া বলিল, "আমার কথাটা শেষ ক'রে নিতে দাও। আমি কোন্ আস্পর্ধায় তোমাকে ছাড়তে চেয়েছিলাম? নিজে ম'রেও যে আমার প্রায়শ্চিত্ত হত না। অজ্ঞান অবস্থায় একবার তোমার কাছে অপরাধ করেছি, সেই পাপের শাস্তিতেই আমার জীবন বিষিয়ে রয়েছে এখনও। আর একবার এতবড় অপরাধ তোমার কাছে করতে পারি আমি? অনন্ত নরকবাসেও তার প্রায়শ্চিত্ত হত না। আর চিরজন্মের মত তোমাকেও হারাতাম। দরকার নেই আমার আর কিছু ভাববার, আর কোনো পথ বেছে নেবার। সব ভার তুমি নাও। তুমি আমার হয়ে ভাব, তুমি আমায় পথ ব'লে দাও। ভগবানের কাছে মানুষ যে রকম ক'রে আত্মসমর্পণ করে, তেমনি ক'রে আমি আজ তোমার কাছে নিজেকে দেহ-মন-প্রাণে দিচ্ছি। আমার ভাবনা আর আমি ভাবতে পারব না। সে সাধ্য আর আমার নেই। এরপর আমার ভালমন্দ যা হবে, সবের ভাবনা, সবের ভার তুমি বইবে।"

দেবকুমার তাহাকে নিজের বুকের উপর টানিয়া আনিল। গভীর আবেগে তাহার অশ্রুসিক্ত ওষ্ঠাধরে বারবার করিয়া চুম্বন করিল। তাহার মাথা নিজের বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া, অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। মায়া নিশ্চিন্ত নির্ভরে তাহার বক্ষলগ্না হইয়া পড়িয়া রহিল। ঝটিকাবিধ্বস্ত তরী এতদিনে কূল পাইল যেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মায়াকে দেবকুমার বুক হইতে নামাইয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিল। বলিল, "একটা কথা ব'লে আসি তোমার বাবাকে। দুমিনিটের মধ্যে ফিরে আসব।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা ?"

তাহার চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে দেবকুমার বলিল, "পাজি দেখে সর্বপ্রথম বিয়ের লগ্নটা বার করতে হবে।"

মায়া আরক্ত মুখে বলিল, "তিনি আমাদের পাগল ভাববেন যে ?"

দেবকুমার বলিল, "ভাবলেনই বা ? আমরা পাগল ছাড়া কি ? জান না সেক্সপীয়ার, প্রেমিক পাগল এবং কবিকে এক দলেই দিয়েছেন ?"

দরজা অবধি গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল, বলিল, "উঠে একটু স্নানটান কর, ভাল কাপড়চোপড় পর। কাল থেকে ত না খেয়ে ব'সে আছ, এখন উপবাস ভঙ্গ কর। বাবা যদি আজই তোমায় আশীর্বাদ করতে আসেন, তখন তাঁর সামনে এমন শুকনো মুখে বেরিও না।"

মায়া বলিল, "সব করছি, এখন ত তোমার কথার অবাধ্য হবার জো নেই। তবে বাবা কি বলেন একটু শুনে যাই।"

"এখন ভয়ানক আগ্রহ, না ? দিচ্ছিলে ত দূর ক'রে। ভাগ্যে অতগুলো গালাগালি দিলাম, তাই ত মনটা ফিরল।"

মায়ার মুখটা কেমন যেন একটু বিষণ্ণ হইয়া গেল। বলিল, "এই খোঁটা কি চিরদিন দেবে ? ভুল মানুষ করে না ?"

দেবকুমার তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "না, আর দেব না। এই প্রথম আর এই শেষ। আচ্ছা, এখনি আসছি।"

নীচে নামিয়াই সিঁড়ির মুখে নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। তিনি বোধহয় উপরে আসিতেছিলেন কন্যার সংবাদ লইবার জন্য। দেবকুমারকে দেখিয়া বলিলেন, "মায়াকে কেমন দেখলে ?"

দেবকুমার বলিল, "বেশ ভালই আছে এখন। আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।"

নিরঞ্জন ফিরিয়া বলিলেন, "চল লাইব্রেরীতে, এখন তাহলে আর উপরে যাব না।"

কথাবার্তার শব্দ শুনিয়া ইন্দু আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, "ধন্যি মেয়ে বাপু, কাল দুপুর থেকে ঝুলোঝুলি ক'রে আমরা না পারলাম নাওয়াতে, না পারলাম খাওয়াতে। আর বর আসতেই সব রাগ জল হয়ে গেল। বিয়েটা হয়ে গেলে বাঁচি, তাহলে এ মেয়ে ঠিক থাকে। আর কারো কথা ত শুনবে না," বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

নিরঞ্জন লাইব্রেরীতে ঢুকিয়া বলিলেন, "কি বলছিলে বাবা?"

দেবকুমার বলিল, "আর একটুও দেরি না করে আমাদের বিয়েটা যদি হয়ে যায় ত ভাল। দেরিতে মায়ার বড় অনিষ্ট হচ্ছে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "সে ত দেখতেই পাচ্ছি। আচ্ছা চেষ্টা করছি। ধুমধাম করার ইচ্ছা ছিল অবশ্য, কিন্তু সেটা পরেও করা যায়, Reception ক'রে। তোমার বাবাও বৌভাত করতে চাইবেন, তাঁরও ত এক ছেলে? কিন্তু মায়ার স্বাস্থ্যের জন্যে যা দরকার, তা সবার আগে। তোমার বাবাকে কি তুমি ফোন্ করবে, না আমি করব?

দেবকুমার বলিল, "আপনিই করুন। আশীর্বাদটা আজই হয়ে গেলে ভাল।"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন, "চেষ্টা করছি।"

দেবকুমার একটু লজ্জিত হইয়াই যেন বাহির হইয়া গেল। সিঁড়ির মুখে আসিতেই ইন্দু খাইবার ঘর হইতে বলিল, "তোমাদের দুজনের চা, জলখাবার সব উপরে নিয়ে গেছে। মায়া যেন সব খায়।"

দেবকুমার উপরে উঠিয়া গেল। মায়া ইতিমধ্যে মুখ-হাত ধুইয়াছে, চুল আঁচড়াইয়াছে। ছোট টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া চা ঢালিতেছে। দেবকুমারকে দেখিয়া বলিল, "বাবা কি বললেন?"

"বললেন, যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি করবার চেষ্টা করছেন। দাও একটু চা, এতক্ষণ ঝগড়া ক'রে ত গলা শুকিয়ে গেছে। যাক, শুভবুদ্ধিটা দেরি ক'রে হলেও যে এল, এজন্যে তোমায় ধন্যবাদ। অনর্থক কতগুলো দিন নষ্ট হল, তার জন্যে অনুতাপ হচ্ছে। ব'কে দিলেই এত বাধ্য হয়ে যাবে তা ভাবিনি, নইলে আগেই বকতাম। এগুলো কিন্তু খোঁটা নয় মায়া। ক'দিন কথাই বলতে পারিনি রাগে আর অভিমানে। তাই আজ একটু বেশী বক্‌বক্ করছি। অভিমান হতে পারে না আমার?"

মায়া বলিল, "পারেই ত? আমার হলে আরো ঢের বেশী অভিমান হত।"

মায়ার ক্ষীণ কটিদেশ জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে নিজের খুব কাছে টানিয়া আনিয়া দেবকুমার বলিল, "একটা কথা বলি, রাগ ক'রো না কিন্তু।"

মায়া বলিল, "ব'লেই ফেল। আমি ত রাগ করার অধিকারও ত্যাগ করেছি। এখন একেবারে নিরস্ত্র।"

দেবকুমার বলিল, "আমার কথাটা আগে বলি ত, তারপর তোমার মন্তব্যের জবাব দেওয়া যাবে। বিয়ের পর রাতটা এই ঘরেই কাটাতে হবে ত?"

মায়া মুখ লাল করিয়া বলিল "খুব সম্ভব।"

দেবকুমার বলিল, "তাহলে দোহাই তোমার, মায়ের এই ছবিখানি এ ঘর থেকে সরাও। ওঁকে এখানে কিছুতেই রাখা চলবে না। তাঁর কন্যাকে একজন শূদ্র এসে স্পর্শ করছে এ দেখতে তাঁর নিশ্চয়ই ভয়ানক খারাপ লাগছে।"

মায়া বলিল, "ভালমন্দ লাগার ক্ষমতা থাকলে হয়ত লাগছে খারাপ। তা তুমি বলবার আগেই আমি স্থির ক'রে রেখেছি, এটাকে সরিয়ে দেব। ছোট ঘর আছে একখানা দোতলায়। সেইটাতে তাঁর সব জিনিষপত্র যা আমার কাছে আছে, সব রেখে দেব। ছবিটাও ঐখানেই থাকবে। পূজোর জিনিষও সব ওখানেই থাকবে। ঘরটা পূজোর ঘরও হবে, মায়ের museumও হবে। এ ঘর ত আজ থেকে অন্য দেবতার কাছে উৎসর্গ হয়ে গেল।"

"এমন সুন্দরী পূজারিণীকে ছেড়ে তাকে আর কোথাও নড়ানো যাবে না বোধহয়। কিন্তু তোমার শেষ কথাটার উত্তর। রাগ অভিমান সব করতে পারবে, কেন পারবে না? শুধু অল্প কিছুদিন একটু কথা শুনে চলবে, বেশী রাগ করবে না, কাঁদবে না, বিগত জীবনের কোনো কিছুর জন্যে দুঃখ করবে না। শরীরটা মনটা ভাল ক'রে সেরে যাক, এই নূতন মানুষটার ছায়া হৃদয়ে বেশ কেটে ব'সে যাক, তারপর আর সব স্ত্রীর যা কিছু অধিকার আছে সব তোমার থাকবে। আর আমি ত নামেই প্রভু, কার্যতঃ ক্রীতদাস হয়েই থাকব, আমাকেও একটুও ভয় পেয়ো না।"

মায়া তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল "ঐসব ব'লো না। সহ্য হয় না আমার। তুমি আমার প্রভুই হও, এই আমি সত্যি চাইছি। আমি যে কোনো ভার আর বইতে পারব না।"

দেবকুমার বলিল, "কোনো ভার আর বইতে হবে না, সব আমি বইব। কিন্তু প্রভু কেন? আর সুন্দরতর কোনো নাম নেই?"

মায়া বলিল "আছে ত ঢের। কিন্তু মুখে যে আসতে চায় না? বইয়ের পাতাতেই সুন্দর দেখায়।"

বাহির হইতে নিরঞ্জনের ডাক শোনা গেল, "দেবকুমার।"

মায়া তাড়াতাড়ি খানিক দূরে সরিয়া গেল, দেবকুমারও সাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। নিরঞ্জন ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "তোমার বাবা আজ সন্ধ্যাতেই মায়াকে আশীর্বাদ করতে আসবেন। যতদূর জানা যাচ্ছে বিয়ের লগ্নও একটা আছে পরশু, তোমার বাবা সেটাও আজ রাত্রে confirm করিয়ে নেবেন। চা খাওয়া হয়েছে তোমাদের?"

মায়া বলিল, "হ্যাঁ বাবা।"

নিরঞ্জন মেয়ের মুখের দিকে তাকাইলেন। মেয়ের এমন আনন্দময়ী মূর্তি তিনি বহুদিন দেখেন নাই। ভাবী জামাতাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া তিনি মেয়েকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া খাটের উপর বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "যদি অন্য অচেনা ছেলের সঙ্গে বিয়ে হত তোমার মা, তাহলে এ দিনটা আমার যেমন আনন্দের তেমনি মর্মান্তিক দুঃখেরও দিন হত। প্রথম জীবনে আমার স্নেহ-ভালবাসা পাবার ভাগ্য হয়নি, তারপর তুমিই আমার জীবন জুড়ে ছিলে। তোমাকে বাদ দিয়ে আমার দিন কাটত কি ক'রে জানি না। যাক, প্রথম জীবনে যার থেকে বঞ্চিত ছিলাম, শেষ জীবনে ভগবান তার জন্যে অনেক ক্ষতিপূরণ করলেন। মেয়েও আমার রইল, ছেলেও আমার এল। এখন তোমাদের সংসারেই আমি নিশ্চিন্ত অতিথি হয়ে থাকব।" বলিয়া মেয়ের গালে চুমা খাইয়া তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে নীচে চলিয়া গেলেন।

মায়ারও চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সে চোখ মুছিতেছে দেখিয়া দেবকুমার বলিল, "ভদ্রলোক কি অসম্ভব ভালবাসেন তোমায়! তবে ভাল না বাসবেনই বা কেন? একমাত্র সন্তান ত? অবশ্য আমিও তাই, আমার বাবাও সম্ভব ভালই বাসেন আমায় তবে তার প্রকাশ কখনও দেখিনি। নিজের মনের ভিতরেও এই ভালবাসাটা খুব অনুভব করি না।"

মায়া বলিল, "শুধু সম্পর্ক হলেই ত আর ভালবাসা হয় না? ওটা বিধিদত্ত আশীর্বাদ,—সকলে কি পায়? সব মানুষে বিয়ে ত করে, কিন্তু সব স্বামী-স্ত্রী কি পরস্পরকে ভালবাসে?"

দেবকুমার বলিল, "ভাল ত বাসেই না, এবং বাসছে না যে তা জানেও না। আচ্ছা মায়া, তুমি তোমার বাবাকে খুবই ভালবাস বুঝতে পারি, আমাকেও তাঁর সমান কি ভালবাস?"

মায়া দেবকুমারের পিঠে ছোট একটা চড় মারিয়া বলিল, "কি অদ্ভুত কথা! এ দুটোর কোনো তুলনা হয়? যদি তোমায় কেউ প্রশ্ন করে যে

চোখের আলো আর নিঃশ্বাস বায়ু কোন্‌টা তোমার কাছে বড়, তুমি কি উত্তর দিতে পার ?"

"তা পারি না, তবে সত্যি কি একেবারে পারা যায় না ? দুটো দুই ধরণের জিনিষ অবশ্য। তবে কি মনে হয় জান ? যার জন্যে মানুষ যত বড় ত্যাগ করতে পারে, ভালবাসা সেই পরিমাণে তার গভীর। আমি ত পৃথিবীতে তোমার সমান কাউকেও ভালবাসি না, এই মানদণ্ড দিয়ে মাপলে। প্রাণও হয়ত ছাড়তে পারতাম, তবে দরকার হল না, তোমার কৃপায়।"

মায়া বলিল, "তুমি বললে যদি, তাহলে আমিও না ব'লে কি ক'রে পারি ? আমিও বোধ হয় পৃথিবীতে তোমাকেই সবচেয়ে ভালবাসি। তোমার জন্যে মরতে আমি পারতাম বোধ হয়। কিন্তু তোমায় ছেড়ে বেঁচে থাকার সাহস নিজের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না।"

"আমাকে নিয়ে বেঁচে থাক, তাহলেই কৃতার্থ হই, আর কিছু চাই না আমার।" দেবকুমার আবার তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া আদর করিতে লাগিল। বলিল, "বহুদিনের উপবাসে বেশী লোভ করছি আজ। বিরক্ত হচ্ছ না ত ?"

মায়া কোনোমতে মুখটা একটু সরাইয়া লইয়া বলিল, "আমাকে তুমি পাগল বল, অথচ নিজেও ত পাগল কম নয়। এ রকম আশ্চর্য প্রশ্নের কি জবাব আমি দিই বল ত ? তোমার আদরে বিরক্ত হব ? এরপর বলবে যে তোমার ভালবাসাতেও রাগ করছি।"

দেবকুমার বলিল, "সবই বলা আজ আমার সম্ভব। কিন্তু তোমাদের বাড়ীর একটা বড় দোষ যে বেজায় বেশী চাকরবাকর। উপরে ত এরই মধ্যে ঝাড়ন আর ঝাঁটা চলছে শুনতে পাচ্ছি। নিরিবিলি জায়গা একটাও কোথাও নেই ? কথাই বলা যায় না যে ?"

মায়া বলিল, "বাড়ীতে ছাদ আছে একটা, সেখানে কথা ঠিকই বলা যায়। তবে রোদ উঠে পড়েছে ত, বেশীক্ষণ সেখানেও থাকা যাবে না। চল।"

ছাদে উঠিয়া দেবকুমার বলিল, "বাঃ, এখান থেকে দেখি সমস্ত শহরটাই দেখা যায়। আচ্ছা, আগে যে কথা হচ্ছিল। তোমার পল্লীজীবনে তোমার বাবার স্থান কিছু ছিল ?"

মায়া বলিল, "কিছুই না, বাবা আছেন একজন, একটুকু শুধু জানতাম। শিশুকালে দেখেছিলাম, বড় হয়ে চোখেও দেখিনি। মায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ

বিচ্ছেদ ঘ'টে গিয়েছিল। চিঠিপত্র আসত না, তাঁর কথাও হত না। শুধু টাকার সম্পর্কটুকু ছিল।"

দেবকুমার বলিল, "আশ্চর্য, তোমার বাবার মত মানুষ, তাঁকেও স্ত্রীর পছন্দ হল না?"

মায়া বলিল, "আশ্চর্যই বটে, এখন মায়ের জন্যে দুঃখ হয় যে, কি ঐশ্বর্য তাঁর হতে পারত আর নিজের দোষে হল না।"

দেবকুমার বলিল, "তোমার চেহারাটা খুব বেশী তাঁর মত। ভাগ্যে মনটা ঠিক নিজের বাবার মত হয়েছে, তাই আমি এমন সম্পদ্ পেলাম। কেন এত কথা জানতে চাইছি জান?"

মায়া বলিল, "কেন?"

"তুমি এখানে এসে তোমার বাবাকে খুব গভীর ভাবেই ভালবেসেছিলে, আমি এসে জোটার আগে তাঁকেই সবচেয়ে ভালবাসতে। এতদিনের গভীর ভালবাসার বন্ধন তোমার ছেঁড়েনি, বিস্মৃতির মধ্যেও। তাঁকে ঠিকই বাবা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলে। অন্য কেউ যদি প্রথম কথাটা পেড়েও থাকে, তাহলেও তুমি অস্বীকার করনি।"

মায়া বলিল, "তা হতে পারে হয়ত।"

দেবকুমার বলিল, "আমাকে যে অমন ক'রে ভুলে গেলে তার কারণ এ নয় যে আমাকে ভালবাসতে না। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার সম্বন্ধ ত? নাচ দেখে ফিরবার পথে ত নিজেকে চিনলে, আমাকেও চিনলে। তোমার জীবনের উপর আমার ছায়াটা পড়তে না পড়তে মিলিয়ে গেল। সময়ই পেলাম না কায়েমী হয়ে বসবার। তাই এত তাড়া আমার তোমাকে বন্দী করবার। তোমার হৃদয়ের মধ্যে আমার মূর্তিটাকে খুব গাঢ় রংএ এঁকে রেখ, হাজার বিস্মৃতি এলেও যেন না মোছে। যত দিন যাবে, তত আমার ভয় কমবে। আর অন্য বন্ধনও আসবে ত, সেও তোমাকে আরো শক্ত ক'রে বাঁধবে আমার সঙ্গে। তোমাকে আর আমি হারাব না। ভগবান্ করুন আর যেন এ দুর্দিন না আসে। কিন্তু আসেও যদি, তবু ভয় পেয়ো না, জেনো আমি প্রস্তুত আছি। আমি তোমার হাত ছাড়ব না।"

মায়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "একটা অনুরোধ রাখবে?"

দেবকুমার বলিল, "রাখব। না শুনেই কথা দিলাম, কারণ জানি অনুচিত কিছু তুমি বলবে না।"

মায়া বলিল, "যদি ঐ অভিশাপ আমার জীবনে আবার আসে, আর আমি অন্য কোনো মানুষের দিকে মন দিই, তাহলে আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে?"

দেবকুমার বলিল, "আশ্চর্য্য সুন্দর অনুরোধ। ওটা মেনে নিতে পারলাম না। তবে সেই 'অন্য মানুষটি'র গলা খুব আনন্দের সঙ্গে টিপে দেব। প্রথমবারেও ইচ্ছা করেছিল।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "বেচারা প্রভাসদা। কুক্ষণেই এখানে এসেছিল।"

এমন সময় সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল এবং ইন্দু উঠিয়া আসিল। বলিল, "মেজদা তোমায় একবার নীচে ডাকছেন, বাবা। তিনি এখনি কোথায় বেরিয়ে যাবেন, কি তোমায় ব'লে যেতে চান।"

দেবকুমার বলিল, "নীচেই যাচ্ছিলাম আমরা।"

সকলে নামিয়া পড়িল। দেবকুমার সোজা একতলায় চলিয়া গেল, নিরঞ্জনের খোঁজে।

নিরঞ্জন বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেবকুমারকে বলিলেন, "দেখ বাবা, একটা অনুরোধ করি, সেটা একটু unusual হলেও রক্ষা করতে হবে। পরশু তোমাদের বিয়ে হয়ে যাবে, তোমার বাবা টেলিফোনে একটু আগে confirm করলেন। এখন ধুমধাম না করলেও একমাত্র মেয়ের বিয়েতে কিছুই করব না এ হয় না। এখানকার বন্ধুবান্ধবদের বলতে হবে, আয়োজনও কিছু কিছু করতে হবে। বিয়ে এই বাড়ীতেই হবে, তবে সাজানো-গোজানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আর মায়ার আর তোমার বিয়ের পোশাকও হয়ত করাতে হবে, সেটা মায়ার মত-সাপেক্ষ। যাই হোক, আজ আর কাল আমাকে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই ঘুরতে হবে। আজ এই আশীর্বাদের সময়টা কোনোমতে উপস্থিত থাকব। এই দুদিন তোমাকে এখানেই থাকতে হবে মায়ার ভার নিয়ে। ওর মন যেন প্রফুল্ল থাকে, কোনো দুর্ভাবনা যেন না ভাবে। তোমার উপর ভার দিয়ে তবে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বেরোতে পারব। তোমার বাবাকে আমিই বুঝিয়ে ব'লে দেব, যে বিয়ের দিন সকালে তুমি বাড়ী যাবে। তুমি কি বল?"

দেবকুমার বলিল, "আপনি যা বলছেন, তাই হবে।"

নিরঞ্জন তখনই বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। দেবকুমার উপরে উঠিয়া

দেখিল, মায়া landingএ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেবকুমারকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি বললেন?"

দেবকুমার বলিল, "দুদিন থাকার নিমন্ত্রণ পেলাম। এ দুদিন তিনি খালি কাজে ঘুরবেন, আর আমি তোমাকে আগলাব। এত ভাল শ্বশুর বাংলা দেশে আর কোনো ছেলের হয়েছে কি না সন্দেহ।"

মায়া বলিল, "এত ভাল জামাই বা ক'টা লোকের হয়েছে?"

দেবকুমার বলিল, "একটা mutual admiration-এর club খুলতে হবে দেখছি এরপর। কিন্তু শোন, একঘণ্টা ছুটি প্রার্থনা করছি তোমার কাছে। খাওয়া-দাওয়ার পর ঘণ্টা খানিকের জন্য শহরে যেতেই হবে। শ্বশুরবাড়ীতে ত ময়লা কাপড় প'রে থাকা যায় না, কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে আসতে হবে।"

মায়া বলিল, "তা যাও। আমি ততক্ষণ ঘরদোরগুলো ঠিক করি। ছবিটা আজই সরাব। অন্যান্য জিনিষপত্রও গুছিয়ে রাখতে হবে। আচ্ছা, দেখ?"

কথা শেষ আর হয় না দেখিয়া দেবকুমার বলিল, "কি কথা ব'লেই ফেল, আমি রাগও করব না, গালাগালিও দেব না।"

মায়া বলিল, "বিয়ের পর আমরা এইখানেই থাকব ত?"

দেবকুমার হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ আমি ঘরজামাই হতে রাজী আছি কি না এইটা ত প্রশ্ন? তোমার বাবাকে ছেড়ে যেতে ভয়ানক কষ্ট হবে, না?"

মায়া বলিল, "ভয়ানক", উল্লেখেই তাহার চোখে জল আসিয়া গেল।

দেবকুমার তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। বলিল, "একেবারে চোখের জল ফেলা চলবে না। আমার কথা সবটা এখন শুনতে হবে। যাতে তোমার মনে কষ্ট হয় এমন কোনো ব্যবস্থা আমি করব না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে দিয়েছিলে আমার হাতে, সেই দানের অপব্যবহার আমি করব না। যাতে খুশী থাক, তাই হবে, বাবার সঙ্গে একটা রফা করা যাবে এখন। কাজের জন্যে দুপুরটা ত শহরেই কাটবে, তখন খানিকটা সময় তাঁকে দেওয়া যাবে।"

মায়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। বলিল, "ভগবান্ তোমার বাইরেটা যেমন সোনা দিয়ে গড়েছিলেন, ভিতরটাও তাই গড়েছেন।"

দেবকুমার তাহার গাল টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "সব মিষ্টি কথার ভাণ্ডার আজই খালি ক'রে ফেলো না, এরপর আরো অনেক বেশী দরকার হবে। তখন পাবে কোথায়?"

মায়া বলিল, "ও কি আর শেষ হয়ে যায়? আমাদের ছোটবেলার পড়া ছড়ার মত ভালবাসা এমনই জিনিষ যা 'যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে'।"

দেবকুমার বলিল, "কথায় তোমার সঙ্গে পারা যাবে না। তা বাগ্‌দেবী যখন স্ত্রীলোক, তখন কথায় স্ত্রীলোকের কাছে হারলে ক্ষতি নেই। আচ্ছা, এখন একটা কাজের কথা পাড়ি। শহরের কাজটা এখন সেরে আসব, রোদ খুব চড়া হবার আগে? তুমিও ততক্ষণ তোমার ঘর পরিষ্কার করার কাজ সারো। ধুলো ত প্রচুর পরিমাণে ঘাঁটতে হবে।"

মায়া বলিল, "তাই করা যাক। তারপর স্নান ক'রে ঠাণ্ডা হওয়া যাবে।"

দেবকুমার বলিল, "চলি তবে, বেশী খেটে নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলো না। সন্ধ্যার সময় যেন চেহারা বেশ তাজা থাকে।" সে নীচে নামিয়া গেল। মায়া আয়া এবং ছোক্‌রাকে ডাকিয়া আনিয়া কাজ আরম্ভ করিল। ধূলায় ও গরমে তাহার একেবারে প্রাণ আইঢাই করিতে লাগিল কিন্তু সময় যে আর নাই। মাঝে মাত্র একটি দিন। ঘণ্টা দুই অক্লান্তভাবে খাটিয়া তবে সে দুইটি ঘরের কাজ শেষ করিল। নিজের শয়নকক্ষটি তাহার নিজের চোখে ভারি ভাল লাগিল।

ঘর্মাক্ত কলেবরে স্নান করিতে যাইবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় দেবকুমার ফিরিয়া আসিল। মায়ার দিকে তাকাইয়া বলিল, "বাঃ, দিব্যি চেহারা খুলেছে।"

মায়া বলিল, "পটের বিবি সেজে ত ঝাড়ুদারণীর কাজ করা যায় না? কিন্তু ঘরটা কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, দেখ দেখি।"

দেবকুমার বলিল, "দেখাচ্ছে ত বেশ। একটু রসিকতা করতে ইচ্ছে হচ্ছে, তবে সেটা ঠিক ভদ্রতা-সঙ্গত হবে না এখনি।"

মায়া বলিল, "আহা, অভদ্র কথা কখনও বল না তুমি?"

দেবকুমার বলিল, "আরে রাম। আমি হলাম বিলেত-ফেরত সাহেব, আমি কখনও ভদ্রমহিলার সামনে অভদ্র কথা বলতে পারি?"

মায়া বলিল, "সকালবেলা যে কথাগুলি বলেছিলে, সেগুলি বুঝি খুব ভদ্র? মনে হচ্ছিল, লোহার শলা পুড়িয়ে কে কানে আর বুকে ফুটিয়ে দিচ্ছে।"

দেবকুমার একটুখানি গম্ভীর হইয়া গেল, বলিল, "সে কথাগুলি ভদ্র খুব নয় ঠিকই। কিন্তু না যদি বলতাম তাহলে এতক্ষণ থাকতে কোথায় মায়া?"

মায়া বলিল, "দুহাত ভর্তি ধুলো, না হলে পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইতাম, কথাটার উল্লেখ করার জন্যে। থাকতাম আর কোথায়? হয় লেকের জলের তলায়, নয় বিষ খেয়ে নরকে।"

দেবকুমার শাসনচ্ছলে তাহার কোমল গণ্ডে একটা মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "নিজের দোষ স্বীকার করলে ত আর বেশী শাস্তি দেওয়া যায় না? অত্যন্ত চটেছিলাম, তাই কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরোল, না হলে তোমার মত ছেলেমানুষের সামনে ওরকম কথা আমি বলতাম না।"

মায়া বলিল, "যাও, এখন স্নান কর। পিসীমা আজ আদেশ দিয়ে রেখেছেন যে সকাল সকাল নাওয়া খাওয়া ক'রে চাকর-বাকরদের ছেড়ে দিতে হবে। বিকেলের জলখাবারের জন্যে তাদের এখন থেকে লাগতে হবে। সাত আটজন লোক আসবেন ত? জলখাবারই তাঁদের এমন ক'রে খাওয়াতে হবে যাতে বাড়ী গিয়ে আর খেতে না হয়।"

স্নানের তাড়া আসিল একবার ইন্দুর কাছ হইতে, সুতরাং কথা থামাইয়া উভয়েই স্নানের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

দুপুর বেলার খাওয়া দাওয়া চট্ করিয়া শেষ হইল। তাহার পর বৈকালিক জলযোগের আয়োজনে সবাই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মায়া একবার পিসীমাকে সাহায্য করিতে গেল। কিন্তু নিজের বিয়ের ব্যাপারে নিজেকে খাটিতে নাই বলিয়া ইন্দু তাহাকে ফিরাইয়া দিল। নিরঞ্জন দশ মিনিটের জন্য আসিয়া দেবকুমারকে লইয়া গেলেন কাপড়ের মাপ দিবার জন্য। মায়া একখানা লাল শাড়ী ছাড়া কিছুই লইতে সম্মত হইল না, এবং তাহা কেনার ভার বাবা ও ভাবী স্বামীর উপরই ছাড়িয়া দিল।

সদ্য বিবাহিতা বাণী এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জন তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন মায়াকে ভাল করিয়া সাজাইয়া দিবার জন্য। সে ছুটিয়া উপরে উঠিয়াই মায়াকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল, "কেমন ঠাকরুণ, কতদিন আগে বলেছিলাম না?"

মায়া বলিল, "কথা ত কত লোকে কত রকম বলে। দু চারটে কি আর ঠিক না হয়ে পারে?"

বাণী বলিল, "তা তোমার রাজপুত্তুর বর গেল কোথায়? একটু দেখে চক্ষু সার্থক করতাম।"

মায়া বলিল, "আসবেন এখনি। বাবার সঙ্গে বেরিয়েছেন বাজারে।"

বাণী বলিল, "আমি তাহলে নিজের কাজ স্থরু করি। গা ধোওয়া হয়েছে?"

মায়া বলিল, "দশ মিনিট বসো। সেরে আসছি," বলিয়া মায়া গা ধুইতে চলিয়া গেল।

মায়ার চুল বাঁধা যখন শেষ হইল, তখন দেবকুমার খানিক জিনিষপত্র লইয়া ফিরিয়া আসিল। আয়া সে-সব বহন করিয়া আনিল। বাণীর আগ্রহের আতিশয্যে আবার আয়াকে নীচে পাঠানো হইল। দেবকুমারকে উপরে ডাকার জন্য। বাণী বলিল, "তোমার কপাল ভাল ভাই, আমরা ত বিয়ের আগে চোখেই ক'বার দেখেছি তা হাতে গোনা যায়, আর তোমরা দিব্যি এক বাড়ীতে বাস করছ।"

মায়া বলিল, "মহা ভাবনা তারও, আমার বাবারও। একবার যা ভেল্কি দেখালাম, এবার চোখে চোখে রাখছেন।"

দেবকুমার আসিতেই বাণী ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "নামেও দেবকুমার, কাজেও দেবকুমার।"

মায়া বাণীর সহিত আলাপ করাইয়া দেওয়ায় দেবকুমার বলিল, "এই ত ক'দিন আগে নেমন্তন্ন খেয়ে এলাম আপনার শুভবিবাহে।"

বাণী বলিল, "নিজেও ত মায়ার বন্ধনে ধরা পড়েছেন, নেমন্তন্ন আপনাকেও খাওয়াতে হবে। জানেন, আমি কিন্তু বছর খানিক আগেই এ বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী ক'রে রেখেছিলাম।

দেবকুমার বলিল, "বছর খানিক আগে ত আমি দেশেই ফিরিনি।"

বাণী বলিল, "দেশে ফিরবার পর ত সবাই বলতে পারত, না বলাই ছিল অসম্ভব। আমার বাহাদুরি যে, আমি আগেই বলেছি।"

দেবকুমার বলিল, "বাহাদুরি বটে। কিন্তু পিসীমা কি বলছেন শোন।"

ইন্দু একবার দ্রুতপদক্ষেপে উপরে আসিয়া জানাইয়া গেল যে, শিবচরণবাবু নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা আগেই আসিবেন বলিয়া খবর দিয়াছেন। মায়া যেন শীঘ্র প্রস্তুত হয়।

দেবকুমার প্রস্থান করিল। বাণী ও মায়া তাড়াতাড়ি করিয়া সাজসজ্জা শেষ করিতে লাগিল।

বরপক্ষীয় ভদ্রলোকরা আসিয়া পড়িলেন একটু পরেই। মায়া নীচে চলিল আশীর্বাদ লইতে। দেবকুমার একেবারে ছাদেই চলিয়া গেল, পাছে তাহাকে কেহ দেখিতে পায়।

আশীর্বাদ শেষ হইতে বেশী দেরি হইল না। অতঃপর খাওয়া-দাওয়ার পালা। মায়া তখন উপরে উঠিয়া আসিল। বাণী খাইয়া দাইয়া বাড়ী গেল। কোকাইন শহর হইতে এতটাই দূর যে লোকে সেখানে বেশী রাত পর্যন্ত থাকিতে চায় না।

দেবকুমার এতক্ষণ ছাদে বেড়াইতেছিল। মায়া উপরে আসিয়াছে দেখিয়া নামিয়া আসিল। বলিল, "মুখখানা যে একেবারে মুখোসের মত হয়ে গেছে, শীগ্‌গির ধুয়ে ফেল।"

মায়া বলিল, "ধুতেই ত যাচ্ছি, এখনও আসল আশীর্বাদটা বাকি আছে," বলিয়া মুখ ধুইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসার পর দেবকুমার বলিল, "হাতে যা একজোড়া বালা পরেছ, দেখাচ্ছে যেন মশার গলায় ঘণ্টা। বাবা দিলেন বুঝি?"

মায়া বলিল "হ্যাঁ।"

দেবকুমার বলিল, "আমার মায়ের গহনা বোধ হয়। তিনি শুনেছি খুব দশাসই মানুষ ছিলেন। তুমি কিন্তু যেমন আছ তেমনি থাকবে, বুঝলে? এইটা আমার আশীর্বাদ।"

মায়া বলিল "এই মাত্র? আমার কিন্তু আরো আশা ছিল।"

দেবকুমার মায়ার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাহলে নিয়ম মত আশীর্বাদ করছি। আজ যতখানি আনন্দ দিলে আমাকে চিরদিন তাই দিও। আর আজ যত আনন্দ পেলে, চিরদিন যেন তাই পাও।" বলিয়া তাহার কপালে চুম্বন করিল।

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "প্রণাম করব নাকি একটা?"

দেবকুমার বলিল, "না, না, থাক, ও জিনিসটা আমি এখনও সহ্য করতে পারি না। চল, একটু ছাদেই ঘুরে আসি। এখানে এখনও বড় গোলমাল।"

ছাদে উঠিয়া বলিল, "যাক, পরশুর পর্ব চুকে গেলে সব চুপচাপ। কাল অবশ্য আমাকে আবার এক ঘণ্টার জন্যে বাড়ী যেতে হবে, তোমার বাবার

আশীর্বাদ নিতে। তবে শুধু তিনি আর অজয়, কাজেই দেরি কিছু হবে না। আচ্ছা, নিজেকে তোমার কি রকম লাগছে? একেবারে বাঁধা প'ড়ে গেছ?"

"একেবারে বাঁধা পড়া আর নূতন ক'রে কি লাগবে? বাঁধা পড়তে চাইছিলামই ত, তবে একটু দেরি যদি করতে দিতে!"

দেবকুমার বলিল, "তাতে লাভ হত কি? নানা দুর্ভাবনা জুটিয়ে নিতে, আর আমার উপকার করবার যত আশ্চর্য উপায় উদ্ভাবন করতে। দরকার নেই আর। আমার ধাতে সহ্য হবে না, সেটা কি বুঝতে পারছ না মায়া?"

মায়া তাহার দুই হাত ধরিয়া বলিল, "খুব পারছি গো, খুব পারছি। তোমার স্বভাব এই ক'দিনেই বেশ বুঝে নিয়েছি। ছেলেবেলা তুমি খুব প্রশ্রয় পেয়েছ। যখন যা চেয়েছ, তাই পেয়েছ, কিছুর জন্যে তোমায় পথ চেয়ে থাকতে হয়নি।"

দেবকুমার হাত ছাড়াইয়া লইয়া, দুই হাতে মায়ার মুখখানা ধরিয়া বলিল, "এত প্রশ্রয় কার কাছে বা পাব মায়া? মা ত জন্ম দিয়েই চ'লে গেলেন, আর তোমার আবির্ভাবের আগে ভাল ক'রে প্রেমেও পড়তে পারিনি। আমার স্বভাবই ঐ রকম। যে রকম কষ্ট এবার পেলাম, এত কষ্ট আমার জীবনে আর পাইনি আগে। এটা মনে রেখো।"

মায়া সজল চোখে বলিল, "মনেই রাখব। আমার হাত থেকে আর এ রকম কষ্ট যাতে না পাও, তারই চেষ্টা করতেই ত চাইছিলাম। কিন্তু তুমি যে বড় অসহিষ্ণু আর বড় অভিমানী। ভয়ে আর কিছু বললাম না।"

দেবকুমার বলিল, "আমাকে বিদায় ক'রে দেওয়া ছাড়া কি চেষ্টা আর করতে চেয়েছিলে?"

মায়া বলিল, "এই দেশ বিদেশ ঘুরে দেখতাম, কোথাও এসব রোগের কোনো চিকিৎসা আছে কি না। আবার যাতে না হয় তার কোনো ব্যবস্থা আছে কি না। কিছু একটুও যদি করবার থাকে সেটা ক'রে নিশ্চিন্ত মনে যেতাম তোমার কাছে।"

দেবকুমার বলিল, "যা চাও, সব করতে পারবে, তবে আমার স্ত্রী রূপে। তুমি এটা কেন কিছুতে বুঝতে পারছ না যে, শুধু দর্শকরূপে তোমার জীবনের

বাইরে দাঁড়িয়ে আর আমি থাকব না। তোমার হাজার বারও যদি এই অসুখ হয়, আমার বুকের উপরে হবে। সব কিছুর ভার আমি নেব, সব দায়িত্ব আমার হবে। ইউরোপ আমেরিকা যেখানে যেতে চাও চল, তোমার বাবাও বলছিলেন আজ যে, কোনোদিন ছুটি না নিয়ে একটানা খেটে খেটে তিনিও বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, মাস ছয় ছুটি নেবেন। চল, তাহলে সবাই মিলেই ঘুরে আসব। Honeymoon trip-ও হয়ে যাবে এই সঙ্গে।"

মায়া বলিল, "তাই হবে। তুমি যা ঠিক করবে, তাইই এখন থেকে মেনে নেবার কথা ত দিয়েইছি।"

দেবকুমার বলিল, "মনটা কি সায় দিচ্ছে না?"

মায়া বলিল, "খুব সায় দিচ্ছে। তবে কি করা উচিত, আর কি করতে ভাল লাগে সেটার দ্বন্দ্ব থেকেই যায়।"

দেবকুমার বলিল, "এক্ষেত্রে থাকবে না। এটাই তোমার করা উচিত, এবং এটাই তোমার ভাল লাগবে।"

মায়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "তাই মেনে নিলাম। তুমি খুশী হচ্ছ, এই আমার ঢের।"

খাইয়া দাইয়া শুইতে একটু রাতই হইয়া গেল। পরদিনটা এমন হুড়াহুড়ির মধ্যে কাটিল যে, কেহ নিঃশ্বাস ফেলিবারই সময় পাইল না। বিকালে দেবকুমার একবার বাড়ী গেল এবং ঘণ্টা দুই পরে আবার ফিরিয়াও আসিল। মায়া ঘরে বসিয়া সেলাই করিতেছিল। দেবকুমারকে দেখিয়া বলিল, "তোমায় বেশী উৎপাত সইতে হয়নি, না?"

দেবকুমার বলিল, "বেশী না। এদিক্ থেকে ত মাত্র দুজন, তারও একজন বয়সে আর সম্বন্ধে ছোট, কাজেই আশীর্বাদ সে করেনি। বাবার বন্ধু দুচারজন জুটেছিলেন অবশ্য।"

মায়া বলিল, "বাবা কি দিলেন তোমাকে?"

দেবকুমার পকেট হইতে একটা খাম বাহির করিয়া বলিল, "এই যে।"

মায়া বলিল, "শাদা খাম দেখে কি বুঝব? ভিতরে কি আছে?"

দেবকুমার বলিল, "আছে একখানি চেক। বললেন একটা গাড়ী কিনে নিও।"

মায়া দেবকুমারের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া বলিল, "আমি যে কি খুশী হয়েছি তা তোমায় কি বলব!"

দেবকুমার বলিল, "খুশিটা কিসের জন্তে?"

মায়া বলিল, "বাবা তোমাকে এত ভালবাসছেন ব'লে। আমার মনে হচ্ছে, আমিই যেন তাঁকে একটা মহামূল্য উপহার দিলাম। তুমি তাঁর মেয়েকে নিয়ে নিলে বটে, কিন্তু তিনি ত বঞ্চিত হলেন না?"

দেবকুমার বলিল, "তুমি আমার স্ত্রী হচ্ছ ব'লে আর তাঁর মেয়ে রইলে না, এমন ত নয়? বাবাকে ত আগের চেয়ে কম কিছু ভালবাসবে না? কাজেই বঞ্চিত তিনি কিছুই হবেন না। আমারও তাঁর প্রতি ভালবাসা কম নয়। এটা হঠাৎ কোথা থেকে মনে এল জানি না।"

মায়া বলিল, "এগুলো এমনি হঠাৎই আসে বটে। এক মুহূর্ত আগে কোথাও ছিল না, আর এক মুহূর্ত পরে সমস্ত জীবন জুড়ে বসে। অদ্ভুত জিনিষ। অনেক মানুষ চিরজীবন এর থেকে বঞ্চিত থেকেও কেমন দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়।"

দেবকুমার বলিল, 'কিসের থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাই যে জানে না? নইলে ত সবাইকে গলায় দড়ি দিতে হত।"

আজও সকাল সকাল খাওয়া আর ঘুমানোর তাড়া আসিল। কাজেই বেশীক্ষণ আর গল্প চলিল না।

পরদিন শেষরাত্রি হইতেই কোলাহলে সকলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ভিতরের ভার লইল ইন্দু, তাহাকে সাহায্য করিতে বাণী ও বাণীর মা আসিয়া জুটিলেন। বাহিরে রহিলেন নিরঞ্জন আর অজয়। অবশ্য অল্পক্ষণের মধ্যেই নিরঞ্জনের কর্মচারীর দল আসিয়া জোটাতে তাঁহার আর কাজের লোকের অভাব হইল না। খুব বড় ব্যাপার নয়, কাজেই সুসম্পন্ন হইয়াই যাইবে, সকলে ধরিয়া লইল।

চা খাইয়া দেবকুমার বাড়ী চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিল, "বিকেলে আবার দেখা হবে।"

কন্যাকে সাজাইবার সময় কয়েকটি তরুণী জুটিয়া গেল। মোটামুটি তাহারা মায়ার পছন্দ মতই সাজাইল। তবে গহনা খুব বেশীই পরানো হইল। আয়নায় নিজের চেহারা দেখিয়া মায়া বলিল, "একেবারে যাত্রার দলের মহারাণী সাজিয়ে দিলে যে?"

সঙ্গিনীরা বলিল, "তোমার মহারাজা আগে আসুন, তখন তাঁর মত নেওয়া যাবে।"

বর আসিল খানিক পরেই, তবে তাহার অভিমত জানিবার কোনো সুযোগ তখন পাওয়া গেল না। শুভদৃষ্টির সময় দেবকুমার একবার সহাস্যে মায়ার দিকে তাকাইল। তবে কথা ত তখন বলা যায় না?

বিবাহ-ব্যাপার ও খাওয়া-দাওয়া চুকিতে খুব বেশী রাত হইল না। শহরে ফিরিতে সকলেই ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি করিয়া কাজ সারিল। বরকন্যাকে বাসর ঘরে ঢুকাইয়া দিয়াই তরুণীর দলকে পলায়ন করিতে হইল। নীচে অবশ্য কাজকর্ম সারার গোলমাল অনেকক্ষণ ধরিয়া শোনা গেল।

দেবকুমার ঘরে ঢুকিয়াই ফু. ন মালা ও বেনারসী চাদর খুলিয়া ফেলিল, বলিল, "নিতান্ত অসম্ভব ব'লেই শীত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম না। নইলে এত গরমে বিয়ে করা অতি সাহসের কাজ। তুমি যে কি ক'রে এই রকম ইন্দ্রাণী সেজে আছ জানি না। গহনার বোঝা একটু কমাও, আর একটা ভাল দেখে সুতি শাড়ী পর। তোমার দিকে তাকিয়ে আমার মাথাটা বেশ ঘুরে যাচ্ছে, সবটাই তার তোমার রূপের ছটায় নয়।"

মায়া গহনা খুলিতে খুলিতে বলিল, "খুলছি ত গহনা। বারণ করলেও শোনে না যে। ভাবে যে, যত হীরেমোতি চাপাবে ততই সুন্দর দেখাবে।"

দেবকুমার বলিল, "তা সুন্দর দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু সেই রাশিয়ান নাচ দেখবার বা না দেখবার দিন, এর চেয়েও সুন্দর দেখিয়েছিল।"

মায়া বলিল, "আচ্ছা, জেনে রাখলাম। দেখ, তোমার জিনিষপত্র সব পাশের ড্রেসিংরুমে আছে। আমি একটু স্নান ক'রে আসি, একেবারে ঘেমে উঠেছি," বলিয়া গহনাগাটি আলমারিতে তুলিয়া সে স্নান করিতে গেল। দেবকুমার ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া বেশ পরিবর্তন করিতে পাশের ঘরে ঢুকিল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মায়া স্নান করিয়া আসিয়া বসিয়া আছে। তাহার পাশে বসিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিল, "এইবার 'মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।' স্বাধীনতা হারাবার জন্যে এত ব্যস্ত কেউ কোনোদিন হয়নি বোধ হয়।"

মায়া বলিল, "তুমি ত মুক্তই রইলে, তোমাকে ত কেউ কিছুতে বাধা দেবে না? স্বাধীনতা আমারই কমবে, তবে স্বেচ্ছায় সেটা বিসর্জন দিয়েছি, কাজেই দুঃখ করি না।"

দেবকুমার বলিল, "নিজেকে ভয়ানক পরাধীন মনে হচ্ছে নাকি? একেবারে বন্দিনী?"

মায়া বলিল, "কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি মুক্তি আর বাঁধনকে আলাদা ক'রে দেখতে পাচ্ছ কি? আমার কেন দুটোই একরকম লাগছে? বাঁধন যা হওয়া উচিত ছিল তাই যেন আমায় মুক্তি দিচ্ছে। ভয়ের নাগপাশ-বন্ধন যেন আমার জীবন থেকে খুলে প'ড়ে গেল। মনে হচ্ছে তোমার জীবনের সঙ্গে মিশে আমি এমন নূতন হয়ে যাব যে ঐ পুরনো অভিশাপটা আর আমার নাগাল পাবে না। অসুখ হবার পরে, এত নিশ্চিন্ত আর আমি কোনোদিন হইনি।"

দেবকুমার মায়ার মাথাটা নিজের বুকের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল, "দেখ, সাধে আমি এত ব্যস্ত হয়েছিলাম? তোমার এর চেয়ে বড় চিকিৎসা আর কিছু হতে পারত না। যা হবার হয়ে গেল, এ নিয়ে আর ভাবতে হবে না, এই ধারণাটা মনকে বড় নিশ্চিন্ত করে। আমারও এই আড়াই মাস ধ'রে যে অবিরাম সংগ্রাম চলছিল মনের তাও আজ একেবারে শেষ হল।"

মায়া বলিল, "কিসের সংগ্রাম?"

দেবকুমার বলিল, "এই, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে একটা কাজ করতে বাধ্য করছি। একজনের ভাগ্যনির্ণয় ক'রে দেওয়া একটা কম দায় নয়।"

মায়া তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল, "আমি নিজেই স্বেচ্ছায় দিয়েছি সব ভার। তুমি জোর করনি। খালি চোখটা একটু ফুটিয়ে দিয়েছিলে। নইলে কি বোকামি করতাম ভগবান্‌ই জানেন।"

দেবকুমার বলিল, "শেষ অবধি তোমাকে না নিয়ে আমি ছাড়তামই না। অপহরণ করতে হলে তাই-ই করতাম।"

সকালে যখন মায়ার ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা হইয়া গিয়াছে। দেবকুমার আগেই উঠিয়া গিয়াছে। সারাদিনটা একটার পর একটা কাজ জুটিতে লাগিল। দেবকুমারের সহিত নিভৃত সাক্ষাৎ বড় বেশী হইল না।

বিকালে একবার শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইবে, কয়েকদিনের জন্য। অল্প অল্প জিনিষপত্র মায়া এবং ইন্দু মিলিয়া গুছাইয়া লইল। কান্নাকাটি করার প্রয়োজন বিশেষ হইল না, কারণ কন্যা ত ক'দিন পরে ফিরিয়াই আসিবে। মায়াকে যে আশ্বাস দেবকুমার দিয়াছিল, তাহা সে রক্ষা করিয়াছে। বাবাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে না মায়াকে।

বিকালে গা ধুইয়া মায়া আবার বিবাহের সাজে সাজিল। বাবা ও পিসীমার আশীর্বাদ গ্রহণ করিল, আত্মীয়-স্বজন আর কেহই ত বিবাহে উপস্থিত হইতে পারে নাই? অজয় লজ্জিতভাবে নবদম্পতিকে প্রণাম করিল।

ইন্দু নীচু গলায় বলিল, "একবার ঠাকুরঘরে চল। প্রণাম করবে।"

কথামত বর-বধূ ঠাকুরঘরে গিয়া প্রণাম করিল। সাবিত্রীর ছবির দিকে তাকাইয়া ইন্দু বলিল, "মাকেও নমস্কার কর।"

মায়ার বুকটা দুরদুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অবনত হইয়া নমস্কার করিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া তাকাইল। ছবি নীরব, নিস্পন্দ। একই ভাবে তাকাইয়া রহিল।

ঘরের বাহিরে আসিয়া দেবকুমার একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বলই রহিয়াছে, রাহুর গ্রাসের কোনো চিহ্ন সেখানে নাই।

সমাপ্ত